আওয়ামী দুঃশাসনের
১০০ কলাম
হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশ ইতিহাস চর্চা ও সংরক্ষণ পরিষদ

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ ইতিহাস চর্চা ও সংরক্ষণ পরিষদ

প্রকাশকাল

১ ডিসেম্বর ২০১৮

মূল্য

৩৫০ টাকা মাত্র

সূচি

জুলুম নির্যাতন: গুম-খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

অবাধে হত্যার উৎসব / ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী ০৪
গুম করছে কারা? / আসিফ নজরুল ০৮
ওরা মানুষ নয়, ওরা শিবির / মাহমুদুর রহমান ১২
'গুম'-এর সালতামামি / ড. আবদুল লতিফ মাসুম ১৭
গুলির পর কী? / আলফাজ আনাম ২৪
পুলিশের রাজনৈতিক আচরণ / আলী কাদের ২৯
গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে ব্যর্থতার পরিণাম হবে ভয়াবহ / আবু হামীম ৪২
আওয়ামী শাসনামলে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র চরম ভূলুণ্ঠিত / মাহবুব এহসান ৫২

সীমাহীন দুর্নীতি

১০ বছরে খেলাপি ঋণ হয়েছে সাড়ে ৫ গুণ / আশরাফুল ইসলাম ৬৬
দশ কেলেঙ্কারিতে লোপাট ২২,৫০২ কোটি টাকা / নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক প্রথম আলো ৬৯
ব্যাংক ও শেয়ারবাজারখেকো আওয়ামী লীগ / আদম অংকুর ৭৪

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

কেন 'প্রশ্ন ফাঁস মানি না, মানবো না' / মুহম্মদ জাফর ইকবাল ৭৮
চুপ! প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি! / আনিসুল হক ৮৩
অবিরাম প্রশ্নপত্র ফাঁস: মানুষরূপী দানব তৈরির সুদূরপ্রসারী মেগা প্রজেক্ট! / আখতার বাবুল ৮৬
প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে 'খোঁচাখুঁচি' করার কিছু নেই? / চিররঞ্জন সরকার ৯৩
প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতির গলায় ফাঁস / মোফাজ্জল করিম ৯৭
প্রশ্নফাঁস : চলিতেছে সার্কাস / আলফাজ আনাম ১০১

পাতানো নির্বাচন ও ভোট জালিয়াতি

পাতানো নির্বাচন এবং একব্যক্তিক রাষ্ট্রের প্রশ্ন / মাহফুজ আনাম ১০৭
বেঁচে থাকো বাংলাদেশ বেঁচে থাকো, প্লিজ / ফরহাদ মজহার ১১০
একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নেত্রীর জন্য বড় বেশি প্রয়োজন / বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম ১১৬
নির্বাচন কমিশনের ফাইনাল পরীক্ষা / মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ১২০
নির্বাচন ভাবনা ও জনপ্রত্যাশা / ইকতেদার আহমেদ ১২৫
পরিবর্তনের আলামত স্পষ্টতর হচ্ছে / মাসুদ মজুমদার ১৩১
এ কেমন মন্ত্রিসভা? / কাদের সিদ্দিকী ১৩৫

ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড

আওয়ামী সরকারের যতো ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড / এম এস চৌধুরী ১৪১

সংখ্যালঘু নির্যাতন

সংখ্যালঘুদের শাপমোচন কি হবেই না / মিনা ফারাহ ১৪৭
সংখ্যালঘুদের নিয়ে আওয়ামী লীগের নষ্ট রাজনীতি / এম আর করিম ১৫৫
সংখ্যালঘু নির্যাতনে আওয়ামী লীগের কালো হাত / জয়দেব মুখার্জী ১৬৯
এবার ভোটে আওয়ামী লীগকে লালকার্ড দেখাবে সংখ্যালঘুরা / তাজিম মাহমুদ ১৮৩

নারী নির্যাতন

ঘরে বাইরে নারী নির্যাতন থামিয়ে দেয়ার এখনই সময় / আজাদ কালাম ১৯৩
দশ বছরে নারী নিরাপত্তা ও অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত / এম এস চৌধুরী ২০১

মিডিয়ার কণ্ঠরোধ

মিডিয়ার উপর সরকারের নগ্নহস্তক্ষেপ / আদনান আকাশ ২০৬

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব ছাত্রলীগ / ইবনে আকবর ২২৩

জুলুম নির্যাতন

গুম-খুন ও বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

“
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক। ঘর থেকে বের হবে? জীবিত ইজ্জত নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সমাজে অপরাধ, হত্যা, গুম, নারী নির্যাতন এখন ডালভাতে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে সরকারদলীয় খুনি, মাস্তানেরা। এরা পথ আটকে যে কোনো নারী বা শিশুকে প্রায় প্রকাশ্যেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্লীলতাহানি করছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের মোকাবেলার আশঙ্কা থাকলে শ্বাসরোধ করে কিংবা গলা কেটে হত্যা করছে। কখনো লাশ কুটি কুটি করে কেটে বস্তায় ভরে এখানে- সেখানে ফেলে দিচ্ছে।
শিয়ালে-কুকুরে-কাকে মানুষের লাশ খুবলে খুবলে খাচ্ছে। এরকম লোমহর্ষক ঘটনার ইতি ঘটছে প্রতিদিন, মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থামছে না, ক্ষোভের আগুন দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে, কিন্তু সমাধান মিলছে না।
”

অবাধে হত্যার উৎসব

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

কখনো কখনো চমকে চমকে উঠতে হয়। সন্ত্রাসী, প্রতিপক্ষ কিংবা রাজনৈতিক জিঘাংসার শিকার হয়ে প্রতিদিনই দেশের কোথাও-না-কোথাও অপঘাত মৃত্যুর শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশের নিরীহ সাধারণ নাগরিকেরা। এভাবে হিসাব মিলালে দেখা যায়, ডজন ডজন পরিবারে প্রতিদিনই কান্নার রোল উঠছে। এর ওপর আছে গুম। একটি জলজ্যান্ত মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়েছিলেন হয়তো কোনো কাজে, নয়তো চা খেতে; কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। অদৃশ্য ঘাতকেরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। কোনো দূর বিজন প্রান্তে কোনো নদী-নালা, ডোবা-খাল, ধানক্ষেত, ডাস্টবিনের ম্যানহোলে এরা হারিয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা বুক ফাটা কান্নায় হৃদয়ের ভার যে কিছুটা লাঘব করবেন তারও কোনো উপায় থাকে না। হয় তো ভাবেন, এই বুঝি হারিয়ে যাওয়া স্বজন ঘরে ফিরে এলো। হয় তো সে আসবেই। আজ হোক কাল হোক। পরিবারজুড়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আর আতঙ্ক। কেবল চাপা দীর্ঘশ্বাস আর ভয়। সংসার জুড়ে শীতের ঘন কুয়াশার মতো আবৃত হয়ে থাকে।

ভিন্ন দিকও আছে। হয় তো ঘর থেকে কোনো কাজে বের হলো জায়া, জননী, ভগ্নী। হয়তো যাবেন এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি। কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাসায়। সেও যে জীবিত ইজ্জত নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে সরকারদলীয় খুনি, মাস্তানেরা। এরা পথ আটকে যে কোনো নারী বা শিশুকে প্রায়

প্রকাশ্যেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। শ্লীলতাহানি করছে। কখনো তারা দাঁড়াচ্ছে মুখোমুখি। প্রতিবাদ প্রতিরোধের মোকাবেলার আশঙ্কা থাকলে শ্বাসরোধ করে কিংবা গলা কেটে ওই নারী বা কন্যাশিশুকে হত্যা করছে। আবার একই কায়দার ঝোপঝাড়, ডোবা নালা, বনবাদাড়ে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। কখনো লাশ কুটি কুটি করে কেটে বস্তায় ভরে এখানে-সেখানে ফেলে দিচ্ছে। মুখের চেহারা এমনভাবে বিকৃত করছে যে, যাতে মুখ দেখে চেনাই না যায়। কে ছিল এই নারী বা কন্যাশিশু।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নির্বিকার। কখনো কখনো আমরা দেখি লাশ কিংবা লাশের টুকরো দিনের পর দিন ঘটনাস্থলে পড়ে থাকে। এ থানা বলে ওটা আমাদের এলাকা নয়, ও থানা বলে এটা আমাদের এলাকা নয়। তা হলে লাশের কী হবে? শিয়ালে-কুকুরে-কাকে-ঈগলে মানুষের লাশ খুবলে খুবলে খায়। যাদের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে, তারা কার্যত কিছুই করতে পারেন না। কেননা এই লাশ শনাক্ত করা, মৃত্যুর কারণ শনাক্ত করার দায়-দায়িত্ব দারোগাবাবুর। কেউ যদি স্বপ্রণোদিত হয়ে এ লাশ দাফন করতে চান, তাহলে থানা পুলিশ তাকে নিয়েই টানা-হেঁচড়া শুরু করবে। থানায় যাও, আদালতে যাও, সাক্ষ্য দাও– এই টানা-হেঁচড়ার ভেতরে কে যাবে! ফলে হৃদয়বান-বিবেকবান মানুষ দাফনের মতো ফরজ কাজটিও করতে পারে না। তাদেরও দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারী হয়।

রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন যে প্রশাসন তাদের মুখের ভাষা, শরীরের ভাষা অত্যাচারী জমিদারের পাইক-পেয়াদাদের মতো। আর দেশের নাগরিকেরা যেন তাদের বশংবদ প্রজামাত্র। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জনগণই দেশের মালিক। আর ওই সব প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাদের খেদমতগার; কিন্তু সাড়ে পাঁচ বছরের আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনে এখন জনগণ সত্যি এক নিপীড়ক জমিদারতন্ত্রের শিকার। এই পীড়ন অ্যালেক্স হ্যালির 'দি রুটস্' উপন্যাসের মতো। এ দেশের নাগরিকদের সব সম্পদ জায়া-জননী-ভগ্নি সব কিছুই যেন আওয়ামী শাসক, সন্ত্রাসী ও প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য নিবেদিত। এমন বিধানই করেছে সরকার।

এই যে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটছে, সেগুলো নিয়ে এক ধরনের ঠাট্টামশকারা করতে শুরু করেছেন সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা। সাম্প্রতিক সময়ে নারায়ণগঞ্জের সাত হত্যা, ফুলগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান একরাম হত্যা, তার আগে নারায়ণগঞ্জের ত্বকী হত্যা– এসব ঘটনার পরপরই সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের লোকেরা একবাক্যে রায় দিয়ে দেন, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে বিএনপি-জামায়াত জড়িত। কিন্তু সত্য তো সব সময় ধামাচাপা দেয়া যায় না। দেখা গেল নারায়ণগঞ্জের সাত হত্যায় জড়িত আছে সরকারের অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং র‍্যাবের দায়িত্বশীল সদস্যরা। হত্যাকাণ্ডে প্রধান আসামি কমিশনার নূর হোসেনের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। র‍্যাবের যে কর্মকর্তা প্রধান অপারেটর, সেই লে. ক. তারেক সাইদ সরকারের প্রভাবশালী এক মন্ত্রীর জামাতা। এই মন্ত্রীর ছেলের নামও এখানে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আরো যারা দৃশ্যপটে আবির্ভূত, তারাও র‍্যাবেরই সদস্য। যারা খুন হয়েছেন আর যারা খুন করিয়েছেন উভয়ই আওয়ামী লীগের সদস্য সমর্থক। অভিযোগে প্রকাশ, তাদের পেছনে আছেন নারায়ণগঞ্জের

গডফাদার বলে খ্যাত শামীম ওসমান। তিনি নূর হোসেনকে ভারতে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাকে বিচারের আওতায় না এনে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন, শামীম ওসমান পরিবারের যে কোনো বিপদ-আপদে তিনি তাদের পাশে থাকবেন। আশকারা আর কাকে বলে!

এদিকে আবার নারায়ণগঞ্জের সাত খুন থেকে শুরু করে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের খবর খুব স্বাভাবিকভাবে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। গণমাধ্যমে এসব কথা প্রচার হওয়ায় সরকার মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছে। সরকারের এক মন্ত্রী এমন তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন যে, নারায়ণগঞ্জের সাতটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে মিডিয়াগুলো যা করেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তা নাকি কোথাও হয়নি। সুতরাং সাংবাদিকদের এমন কষে গালি দিলেন যে, যা কেবল বিশেষ শ্রেণীর মুখেই মানায়, সবার মুখে নয়। এরপর তিনি জানান দিলেন, এমন সম্প্রচার আইন করা হবে যে, সাংবাদিকেরা যাতে টুঁ শব্দটি করতে না পারেন। তারপর সত্যি সত্যি সে আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন হয়ে গেল।

কিন্তু এরকম আইনের হঠাৎ কেন প্রয়োজন পড়ল? বিরোধী মতের যা কিছু সংবাদপত্র বা ইলেক্ট্রকিন মিডিয়া ছিল, তা সবই তো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসএসবি বন্ধ, চ্যানেল ওয়ান বন্ধ, দিগন্ত টিভি বন্ধ, ইসলামিক টিভি বন্ধ, আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ, সম্পাদক কারাগারে, দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক কিছু দিন কারাভোগ করে এসেছেন। দৈনিক ইনকিলাবও বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। গণহারে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছিল। এখন আবার ঠুনকো অজুহাতে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে এর বার্তা সম্পাদককে রিমান্ড শেষে কারাগারে রাখা হয়েছে।

আর যারা এখন বাজারে সচল তাদের প্রায় সবই সরকারের তাঁবেদার ও স্তাবক। সরকারের খাস লোক। তারপরও কেন এমন আইন করা হচ্ছে। তার কারণ, জনভিত্তিহীন সরকার আসলে কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। সরকারও তার আপনজনকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কখন কোন ফাঁক দিয়ে কোন অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ে? সব সময় সেই ভয় আর আতঙ্কে সরকার থরহরিকম্প।

সেই কারণেই সম্প্রচার নীতিমালায় সরকার এমন বিধান রেখেছে যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন কিছু প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না। অর্থাৎ পুলিশের চাঁদাবাজি, গ্রেফতার বাণিজ্য, চাঁদার দাবিতে খুন– কোনো কিছুই প্রচার বা প্রকাশ করা যাবে না।

আর ছাত্রলীগ তো খুনি-টেন্ডারবাজ-দখলবাজ বাহিনী হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছে। হেন অপরাধ নেই যা তারা করে না। নারী নির্যাতনও তাদের জন্য ডালভাত, সম্ভবত অধিকারও। ফলে সমাজে অপরাধ, হত্যা, গুম, নারী নির্যাতন এখন ডালভাতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৭ আগস্ট সন্ধ্যায় চ্যানেল আইয়ের জনপ্রিয় ইসলামিক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক, মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকীকে খুন করে কিছু যুবক। হাত-পা বেঁধে, গলা কেটে পূর্ব রাজাবাজারের বাসার ডাইনিং রুমে হত্যা করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

তিনি সুন্নিভিত্তিক সংগঠন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও ইসলামিক ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য ছিলেন। এ ঘটনার পরপরই সরকারি মহল থেকে রটানোর চেষ্টা হলো যে, জামায়াতে ইসলামী ও হেফাজতে ইসলামের লোকেরা তাকে হত্যা করেছে। এমনিতেই প্রতিদিন শত শত বিএনপি ও জামায়াতের লোকদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংখ্যা হয়তো আরো বাড়বে।

মাওলানা ফারুকীর রক্তের দাগ শুকাবার আগেই ৩৬ ঘণ্টার মাথায় মগবাজারের এক বাসায় ঢুকে দুর্বৃত্তরা একই পরিবারের তিনজনকে হত্যা ও একজনকে গুরুতর জখম করেছে। টেলিভিশনে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত তৃপ্তির হাসি দিয়ে কাদের সাথে যেন কথা বলছেন। মতিয়া চৌধুরী খিচ্চে বিএনপিকে গাল দিচ্ছেন আর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কামাল মগবাজারে খুনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

এভাবেই এসব লোমহর্ষক ঘটনার ইতি ঘটে। ইতি ঘটে যায়; কিন্তু মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ থামে না। ক্ষোভের আগুন দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪
সূত্র: ঢাকা ডাইজেস্ট

“

বাংলাদেশে এই রহস্যময় আগন্তুকেরা এসেছে হয়তো বহু আগে। কিন্তু ঘন ঘন এই এলাকায় তাদের হানা দেওয়া শুরু হয়েছে কয়েক বছর ধরে। আট বছরে কয়েক শ মানুষ তাদের খপ্পরে পড়েছে, এর মধ্যে এ বছর প্রথম ছয় মাসেই অর্ধশতাধিক মানুষ! আগে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পছন্দের মানুষকে তুলে নিয়ে উধাও হতো। এখন তাদের মধ্যে বেড়েছে রোমাঞ্চপ্রিয়তা, বেড়েছে মাফিয়া স্টাইলে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়ার প্রবণতা। তাদের মহাকাশযান তাই হঠাৎ হঠাৎ ঘাপটি মেরে থাকে ব্যস্ত কোনো সড়কে। সেখান থেকে ঝটপট তারা বের হয়ে আসে। অফিসযাত্রী, হোটেলযাত্রী, বাড়িমুখীর যে কোনো পছন্দের মানুষকে নিমেষে তুলে নেয় তাদের যানের ভেতর। তারপর তা যেন উধাও হয়ে যায় মহাবিশ্বের দূরতম কোনো অঞ্চলে। আর কখনো খোঁজ মেলে না তাদের বা তাদের গাড়ির।

”

গুম করছে কারা?

আসিফ নজরুল

এলিয়েন বা ভিনগ্রহের জীবদের নিয়ে মানুষের আগ্রহ চিরন্তন। এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরাই আছি শুধু এটা মন মানতে চায় না। অশেষ এই মহাবিশ্বের অন্য কোথাও কি নেই প্রাণের অস্তিত্ব?

পৃথিবী নামক বালুকণায় বসে আমরা কল্পনা করি, অন্য কোথাও আছে ভিনগ্রহের জীবেরা। এই কল্পনা সবচেয়ে বেশি জমে ওঠে সিনেমার ভাষায়। ১৯৫১ সালের দ্য ডে দ্য আর্থ স্টুড স্টিল থেকে হালের দ্য অ্যারাইভাল-এর মতো বহু ছবিতে আমরা তাই দেখি এসব এলিয়েন বা রহস্যময় আগন্তুকের উপস্থিতি। ইটির মতো মজাদার চরিত্রের হতে পারে তা, অথবা হতে পারে এলিয়েন সিরিজের মতো ভয়ংকর কিছু। রহস্যময় আগন্তুক নিয়ে সিনেমা ছাড়াও আরও নানা ধরনের সৃষ্টিকর্ম রয়েছে মানুষের। কিন্তু বাস্তবে এমন কিছুর সন্ধান কেউ পায়নি। কোনো দেশে পাওয়া যায়নি।

তবে আমার ধারণা, ভিনগ্রহের জীব বা আগন্তুক ধরনের কিছু একটা সত্যি আছে আমাদের দেশে। আছে মহাকাশযান, আগন্তুকের রহস্যময়তা। হঠাৎ করে কোথা থেকে উদয় হয় তারা, হঠাৎ হয় উধাও। ছোঁ মেরে সঙ্গে নিয়ে যায় বাংলাদেশের হকচকিত কিছু মানুষকে। এলিয়েন বা রহস্যময় আগন্তুক বলেই হয়তো তাদের আর কোথাও খুঁজে পায় না পুলিশ, গোয়েন্দা, আমজনতা।

প্রধান বিচারপতি, নির্বাচন, রোহিঙ্গার এসব ইস্যুর জটিলতায় এখন মগ্ন আমরা। কিন্তু এতে থেমে নেই রহস্যময় আগন্তুক সমাজ, থেমে নেই তাদের নিয়ে আতঙ্কও। মাত্র কয়েক দিন আগেও রাস্তা থেকে উধাও হয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। তাদের বিষয়টি তাই কখনো এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় কারও।

২.

বাংলাদেশে এই রহস্যময় আগন্তুকেরা এসেছে হয়তো বহু আগে। কিন্তু ঘন ঘন এই এলাকায় তাদের হানা দেওয়া শুরু হয়েছে কয়েক বছর ধরে। আট বছরে কয়েক শ মানুষ তাদের খপ্পরে পড়েছে, এর মধ্যে এ বছর প্রথম ছয় মাসেই অর্ধশতাধিক মানুষ! আগে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পছন্দের মানুষকে তুলে নিয়ে উধাও হতো। এখন তাদের মধ্যে বেড়েছে রোমাঞ্চপ্রিয়তা, বেড়েছে মাফিয়া স্টাইলে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়ার প্রবণতা। তাদের মহাকাশযান তাই হঠাৎ হঠাৎ ঘাপটি মেরে থাকে ব্যস্ত কোনো সড়কে। সেখান থেকে ঝটপট তারা বের হয়ে আসে। অফিসযাত্রী, হোটেলযাত্রী, বাড়িমুখীর যে কোনো পছন্দের মানুষকে নিমেষে তুলে নেয় তাদের যানের ভেতর। তারপর তা যেন উধাও হয়ে যায় মহাবিশ্বের দূরতম কোনো অঞ্চলে। আর কখনো খোঁজ মেলে না তাদের বা তাদের গাড়ির। রহস্যময় আগন্তুকেরা যাদের তুলে নিয়ে যায়, সেসব পরিবারে কান্নার রোল ওঠে। বছরের পর বছর বুক চাপড়ে কাঁদে নিখোঁজ মানুষের পিতা-মাতা, পরিবার, শিশুসন্তান। কিন্তু নিখোঁজ মানুষের আর খোঁজ মেলে না। কালেভদ্রে তাদের দু-একজনকে এসব আগন্তুক ফেরত দেয় জীবিত বা মৃত অবস্থায়, কালেভদ্রে দু-একজনকে তারা ধরে নিয়ে ছেড়ে দেয় পাশের দেশে। জীবিত যারা ফেরত আসে, তারা আর মনে করতে পারে না কিছু। তরুণ পারে না, বৃদ্ধ পারে না, ব্যবসায়ী পারে না, কবি পারে না। জীবন ও জগতের সবকিছু তারা মনে করতে পারে। শুধু মনে করতে পারে না ধরা পড়া আর ছাড়া পাওয়ার মাঝখানের সময়টুকু।

এসব রহস্যময় আগন্তুক দেখে অবশ্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে আশপাশে থাকা মানুষের। তাঁরা দেখেন, এই রহস্যময় অপহরণকারীরা দেখতে মানুষের মতো, তাদের মহাকাশযান মানুষের মাইক্রোবাসের মতো। মানুষের মতো করে তারা হুংকার দেয়, হাতকড়া পরায়, ধস্তাধস্তি করে, ঠেলেঠুলে কোনো মানুষকে ঢোকায় মাইক্রোবাসে। মানুষের গাড়ির মতোই তাদের গাড়ি ছুটে যায় রাজপথ কামড়ে। কিন্তু তারপর হঠাৎ তা উধাও হয় সবকিছু থেকে। সিসিটিভি, ট্রাফিক পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ, র‍্যাবের গাড়ি, নিরাপত্তা এলাকার শ্যেনদৃষ্টির কোনো কিছুর চোখে পড়ে না আর তা।

তাদের সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী মানুষের এই বর্ণনা অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণযোগ্য। তাই তা আমলে নেয় না পুলিশ। বেশি মানুষ এটা নিয়ে শোরগোল তুললে তারা একটা জিডি করে মাঝেমধ্যে। কিন্তু নিখোঁজ হওয়া মানুষের খোঁজ আর কখনো পায় না তারা। না পায় তার ঠিকানা, না পায় তার লাশ। কারণ, তারা জানে, এটা রহস্যময় আগন্তুকদের কাজ। এদের খোঁজার মতো প্রযুক্তি, সাহস বা সিদ্ধান্ত নেই পুলিশের। এটি তারা অবশ্য স্বীকার করে না আমজনতার কাছে। তারা দাবি করে, এগুলো নিখোঁজ মানুষের স্বজনদের বানানো গল্প।

পাওনাদার, স্ত্রী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে কিছু মানুষ নিজেরাই লুকিয়ে থেকে ঝামেলা পাকায়। কিংবা নিজেরাই কাউকে দিয়ে নিজেকে নিখোঁজ করিয়ে সৃষ্টি করে কাঁচা নাটক।

এসব নাটক বা বানানো গল্প বিশ্বাস করার সময় নেই পুলিশের। প্রটোকল প্রদান, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, নাশকতা দমনসহ নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাদের। রহস্যময় আগন্তুকেরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

৩.

রহস্যময় এই আগন্তুকেরা নিজেরাও সরকারপন্থী। সরকারের কেউ তাই তাদের খপ্পরে পড়ে না। পড়ে কেবল বিরোধী মতের মানুষ। হয়তো সরকারের উন্নয়ন, নতুন ঘরানার নির্বাচন, তথ্যপ্রযুক্তির কারিশমায় মুগ্ধ তারা। বিরক্ত এসবে বাধা দেওয়া বা সমঝদার হতে ব্যর্থ হওয়া মানুষের প্রতি। তাই তাদের টার্গেট থাকে প্রধানত বিরোধী দল বা ভিন্নমতের মানুষ। বিরোধী দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে তাই উধাও করে দেওয়ার নেশায় বেশি মেতে ওঠে এরা।

অনেক সময় নানা অজ্ঞাত কারণেও তাদের তৎপর হতে দেখা যায়। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মাত্র এক সপ্তাহে এই শহর থেকে তারা লোপাট করে দেয় দুই ব্যবসায়ী ও এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে। ধূর্ত এই এলিয়েনরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নিজেদের পরিচয় দেয় গোয়েন্দা সংস্থার লোক হিসেবে।

তাদের আরও বৈশিষ্ট্য আছে। এরা পুরুষবিদ্বেষী। সব ক্ষেত্রে তাই তারা শুধু তুলে নেয় পুরুষদের, বিশেষ করে তরতাজা ধরনের পুরুষদের। কোনো কোনো নারীর আহাজারিতে বিষাদময় হয়ে তারা কোনো কোনো পুরুষকে ফেরত দিয়েছে বটে। কিন্তু ভিনগ্রহের এই জীবদের রাজ্য থেকে ফিরে তারা আর পুরুষ হয়ে থাকেনি। অজানা ভয়ে কাপুরুষের মতো নির্বাক হয়ে আছে এরা বাকি জীবন।

রহস্যময় এই আগন্তুকদের কোনো পদচিহ্ন নেই, অপরাধের আলামত নেই, তাদের জন্য দেশে কোনো আইন নেই। ধরার জন্য কোনো বিশেষ বাহিনী নেই, কোনো আদালতের স্বতঃপ্রণোদিত বা অন্য কোনো মত বা ইচ্ছে নেই। তাদের সঙ্গে অবশ্য একশ্রেণির পুলিশের রয়েছে দুর্বোধ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, পুলিশ যাকে গ্রেপ্তার করেছে, তাকে রহস্যময় আগন্তুকেরা তুলে নিয়ে উধাও করে দিয়েছে। সাতক্ষীরায় সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া জেসমিন তাঁর স্বামীকে থানায় তিন দিন ভাত খাইয়ে দিয়ে এসেছিলেন। পরের দিন থেকে দেখেন থানা থেকে উধাও তাঁর স্বামী। পুলিশ অবশ্য স্বীকার করেনি এটি। আগন্তুক-ভীতি কমাতে জনস্বার্থে এমন করতে হয় পুলিশকে।

উল্টো ঘটনাও ঘটে কখনো কখনো। গায়েব করা মানুষকে পরে দেখা যায় পুলিশের হাজতে। তাদের রোষ এড়াতে এ নিয়ে কোনো কৃতিত্ব জাহির করে না পুলিশ। এসব নিয়ে আজকাল বেশি প্রশ্নও করে না বাংলাদেশের বিজ্ঞ সমাজ। প্রশ্ন তুলতে ইচ্ছুক মানুষের ওপর রহস্যময় আগন্তুকদের বিশেষ নজরদারি রয়েছে বলে খবর আছে তাদের কাছে।

৪.

রহস্যময় আগন্তুকদের সমস্যা একটাই। এ দেশের ও বিদেশের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কাজ করে মানবাধিকার নামে একটা ফালতু বিষয় নিয়ে। এরা মানুষ আর আগন্তুকদের পার্থক্য বোঝে না। মানুষের ক্যামেরা, মানুষের যান আর মানুষের বাহিনী দিয়ে গ্রেপ্তারের দাবি তোলে তাদের। মানুষের আইন-আদালতে বিচার করার দাবি তোলে এরা অশরীরী আগন্তুকদের। তারা ব্যাপক উদারতা দেখিয়ে সহ্য করে এসব মানবীয় মূর্খতাকে। কিন্তু কখনো অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে এরা তুলে নেয় মানবাধিকারের লোকজনকেও।
তাদের আরেকটা সমস্যা আছে। তা হচ্ছে, বহু কিছুর মতো এ দেশে শুরু হয়েছে আগন্তুক-বাণিজ্যও। রহস্যময় আগন্তুকদের ভয় দেখিয়ে বা আগন্তুক সেজে উধাও করার এসব বাণিজ্যে আগন্তুক সমাজের কৌলীন্য হোঁচট খাচ্ছে আজকাল।

এ দেশের আদালত এই বাণিজ্য বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির স্বজনকে ফোন করে তাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশ অবশ্য তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই সুযোগে আগন্তুক সেজে আদালতকে অগ্রাহ্য করে চলেছে আগন্তুক বণিকেরাও।

রহস্যময় আগন্তুক-আতঙ্কে তাই দিশেহারা বাংলাদেশের মানুষ। তারা জানে না এদের থেকে বাঁচার উপায়। একমাত্র বিরোধী দল জানে এটা। তারা জানে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যেতে পারলেই বেঁচে যাবে তারা। সেটি হলেই কেবল রহস্যময় আগন্তুকদের খপ্পরে আর পড়বে না তারা। কারণ, রহস্যময় আগন্তুক মানেই সরকারপন্থী।

আমরা আমজনতা। আমরা ভাবি, আজব এই রহস্যময় আগন্তুক কবে হবে আমজনতাপন্থী!

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম আলো, ২২ অক্টোবর ২০১৭

> বাংলাদেশ সরকার যেহেতু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করার কোনো ঘোষণা দেয়নি, কাজেই উদ্ধৃত চারটি অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার সংগঠনদ্বয়ের প্রতিটি নেতাকর্মী সংরক্ষণ করে। এই বাস্তবতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শিবির উৎখাতের ঘোষণা সংবিধান পরিপন্থী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার জ্বলন্ত প্রমাণ।

ওরা মানুষ নয়, ওরা শিবির

মাহমুদুর রহমান

[২০১০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এই বিশেষ সম্পাদকীয়টি লেখেন। আওয়ামী জাহেল সরকরের মেয়াদ তখন একবছর পার হয়েছে মাত্র। শুরুতেই তারা কিভাবে ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠেছিল সেই দৃষ্টান্ত এ লেখাটিতে পাওয়া যাবে।]

ইতিহাসে পড়েছি প্রাচীন ভারতে রাজন্যবর্গ অমাত্য, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যহারে বন্যপ্রাণী শিকারে বের হতেন। সৈন্যসামন্তের কাজ ছিল দল বেঁধে শিকারটিকে তাড়িয়ে রাজার সামনে এনে দেয়া। রাজামশাই তারপর সেই শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রাণীটিকে বধ করে তার অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। অপ্রয়োজনে বন্যপ্রাণী হত্যার মতো নিষ্ঠুর কাজে ব্যাপৃত থাকলেও তাদের রোমান্টিক মন আবার সুন্দরী রমণীদের খোঁজেও থাকত। বন-জঙ্গলে লালিত ঋষিকন্যার রাজার মন জয় করার চিত্তাকর্ষক কাহিনী অনেক পাঠকেরই জানা।

গত ক'দিন ধরে বাংলাদেশে শিবিরকর্মী ধরতে যে তথাকথিত চিরুনি অভিযান অভিযান চলছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই পুরাকালে রাজ-রাজড়াদের আনন্দ-মৃগয়ার গল্প মনে পড়ল। স্বরাষ্টমন্ত্রী বলেছেন, তার আদেশ শিরোধার্য করেই দেশের তাবৎ পুলিশকে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর মতো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার লক্ষ্যে চিরুনি অভিযান চালাতে হবে। সংবাদ মধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে, শিবির ধরা অভিযানে ছাত্রলীগ কর্মীরা পুলিশকে সহায়তা করছে। পুলিশ এবং ছাত্রলীগের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এই যৌথ অভিযান সংবিধানের কোন ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, তার জবাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীই ভালো দিতে পারবেন। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দেশ থেকে জামায়াত-শিবির একেবারেই উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছেন। এসব নির্দেশ এবং ঘোষণা যে সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, 'স্বাধীন আদালতের' যুগে সরকার তার পরোয়া করার কোনো প্রয়োজন বোধ করছে না। সংবিধানের আলোচনার আগে সরকারপন্থী মিডিয়ার ভূমিকা পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

শিবিরের বিরুদ্ধে পুলিশ-ছাত্রলীগের যৌথ অভিযান সম্পর্কে দু'টি চিহ্নিত সংবাদপত্রের একই দিনের শিরোনাম যথাক্রমে– 'শিবির পালাচ্ছে' এবং 'শিবিরের তাণ্ডব'। বাংলাদেশের একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে পত্রিকা দু'টির শিরোনাম পড়ে আমি যারপরনাই বিভ্রান্ত হয়েছি। যে পালায়, সে-ই আবার তাণ্ডব চালায় কী করে– এই ধাঁধার উত্তর আমার জানা নেই। অপসাংবাদিকতার একটা সীমা থাকা দরকার। উভয় পত্রিকাই সরকারের মুখপত্র হওয়ার প্রতিযোগিতায় রত এবং সম্পাদকদ্বয় মাস কয়েক আগেই দিল্লি সফর করে এসেছেন। যতদূর জানি, একটি পত্রিকার মালিকের ব্যাংকে বিপুল অংকের খেলাপি ঋণ সমস্যা রয়েছে এবং অন্য মালিক ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিআই'র প্রেসিডেন্ট পদটি পেতে আগ্রহী।

ক'দিন আগে টেলিভিশনের টকশো'তে বাংলাদেশের অপর এক প্রখ্যাত সম্পাদকের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে মন্তব্য শুনে বিস্মিত হয়েছি। ভদ্রলোকের রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক না কেন, তাকে এতদিন মানবাধিকারের পক্ষশক্তি হিসেবেই বিবেচনা করতাম। তিনি বললেন, শিবিরের মানসিকতায় ঐতিহ্যগতভাবে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা রয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ নাকি ঘটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবির কর্তৃক ছাত্রলীগ কর্মী হত্যার মধ্য দিয়ে। তিনি সম্ভবত হতভাগ্য ছাত্রটিকে কেবল হত্যা করেই ক্ষান্ত না হয়ে তার মৃতদেহ ম্যানহোলে ফেলে দেয়ার নির্মমতা লক্ষ্য করেই মন্তব্যটি করেছেন। কিন্তু, আমার বিবেচনায় সব হত্যাকাণ্ডই বর্বরতা। শিবির কাউকে হত্যা করলে সেই ঘটনাকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলব আর ছাত্রলীগ অথবা ছাত্রদল একই নির্মমতা প্রদর্শন করলে সেটি ডিজিটাল অথবা আধুনিক হত্যাকাণ্ড হয়ে যাবে– এমন সরলীকরণের পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

রাজশাহীর একজন ছাত্রের হত্যাকাণ্ডকে যদি আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতা আখ্যা দেই, তাহলে ২৮ অক্টোবর দিনে-দুপুরে টেলিভিশন ক্যামেরা এবং শত শত পুলিশের সামনে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে তাদের মৃতদেহের ওপর উল্লসিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের লাফালাফিকে সম্পাদক মহোদয় কী বিশেষণ দেবেন, তা আমার জানা নেই। অথবা ইঙ্গ-মার্কিন জল্লাদ বাহিনী প্রায় এক দশক ধরে ইরাক এবং আফগানিস্তানে যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, তাকে আমরা কী বলব? ইসরাইলি সামরিক বাহিনী প্যালেস্টাইনে স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীকে যে প্রক্রিয়ায় বিগত ষাট বছর ধরে হত্যা করেছে, তাকেই বা কোন বিশেষণে অভিহিত করা হবে? ভারতীয় বাহিনী আমাদের সীমান্তে বছরের পর বছর ধরে যেভাবে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করে চলেছে, তাকে মধ্যযুগীয় বলব, নাকি আধুনিক পদ্ধতিতে গুলি অথবা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা অভিহিত করে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাজনিত কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করব? ফ্যাসিবাদ নিয়ে যতটুকু পড়াশোনা করেছি, তাতে জনপ্রিয় সম্পাদকের সেদিনের বক্তব্যে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি ফ্যাসিবাদেরই গন্ধ পেয়েছি। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা চালানো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক তাদের ওপর নির্যাতনের পর সেটিকে বৈধতার প্রলেপ দেয়ার অপচেষ্টা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞাতেই পড়ে।

এবার বেচারা সংবিধানের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩৭ এবং ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদগুলো উদ্ধৃত করছি, যাতে বর্তমান সরকারের সব মৌলিক অধিকার এবং দেশের প্রচলিন আইনবিরোধী কার্যকলাপের ভয়ঙ্কর চিত্রটি পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারেন:

''অনুচ্ছেদ-২৭ : আইনের দৃষ্টিতে সমতা। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ-৩১ : আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাধের ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

অনুচ্ছেদ-৩৭ : সমাবেশের বাধানিষেধ। সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৩৮ : সংগঠনের স্বাধীনতা। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের ধারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।''

বাংলাদেশ সরকার যেহেতু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ করার কোনো ঘোষণা দেয়নি, কাজেই উদ্ধৃত চারটি অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকার সংগঠনদ্বয়ের প্রতিটি নেতাকর্মী সংরক্ষণ করে। এই বাস্তবতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শিবির উৎখাতের ঘোষণা সংবিধান পরিপন্থী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার জ্বলন্ত প্রমাণ। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই জাতীয় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকলেও 'স্বাধীন আদালতে' ন্যায়বিচার কতটা পাওয়া যায়, তার অতি সাম্প্রতিক বিরূপ অভিজ্ঞতা আমারই রয়েছে। সে সম্পর্কে গতকালের আমার দেশ পত্রিকায় একটি সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধান, আইন ও আদালতের কোনো তোয়াক্কা বর্তমান সরকার যে করে না তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আরও একটি বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে।

১২ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় এক সমাবেশে তিনি বলেছেন, 'রাজশাহীতে আমাদের এক ভাইকে খুন করেছে। অনেকের হাত-পায়ের রগ কেটে দিয়েছে। শিবির সারাদেশে ছাত্রলীগের ভাইদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরকে আর ছাড় দেয়া হবে না। তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' জার্মানির এডলফ্ হিটলার যখন সেদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলের জন্য কমিউনিস্টবিরোধী এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান (Ethnic Cleansing) চালিয়েছিলেন, ইতিহাসের

পাতা ঘাঁটলে তার সঙ্গ-পাঙ্গদের মুখে অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনের মতোই ভাষা পাওয়া যাবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে কোনো ছাত্রই রাইখস্ট্যাগের সাজানো নাটক সম্পর্কে পড়েছেন। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিটলারের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত কিনা, সেই তথ্য অবশ্য আমার অজানা। তবে, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কয়েকটি প্রশ্ন না করে পারা যাচ্ছে না। আপনার বক্তব্য অনুযায়ী আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদরে মধ্যকার সব পুরুষ প্রজাতিকে আপনি যে ভাই হিসেবে বিবেচনা করেন, সেটি অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ।

প্রশ্ন হলো, দলনিরপেক্ষ এবং বিরোধী মতের সবাইকে আপনি বৈমাত্রেয় ভাই বা বোন বিবেচনা করে তাদের প্রতি আজন্মলালিত কোনো আক্রোশ অনুভব করেন কি-না? নইলে দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবু বকর যখন আপনার ভাইদের আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধের বলি হয়, সেটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আপনি উপহাস করেন কী করে? তখন ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আপনার চিরুনি অভিযান কোথায় যায়? মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করার সময় আপনি নিশ্চয়ই উচ্চারণ করেছিলেন,'কোনো অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব না।' রাজশাহী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই প্রকৃতির হত্যাকাণ্ডে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মাধ্যমে অপনি সেই শপথ ভঙ্গ করেছেন কি-না? সংবিধানের ২৭ নম্বর অনুচ্ছেদে সব নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে যে সমান ঘোষণা করা হয়েছে, সংবিধানের সেই নির্দেশনা আপনি মান্য করেন কি-না?

বাংলাদেশের মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বাকশাল আমল ছাড়া সর্বকালের সীমা অতিক্রম করলেও গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ধ্বজাধারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং এদেশীয় দালালশ্রেণী কেবল নীরবতাই অবলম্বন করছে না; উপরন্তু, তাদের মুখপত্রগুলো এই অন্যায় আচরণকে বৈধতা দেয়ার নির্লজ্জ চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পুরনো আহমদিয়া ইস্যুর কথা মনে পড়ে গেল। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে একদল অতি বিপ্লবী ইসলামপন্থীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে কিছুদিন পরপরই বেশ বড় বড় জঙ্গি বিক্ষোভ মিছিল বের করে ওদের উপাসনালয়ে আক্রমণের চেষ্টা চালাত। চারদলীয় জোটের পুরোটা সময় ধরেই এই আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড চালালেও বিগত সাড়ে তিন বছর তারা এক প্রকার পর্দার অন্তরালেই অবস্থান করছে। সেই সময় কে তাদের অর্থায়ন এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতে, সেই রহস্যের আজও কিনারা হয়নি। যাই হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই আহমদিয়া ইস্যুটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিল এবং সেই সময় সরকারের সঙ্গে মানবাধিকার ও সংখ্যালঘু সংক্রান্ত যে কোনো অনুষ্ঠানিক আলোচনায় তারা অবধারিতভাবে আহমদিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করত। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর কর্তাব্যক্তিদের বাংলাদেশ সফরের সময় আহমদিয়াদের উপাসনালয়ে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নেয়াটা নির্দিষ্ট রুটিনে পরিণত হয়েছিল। আগেই উল্লেখ করেছি, এখন আর দেশে আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলনের কোনো নাম-নিশানা নেই। তবে সরকার সম্প্রতি যে চন্ডমূর্তি ধারণ করে জামায়াত-শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, সেটি এদেশে এক নতুন অভিজ্ঞতা। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারপন্থী হওয়ার সুযোগে মানবাধিকারকে পদদলিত করতে প্রশাসনের কোনো সমস্যাই পোহাতে হচ্ছে না।

যে একটি-দু'টি পত্রিকা নিতান্তই ব্যতিক্রম হিসেবে এই দমননীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ক্ষমতাসীনদের নির্যাতন অথবা দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করার ঝুঁকি নিচ্ছে, তারাই রাষ্ট্রযন্ত্রেও সব ধরনের দমন-পীড়নের শিকারে পরিণত হচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন-ভারত-ইসরাইল কৌশলগত মৈত্রী যতদিন অব্যাহত থাকবে, ততদিন বাংলাদেশের ভারতপন্থী সরকারের এসব অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোনো প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা আমি অন্তত দেখি না। সেরকম কোনো আশঙ্কা থাকলে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের (Bangladesh Development Forum) ঢাকা বৈঠকের সময় দেশকে এ ধরনের অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে নেয়ার ঝুঁকি কোনো অবস্থাতেই নিত না। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ জাতীয় আন্তর্জাতিক বৈঠকের প্রাক্কালে সরকার পারতপক্ষে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চান না। সব বিবেচনাতেই আমরা এক ব্যতিক্রমধর্মী সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে পাচ্ছি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দিন যে সত্যিই বদল করতে পেরেছে, তাতে আর সন্দেহ কী?

জনগণের জন্য অধিকতর বিপদের কারণ হলো, প্রধান বিরোধী দলও অনেকটা আপস করেই কোনোক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করার কৌশল গ্রহণ করেছে। এতদিন সংসদ বর্জন করে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকের ঠিক দিন কয়েক আগে সংসদে প্রত্যাবর্তনের আকস্মিক সিদ্ধান্ত কেন তারা গ্রহণ করলেন, তা তারাই ভালো জানেন। তবে কেবল বিদেশিদের সন্তুষ্টি অর্জন অথবা তাদের সহানুভূতি কুড়ানোর জন্যই যদি বিনাশর্তে এই ছাড়া দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এর মধ্য দিয়ে বিরোধী দলের রাজনৈতিক দীনতা, অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং জনগণের শক্তির ওপর আস্থাহীনতা প্রকাশ পেয়েছে। সরকারি দলের শিষ্টাচারবহির্ভূত, অসংসদীয় আচরণ অব্যাহত রাখা দেখে দেশবাসী এটাও বুঝতে পেরেছে যে, ক্ষমতাসীনরা বিরোধী পক্ষকে শক্তিহীন এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রতিদিন বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদে যাচ্ছেন এবং তাদের জীবিত অথবা মৃত শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশে সরকারি দলের অবমাননাকর কুৎসা হজম করে ওয়াক আউট করেছেন, পরের দিনের একই নাটকের অংশ নেয়ার জন্য।

এর ফলে তারা যে জনগণের কাছে নিজেদের ক্রমেই হাসির পাত্র করে তুলেছেন, সে বিষয়টি নীতিনির্ধারকরা বোঝেন কি না আমার জানা নেই। ক্ষমতাসীনদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী প্রবণতা জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ এবং রাজপথের আন্দোলন ছাড়া রোখা যাবে না, এই সহজ সত্যটি বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা যত দ্রুত করবেন, ততই দেশের মঙ্গল। পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোনো আপসকামিতা বার বার ফ্যাসিবাদকেই উৎসাহিত করছে। উটের মতো বালিতে মাথা গুঁজে আত্মরক্ষা কিংবা দেশরক্ষা শেষ পর্যন্ত কোনোটাই হবে না।

“

বাংলাদেশে গুম কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। ২০০৯ পরবর্তীকাল থেকে আজ অবধি রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছে শান্তি প্রিয় অনেক নিরীহ মানুষ। সরকারের প্রতিটি আইনশৃঙ্খলাবাহিনী বলছে- গুম, অপহরণ তারা করছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুম নামের শব্দও খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ নির্মম সত্য যে, প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায়, চ্যানেলে অথবা লোকালয়ে গুমের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

”

‘গুম’-এর সালতামামি

কারা সেই তৃতীয় পক্ষ?

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বাংলা ভাষায় গুম একটি নেতিবাচক শব্দ। অভিধানে গুম মানে ‘অন্তর্ধান’, ‘অদর্শন’, ‘অনুপস্থিতি’ ‘অপহরণ’ এবং নিখোঁজ হওয়া। কিন্তু গুমের আছে আরো ব্যাখ্যা। বাংলাদেশের মামলাবাজ মানুষেরা শত্রুকে জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা কৌশলে ধরে এনে হত্যা করে। কখনো কখনো স্বজনকে লুকিয়ে রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে মামলা করে। এভাবে গুমের ব্যক্তিগত ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আলোচিত বিরোধী বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলী যখন গুম হন, তখন শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ‘গুম’-এর গ্রামীণ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তার ভাষায় ‘আলী এবং তার ড্রাইভার তার দলের নেতাদের নির্দেশে লুকিয়ে আছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যাতে সরকারকে দোষারোপ করা যায়।’ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গুমের সংজ্ঞাটি এ রকম- "A forced disappearance (or enforced disappearance) occurs when a person is secretlz abducted or imprisoned bz a state or political organization or bz a third partz with the authorization, support, or acquiescence of a state or political organization, followed bz a refusal to acknowledge the person's fate and whereabouts, with the intent of placing the victim outside the protection of the law. আমাদের রাজনীতির সাথে এ সংজ্ঞার অনুরণন লক্ষ করা যায়। এ সংজ্ঞায় তৃতীয় পক্ষের যে অবস্থান ও কর্তৃত্বের কথা বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সাম্প্রতিককালে গুম শব্দটি রাজনৈতিকভাবে বহুল আলোচিত একটি শব্দ। পুরনো ইতিহাসে গুমের কথা থাকলেও এর রাজনৈতিক ব্যবহার স্বাধীনতা অব্যবহিত পর থেকে। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে জাসদ অভিযোগ করে যে, তাদের ৪৫ হাজার কর্মীকে আওয়ামী লীগ সরকার গুম বা অপহরণ করে হত্যা করে। মহিউদ্দিন আহমদ তার 'জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি' গ্রন্থে এসব খুন ও অপহরণের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রের আধা সামরিক বাহিনী 'রক্ষী বাহিনী'র বিরুদ্ধে এসব সহিংসতার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। তারপর অনেক বছর গুম হয়নি তা নয়। তবে রাজনৈতিক গুমের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়নি। ২০০৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতাসীন হয়, তখন রাজনৈতিক গুমের সংখ্যা বেড়ে যায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-২০১২ সালের ২৬ এপ্রিল তাদের প্রতিবেদনের শিরোনাম দেয় : Bangladesh : Alarming Rise in 'Disappearances.' এই সীমিত পরিসরে ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। আর ২০১৬ সমাপনীতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে গুমের উৎসমূল অনুসন্ধান এবং ঘটনার কুশীলবদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা নেয়া।

২০১৩ সালে গুমের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে এসব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' গুমের ঘটনা ঘটে।

১. ২০১০ সালের ২৫ জুন ঢাকা সিটি করপোরেশনের জনপ্রিয় কমিশনার চৌধুরী আলমকে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী গ্রেফতার করে। পরে তারা এর দায়িত্ব অস্বীকার করে। সাম্প্রতিক সময়ে এটিই প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক গুম।

২. বিএনপির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ইলিয়াস আলী ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল গুম হন। ওই দিন মধ্যরাতে তিনি তার ড্রাইভারসহ ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর তার আর হদিস মেলেনি। এর প্রতিবাদে আহূত হরতাল এবং আন্দোলনে ৫ জন নিহত হন, আহত হন অনেকে। রাজনৈতিক ময়দানে এ ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়।

৩. বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিকদের জনপ্রিয় নেতা আমিনুল ইসলামের লাশ পাওয়া যায় ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল। এর কয়েক দিন আগে তাকে অপহরণ করা হয়। তার শরীরে আঘাত ও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল। আন্তর্জাতিক গার্মেন্ট মার্কেটে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

৪. বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সালাউদ্দিন আহমেদকে একদল অচিহ্নিত ব্যক্তি ২০১৫ সালের ১০ মার্চ উত্তরা থেকে জোরপূর্বক তুলে নেয়। পরে তাকে পুলিশ আসামের শিলং থেকে গ্রেফতার করে। তিনি এখনো ভারতে অন্তরীণ আছেন। তার অপহরণ বিরাট রহস্যময়তা সৃষ্টি করে।

৫. যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন তার এলাকার একজন সংখ্যালঘু ব্যক্তি- সুখরঞ্জন বালি। অভিযোগ করা হয়

যে, ২০১২ সালের ৫ নভেম্বর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা তাকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে কলকাতার দমদম জেলখানায় খুঁজে পাওয়া যায়।

৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার চুরি হয়ে যাওয়ায় তানভীর হাসান জোহা নামে একজন আইটি বিশেষজ্ঞ ব্যাংকের এক কর্তাব্যক্তির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণের কথা বলেন। বাংলা ট্রিবিউনের সাথে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার পর দিন ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ তাকে অপহরণ করা হয়। ছয় দিন পর তাকে পাওয়া যায়।

৭. নিজামউদ্দিন মুন্না নামের এক ছাত্রনেতাকে ২০১৩ সালে তার বাসা থেকে র‍্যাব পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু র‍্যাব তা অস্বীকার করে। তিনি ছাত্রদলের বিমানবন্দর থানার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন।

৮. ছাত্রনেতা আবদুল কাদের ভূইয়া মাসুমকে ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর অপহরণ করা হয়। তিনি সরকারি তিতুমীর কলেজের ছাত্রদলের নেতা ছিলেন এবং এনএসআইয়ের একজন চাকরিপ্রার্থী ছিলেন।

৯. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার একজন ব্যবসায়ী সাহানুর আলমকে ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল র‍্যাব-১৪ গ্রেফতার করে। ৬ মে তিনি কুমিল্লা জেলে মৃত্যুবরণ করেন। তার পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, র‍্যাবের নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে। ১ জুন এ ঘটনায় কোর্টে মামলা দায়ের হয়। বিচারক এই মামলায় তদন্তের আদেশ দেন। এ বিচারককে তার পর দিনই বদলি করা হয়।

১০. যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত অধ্যাপক গোলাম আযমের ছেলে বরখাস্তকৃত ব্রিগেডিয়ার আজমিকে সাদা পোশাকের লোকেরা তুলে নেয়। তারা ছিল সংখ্যায় জন ৩০। পরিবার অভিযোগ করে তারা সবাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোক ছিল। এর আগে অন্য কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীর সন্তানদের তুলে নেয়া হয়। যথারীতি কর্তৃপক্ষ তাদের বিষয়টি অস্বীকার করে। এ পর্যন্ত তাদের খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। বিএনপি এবং তাদের ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, তাদের অসংখ্য নেতাকর্মীকে গুম করে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেকে এখনো নিখোঁজ রয়েছে। ছাত্রদল তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অপহরণকৃত ছাত্রনেতাদের সচিত্র প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। তালিকাটি অনেক দীর্ঘ।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৩ সাল থেকে চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ২৮৪ জন গুম হয়েছেন। এদের মধ্যে ২০১৩ সালে ৫৩ জন, ২০১৪ সালে ৮৮ জন, ২০১৫ সালে ৫৫ জন গুম হয়েছেন। ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত গুম হয়েছেন ৮৮ জন। এই ৮৮ জনের মধ্যে আটজনের লাশ পরে পাওয়া গেছে। ফেরত এসেছেন তিনজন। গ্রেফতার হয়েছেন ২০ জন। অপর ৫৭ জনের কোনো হদিস মেলেনি। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে সিটি করপোরেশনের প্যানেল মেয়র একজন, জামায়াতে ইসলামীর একজন, ছাত্রশিবিরের দু'জন, ব্যবসায়ী ছয়জন, আইনজীবী একজন

ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার এবং বিভিন্ন পথ ও মতের মানুষ রয়েছেন। এসব ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের সাত খুনের ঘটনা। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তাসহ তাদের বিচারকার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ- একজনকে হত্যা করার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তা ৫০ লাখ টাকা নেন। অপহরণের সময় যারা ঘটনাটি দেখে ফেলে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। দেশে বিদেশে এসব হত্যাকাণ্ড ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এসব গুমের জন্য সরকারকে দায়ী করে। তারা এসব ক্ষেত্রে জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে। পৃথিবীর তাবৎ মানবাধিকার সংগঠন- জাতিসঙ্ঘ, অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইত্যাদি সংগঠন জবরদস্তিমূলক অপহরণ তথা গুমের তীব্র নিন্দা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং ইইউ অব্যাহতভাবে এ ধরনের কার্যক্রমের নিন্দা করে যাচ্ছে।

এসব গুম, অপহরণের জন্য পরিবার, প্রত্যক্ষদর্শী লোকজন, গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন- সবার পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করা হয়। প্রতিটি অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। পুলিশ, র‍্যাব এবং অন্যান্য বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায় একই রকম বক্তব্য দেয়া হয়। 'আইনশৃঙ্খলাবাহিনী সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আসামি গ্রেফতার করে। কোনো আসামিকে গ্রেফতারের সময় র‍্যাব সদস্যরা নিজেদের পরিচয় দেন এবং গ্রেফতারের পর আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় সোপর্দ করেন। এ ক্ষেত্রে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। দুর্বৃত্তরা অনেক সময় র‍্যাব বা ডিবি পরিচয় দিয়ে অপহরণ করে থাকতে পারে। অপহরণ মামলায় বিভিন্ন সময়ে আসামি গ্রেফতার হওয়ার পর র‍্যাব অনেক সময়ই জানতে পারে যারা গ্রেফতার করেছে তারা ভুয়া র‍্যাব বা ডিবি। এমন অনেক প্রমাণ পেয়েছে র‍্যাব। তাই যারা র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ আনে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' যুক্তির খাতিরে যদি কর্তাব্যক্তিদের এসব কথা বিশ্বাস করা হয় তাহলে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, গুম বা অপহরণকারীর আত্মীয়স্বজনেরা কি মিথ্যা বলছেন? তারা তো সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েই তাদের বক্তব্য প্রমাণ করছেন। যদি তাদের কথা মতো ভুয়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গুম করে থাকে তার প্রতিকার করাও তাদেরই দায়িত্ব। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ বলেছেন, 'দেশে গুম বলতে কোনো শব্দ নেই। যারা গুম হচ্ছে তারা হয় স্বেচ্ছায় পলাতক নতুবা আত্মগোপনে রয়েছে। কিছু দিন পর দেখা গেছে তারা ফিরে এসেছে।'

অপর দিকে, আইন ও বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, 'গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যার বিষয়গুলো সব দেশের সরকারই অস্বীকার করে। যারা গুম হন তাদের বিষয়ে বলে থাকে হারিয়ে গেছে, নিখোঁজ আছে।' সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন পত্রিকান্তরে বলেন, 'ভিকটিমের আত্মীয়স্বজন প্রমাণ দিয়ে বলছেন, তাদের স্বজনকে নিরাপত্তাবাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অথব আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো এটা বরাবরই অস্বীকার করছে। আমি মনে

করি গুম বা অপহরণ যাই হোক, এটি একটি গুরুতর ফোজদারি অপরাধ। আর কেউ স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হলে তাদের খুঁজে বের করার দায়িত্বও পুলিশের। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'যাদের নাম করে এসব ব্যক্তিকে তুলে নেয়া হচ্ছে সেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরই দায়িত্ব গুমের শিকার ব্যক্তিদের খুঁজ বের করা। আমরা যদি ধরেও নেই অপরাধী চক্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভুয়া পরিচয়ে বিভিন্নজনকে অপহরণ করছে বা তারা (ভিক্টিম) স্বেচ্ছায় নিখোঁজ হচ্ছে তাহলেও তাদের খুঁজে বের করতে না পারলে তারা যেকোনো সময় বড় ধরনের নাশকতা ঘটাতে পারে। তিনি আরো বলেন, পুলিশের পোশাক, হ্যান্ডকাফসহ পুলিশের ব্যবহৃত সামগ্রী অবাধে বিক্রির বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা উচিত।' উল্লেখ্য, বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার সংক্রান্ত ফৌজদারি কার্যবিধি ৫৪ ধারা ও রিমান্ড সংক্রান্ত ১৬৭ ধারা নিয়ে সম্প্রতি ঐতিহাসিক রায় প্রদান করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এই দুই ধারার বিষয়ে তারা এর আগে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখেন। আপিল বিভাগ তাদের পূর্ণাঙ্গ রায়ে গুম বা অপহরণের মতো বিষয় থেকে নাগরিকদের রক্ষার জন্য ১০ দফা গাইডলাইন দেন। এ ছাড়া দেশের সর্বোচ্চ আদালত আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর দায়িত্ব পালনের বিষয়েও সাত দফা নির্দেশনা দেন। এসব নির্দেশনায় বলা হয়, 'গ্রেফতারের স্থান ও সময়ে ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ গ্রেফতারের পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন। গ্রেফতারের সময় ও স্থান এবং আটক রাখার জায়গা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়কে জানাতে হবে। কোন যুক্তিতে কার তথ্য বা অভিযোগে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ঠিকানাসহ তা কেস ডায়েরিতে লিখতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারের জন্য কাউকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখানো যাবে না। গ্রেফতারের সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও উপস্থিত মানুষের সামনে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা তাদের পরিচয় বলতে হবে। প্রয়োজনে পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। ব্যক্তির গ্রেফতার যদি তার বাসা বা কর্মক্ষেত্র না হয় সে ক্ষেত্রে থানায় নেয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যে বিষয়টি তার স্বজনকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।' উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় আরো বলা হয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেবল দায়িত্ব পালনে আবশ্যক হলেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মানুষের জীবন ও মর্যাদা রক্ষায় সর্বোচ্চ অধিকার দেবে। সুপ্রিম কোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ (২) ধারা অনুসারে আইনবিষয়ক কিছু নির্দেশনা দেন। এসব নির্দেশনা বাস্তবে মেনে নেয়া হলে আশা করা যায় সরকারি বাহিনী কর্তৃক গুম ও অপহরণের মাত্রা কমে আসবে। তবে সবকিছুই সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ নিশ্চয় এটা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে গুম কোনো স্বাভাবিক বিষয় নয়। বিশেষ করে ২০০৯ পরবর্তীকালে এটি রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছে। আমরা দেখলাম সরকারের প্রতিটি আইনশৃঙ্খলাবাহিনী বলছে- গুম, অপহরণ তারা করছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুম নামের শব্দও খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ নির্মম সত্য যে, প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায়, চ্যানেলে অথবা লোকালয়ে গুমের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কারা করছে এসব নির্মম হত্যাকাণ্ড? সরকার কখনো কখনো যেমনটি শীর্ষ নেতৃত্বের কথায়

প্রতিফলিত- বিরোধী দলকে গুমের জন্য, অপহরণের জন্য প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে দায়ী করছে। সরকার প্রায়ই ২০১৫ পরবর্তী রাজনৈতিক সহিংসতার উদাহরণ দিয়ে থাকে। সরকারের অভিযোগ যদি সত্যও হয় তাহলে প্রশ্ন করা যায় সেখানে তো গুম, অপহরণের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। তবে এটা সত্যি কথা যে–

ক. রাজনৈতিক অস্থিরতার সময়ে অপরাধীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর নামে তারা কখনো কখনো অপরাধ করতেই পারে। কিন্তু সেটি ব্যাপকভাবে বা বাহিনী আকারে করা সম্ভব নয়। গণমাধ্যমে কখনো কখনো ভুয়া পুলিশের প্রতিবেদন দেখা যায়। তারা সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু বিগত ২০০৯ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সাত বছরে কখনো কোথাও জালিয়াত ধরা পড়েনি। অপহরণ বা গুমের মাত্রায় আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর অন্তর্ভুক্তি কতটা নির্মম হতে পারে- নারায়ণগঞ্জের ঘটনা তার প্রমাণ।

খ. গুম বা অপহরণের সংজ্ঞায় আমরা তৃতীয় পক্ষের অবস্থান, অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তার কথা জানতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এবং বাস্তবায়নে গোয়েন্দাদের জুড়ি নেই। আজকের জটিল ও কুটিল বিশ্বে ষড়যন্ত্রের জাল সর্বত্র প্রসারিত। বাংলাদেশে মাঝে মধ্যে গুজব শোনা যায়, আমাদের বিষয়ে 'দূরের অথবা কাছের' বন্ধুরা সক্রিয় রয়েছে। জঙ্গি দমনে প্রাথমিক সময়গুলোতে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ আকারে-ইঙ্গিতে এসব কথা বলেছেন। সচেতন পাঠককে, 'আইএস আছে, আইএস নেই' বিতর্কটি মনে করিয়ে দিতে চাই।

গ. সন্ত্রাস দমনের বিষয়টি এখন একটি বৈশ্বিক বিষয়। আমাদের নেতানেত্রীরা মাঝে মধ্যেই তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যানারে অনেক সংগঠনের জন্ম হয়েছে। যতটা জানি সার্ক কাঠামোর অধীনে সন্ত্রাস দমনে একটি 'জয়েন্ট টাস্কফোর্স'-এর অস্তিত্ব রয়েছে। পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং মালদ্বীপ এ জয়েন্ট টাস্কফোর্স সংগঠনে তেমন সক্রিয় নেই বলে জানি। আফগান সরকার যদিও ভারতের প্রযত্নে রয়েছে তবুও সুদূর বাংলাদেশে তাদের আগ্রহ থাকার কথা নয়। তাহলে সাকের নামে অথবা ভারত বাংলাদেশ নামে যে টাস্কফোর্স রয়েছে- তারা কি আমাদের সন্ত্রাস দমনে সরাসরি কোনো ভূমিকা রাখছে? তা রাখতে গিয়ে তারা বদনামের কারণ হতে পারে।

ঘ. সরকারের অজান্তে কোনো তৃতীয় শক্তি কি এ কাজটি করছে? স্থানীয় পর্যায় এখন যেমন, 'নিরাপত্তা ব্যবসা' জমে উঠেছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কি এ রকম কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন আমাদের সর্বনাশ সাধন করছে?

ব্যক্তি ব্যক্তি করেই সমষ্টি। সুতরাং সমষ্টিতে জাতীয়ভাবে নাগরিক মনস্তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। গুম, খুন, অপহরণে আমাদের যে রণকৌশল রয়েছে, বর্তমান প্রেক্ষিতে তারই হয়তো প্রতিফলন ঘটছে। একজন ব্যক্তি যেমন তার স্বার্থ সুবিধার জন্য ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, লাভ-লোকসানের চিন্তা করতে চায় না, তেমনি একটি সরকার যদি একান্তই দলীয় আবেশে সিক্ত হয়ে যায় তাহলে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য এমন কিছু নেই যে

তারা করতে পারে না। এর প্রতিকার দুটো উপায়ে হতে পারে- প্রথমত, সরকার যদি তার রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত বুঝতে পারে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ সদিচ্ছা সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, নাগরিক সাধারণ তাদের নিজ স্বভাব-চরিত্র, বিষয়-বৈশিষ্ট্য এবং অর্জিত আদর্শের দ্বারা সরকারের নীতিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আমাদের সিভিল সোসাইটি তা প্রমাণ করেছে। যত শিগগির সম্ভব নাগরিক সাধারণ সবার মঙ্গলের জন্য যদি সুশাসন নিশ্চিত করে তাহলেই মঙ্গল। সুতরাং 'সুভস্য শীঘ্রম'।

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মজলুমের কণ্ঠস্বর, ০৬ জানুয়ারি ২০১৭

> দেখামাত্রই গুলির সিদ্ধান্ত সরকারের। দ্রুত বিচার আদালতের কোর্টে আর বিচারের দরকার নেই।' এই যদি হয় সরকারের অবস্থান তাহলে দেশের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করতে একটি বিভীষিকাময় চিত্র শুধু ভেসে উঠবে।

গুলির পর কী?

আলফাজ আনাম

দমন-পীড়ন আর গুলিতেই রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান দেখছেন সরকারের নীতিনির্ধারকেরা। মন্ত্রী থেকে পুলিশের আইজি, র‍্যাব আর বিজিবির ডিজি গুলি করার মাধ্যমে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন। তাদের চোখে সরকারবিরোধী আন্দোলনে হরতাল ও অবরোধের নামে যা হচ্ছে তা সন্ত্রাস। সাধারণ মানুষের চলাচল বাধাগ্রস্ত করা। সরকারের অনেক মন্ত্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে দেশে এখন আইনশৃঙ্খলার সমস্যা বিরাজ করছে। পুলিশ র‍্যাব ও বিজিবি দিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তারা হয়তো ভুলে গেছেন গত ৫ জানুয়ারি বিএনপির সমাবেশের ঘোষণা দেয়ার আগে দেশে তো এমন অবস্থা ছিল না। সমাবেশে অনুমতি না দেয়া ও খালেদা জিয়াকে অবরুদ্ধ করার পর থেকে দেশে অচলাবস্থা চলছে। মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। রাজধানীসহ সারা দেশে সহিংসতা শুরু হয়েছে। তাহলে এই সমস্যা নিতান্ত আইনশৃঙ্খলার সমস্যা নয়, পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক সমস্যা।

রাজনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধানের চেষ্টা না করে বন্দুকের মাধ্যমে সমাধানের যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে এখন রক্তাক্ত পরিণতির দিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গুলি করে দমন করা হবে বলে প্রথম ঘোষণা দিয়েছিলেন জাসদের নেতা মঈন উদ্দিন খান বাদল। তার কথার এখন প্রতিফলন পাওয়া যাচ্ছে ক্ষমতাসীন

দলের নেতা, পুলিশের আইজিপি এবং র‍্যাবের ডিজির কথায়। আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ যে সাবেক বাম উগ্রবাদীদের হাতে চলে গেছে বাদলের কথার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণ হচ্ছে।

মঈন উদ্দিন খান বাদল হচ্ছেন সেই জাসদের নেতা যে দলের হাতে বহু আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ৭২-৭৪ সালে নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকজন সংসদ সদস্য ছিলেন। আবার জাসদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে মুক্তিযোদ্ধাসহ জাসদের ৩০ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। জাসদের সাবেক এক নেতার সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সাথে উগ্রবাদী বামদের সম্পৃক্ততার বিবরণ উঠে এসেছে। সেই জাসদের নেতারা এখন বিরোধী নেতাকর্মীদের সরাসরি বুকে গুলি চালিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন দমনের কৌশল নির্ধারণ করছেন। এর পর থেকে আমরা দেখছি সরকারের একাধিক মন্ত্রী গুলি করার ঘোষণা প্রকাশ্যে দিয়েছেন।

খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ১৮ জানুয়ারি বিবিসির সংলাপে বলেছেন অস্ত্র দিয়েই বিএনপির সন্ত্রাস দমন করা হবে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী সৈয়দ মহসিন আলী গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছেন, দুষ্কৃতকারীদের দেখামাত্রই গুলির সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, নাশকতাকারীদেরকে মানবতা দেখানো যায় না। এদেরকে শ্যুট অ্যান্ড সাইডের ভিত্তিতে কঠোরভাবে দমন করা হবে। 'দুষ্কৃতকারীদের চিহ্নিত করে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় আমরা তাদের বিচার করবো। দ্রুত বিচার আদালতের কোর্টে আর বিচারের দরকার নেই।' এই যদি হয় সরকারের অবস্থান তাহলে দেশের পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করতে একটি বিভীষিকাময় চিত্র শুধু ভেসে উঠবে।

মন্ত্রী এমপিরা যখন গুলি করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রকাশ্য রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তা বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছে।

বিজিবি মহাপরিচালক ১৫ জানুয়ারি সাংবাদিকদের বলেন, 'একজন ব্যক্তি যদি বোমা ফাটায়, তাহলে পাঁচজন লোক নিহত হতে পারে। এ দৃশ্য কোনো বিজিবি সদস্যের নজরে এলে ওই বোমা বহনকারীকে ক্যাজুয়ালটি (হতাহত) করা তার দায়িত্ব।' (প্রথম আলো, ১৬ জানুয়ারি ২০১৫)।

কে বোমা ফাটাচ্ছে আর সেই বোমায় মানুষ মারা যাবে কি না তা কিভাবে নিশ্চিত করবে বিজিবি? যদি কেউ বোমা ফাটায় তাহলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হতে পারে। কিন্তু বিচারের আগে তাকে গুলি করার অধিকার বিজিবি কোনো আইনে পেতে পারে না। হ্যাঁ, বিজিবি এই অধিকার পাবে শুধু সীমান্তে। যদি বিদেশীদের হাত থেকে এ দেশের ভূখণ্ড ও মানুষকে রক্ষার জন্য হয়। এ দেশের মানুষকে হত্যার কোনো অধিকার তো বিজিবির নেই।

বিজিবির প্রধান যখন গুলির ঘোষণা দিয়েছেন তখন পুলিশের আইজি দেশের রাজনীতিতে

কার কী ভূমিকা তা নির্ধারণ করে বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মোকাবেলার হুমকি দিয়েছেন। ১৬ জানুয়ারি রংপুরের মিঠাপুকুরে পুলিশের আইজি এ কে এম শহীদুল হকের বক্তব্যটি আমরা দেখি। তিনি বলেছেন, বিএনপির ভুলের খেসরাত জনগণ দেবে না। ৫ জানুয়ারি সমাবেশ করতে দিলে যদি হত্যা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ হতো, তখন টকশোওয়ালারা কী করতেন? এর দায় পড়তো সরকারের ওপর। বিএনপির উদ্দেশে পুলিশের আইজি বলেন, একটা দলের প্রধান তিনি যদি বেআইনি কাজ করেন তার কাছ থেকে জনগণ কী চাইবে। আপনারা ভোট প্রতিরোধ করলেন, ভোটকেন্দ্রে লোক আসতে দিলেন না। ভোটের কেন্দ্রগুলো যেখানে সেই স্কুল, কলেজ, মাদরাসাগুলো পুড়িয়ে দিলেন। মানুষ মারলেন, প্রিজাইডিং অফিসার, জনগণকে ভোটের অধিকার দিলেন না। কেন? ভুল আপনারা করছেন, জনগণ খেসারত দেবে? তা এই দেশে আমরা করতে দেবো না ইনশাআল্লাহ। তিনি আরো বলেন, আমরা গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে, আমরা নির্বাচিত সরকারের পক্ষে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে কাজ করে যাবো জনগণকে সাথে নিয়ে। কোনো অপশক্তি, কোনো সন্ত্রাসী বাংলার মাটিতে কখনো তাদের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ সেটা আমরা নির্মূল করে ছাড়ব। তিনি বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে আন্দোলনের নামে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও নাশকতা নির্মূলে কাজ করে যাবো। জনগণকে সাথে নিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতিহত করা হবে ঘোষণা দিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিগুলোর দুর্বলতার কারণে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলো আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তবে মানবতাবিরোধী, সন্ত্রাসী, দেশ ও জনগণের শত্রুদের রুখতে হবে। অবরোধ আর হরতাল সংবিধান পরিপন্থী। হরতাল আর অবরোধের নামে যারা দেশের সম্পদ নষ্ট করছে সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে তাদের কোনোভাবেই ছাড় দেয়া হবে না। শুধু মিথ্যাচার করছে। এই অপশক্তিকে নির্মূল করতে হলে পুলিশের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে একসাথে কাজ করতে হবে।

জ্বালাও-পোড়াও হরতাল ও অবরোধকারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি বলেন, সংবিধানের কোথাও লেখা নেই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করতে হরতাল ও অবরোধ দিয়ে মানুষ মারা ও জনগণের সম্পদ নষ্ট করতে হবে। হরতাল-অবরোধের মতো সংবিধান পরিপন্থী কাজ করে জ্বালাও-পোড়াওয়ের মাধ্যমে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। সংবিধানে রয়েছে প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমাবেশ করার অনুমতি। (মানবজমিন, ১৭ জানুয়ারি ২০১৫)

এই দীর্ঘ বক্তব্যটি পাঠক যখন পড়বেন নিশ্চয়ই মনে করবেন আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বক্তব্য রাখছেন। না, এ বক্তব্য আওয়ামী লীগের কোনো নেতার নয় বাংলাদেশের পুলিশ প্রধানের বক্তব্য। তিনি বিরোধী রাজনীতি নির্মূলের ঘোষণা দিয়েছেন। বাস্তবতা হচ্ছে রংপুর ঘুরে আসার পরও সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। এখন পর্যন্ত ঢাকা-রংপুর হাইওয়ে স্বাভাবিক হয়নি। শহীদুল হকের পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে সমাবেশ করেছেন। তিনি আইজির মতো এত কঠোর বক্তব্য

দেননি। কারণ তিনি সেখানে পা দিয়েই হয়তো পরিস্থিতি বুঝে ফেলেছেন। সমাবেশে এক হাজার লোকও হয়নি। পুলিশের আইজির পক্ষে ঢাকায় বসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের রাজনীতির শিকড় অনেক গভীরে। উত্তরাঞ্চলে আওয়ামী লীগের সংগঠন দুর্বল তা-ও নয়। কিন্তু মানুষ আওয়ামী লীগের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কারণ তারা ভোট দিতে পারেনি। সেই ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পক্ষে সাফাই গাওয়া আইজির কাজ নয়।

এই সমাবেশে র‍্যাবের ডিজি বেনজীর আহমেদ দলীয় বক্তৃতা করেছেন। তিনি বলেছেন নির্ধারিত সময়ের পরই নির্বাচন হবে। জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। এর বাইরে আমরা কোনো কিছুই চাই না। বিএনপি-জামায়াতকে উদ্দেশ্য করে র‍্যাবের ডিজি বলেন, গত দুই সপ্তাহে মিঠাপুকুরে পাঁচজনসহ সারাদেশে ২৪ জনকে খুন করা হয়েছে। ২০১৩ সালের মতো একটি গোষ্ঠী তাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থ উদ্ধার করার জন্য দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা দেশের গণতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছে। তারা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে। তারা সন্ত্রাসী। তারা গণতন্ত্রের নামে বোমাবাজি করে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এসব খুনিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। দেশবাসীকে সাথে নিয়ে এগুলোকে ২০১৩ সালে আমরা একবার রুখে দিয়েছি, এবারো রুখে দেবো ইনশাআল্লাহ। (মানবজমিন, ১৭ জানুয়ারি ২০১৫)

র‍্যাবের ডিজি এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি কিভাবে বলেন কখন নির্বাচন হবে। তিনি বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ইঙ্গিত করে বলেছেন একদল লোক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। কে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তার মূল্যায়ন ভবিষ্যতে হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭১-এর শরণার্থীর মতো লোকজন পালিয়ে যাওয়ার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আওয়ামী লীগের রাজনীতি সমর্থন করেন না এমন লোকদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে র‍্যাব-পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেতনের টাকা কি শুধুই আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ট্যাক্সের টাকায় আসে? র‍্যাব বা পুলিশের কোনো কর্মকর্তা যদি রাজনীতি করতে চান তাহলে তাদের উচিত সরকারি চাকরি ছেড়ে দেয়া।

রংপুরের মিঠাপুকুরে পুলিশের আইজি ও র‍্যাবের ডিজি জনগণের সাথে মতবিনিময় করতে গিয়েছিলেন। কতজন জনগণ এসেছে টেলিভিশনের পর্দায় তা দেখা গেছে। র‍্যাবের ডিজি বলেছেন, ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে তিনি নাকি জনগণের আন্দোলন রুখে দিয়েছিলেন। যদি রুখেই দিয়ে থাকেন তাহলে মানুষ কেন ভোটকেন্দ্রে গেল না। যদি তাদের ওপর মানুষের আস্থা থাকত তাহলে ৫ শতাংশের কম ভোট কেন পড়ল?

সরকারের মন্ত্রী থেকে র‍্যাব-পুলিশ প্রধানের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট সরকারের ক্ষমতার রশি ঢিলে হয়ে গেছে। তারা শেষ কার্ডটি খেলে ফেলেছেন। গুলির ভয় দেখানোর পর আর কিছু

থাকে না। পুলিশ র‍্যাব গুলি করলে মানুষ মারা যাবে এটা বোঝা কঠিন কিছু নয়। আন্দোলনকারীরা যদি এই ভয় জয় করে ফেলে তাহলে গুলিতে কোনো কাজ হবে না। হ্যাঁ, কিছু নিরীহ মানুষ মারা যেতে পারে। যেমন কয়েক দিন ধরে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন '৭১ কিংবা '৯০-এ এভাবে গুলি করা হয়েছিল। এভাবেই গুলির ভয় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু মানুষ তার অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। মনে রাখতে হবে বর্তমান আন্দোলন শুধু বিরোধী দলের ক্ষমতায় যাওয়ার আন্দোলন নয়। মানুষ ভোট দিতে পারেনি সেই ক্ষোভের আন্দোলন। ভোটের অধিকার ফিরে পাওয়ার আন্দোলন। এ ধরনের আন্দোলন বলপ্রয়োগের কারণে ব্যর্থ হওয়ার নজির নেই।

২০ জুন ২০১৫

> পুলিশের যাচ্ছেতাই আচরণে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ সাধারণ মানুষ। মাত্রারিক্ত উৎসাহী ভূমিকায় থেকেছে সরকারের কাছে আস্থাভাজন হয়ে সুবিধা হাতিয়ে নিতে। সরকারও ক্ষমতার মোহে এ অফার লুফে নিয়েছে। যারা সরকারের পায়রবি করেছে, আনুগত্যের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেছে তাদেরকে সরকার নানাভাবে সম্মানে ভূষিত করেছে। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীরা রয়ে গেছে ক্রীতদাসের মতোই।

পুলিশের রাজনৈতিক আচরণ

আলী কাদের

'আকাশের যত তারা/পুলিশের তত ধারা'- এ প্রবাদ বাক্যটিও রীতিমত প্রচলিত আছে। পুলিশ আপনাকে যে কোনভাবে ফাঁসিয়ে দিতে পারে, এমনকি আপনার জীবনের নিরাপত্তাও হুমকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে। জীবনকে করে তুলতে পারে অসহনীয় অতিষ্ট। নানা হয়রানির কৌশল আপনার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে আপনাকে রীতিমতো নাজেহাল করতে পারে। এটা নতুন কোন ইতিহাস নয়। স্বাধীনতা পূর্বযুগেও বাংলাদেশ পুলিশের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি-রাহাজানি, নিপীড়ন-নির্যাতনের ডায়েরিও বেশ সমৃদ্ধ। এই অ্যালবামটি নতুন রেকর্ডে নতুন সুরের সংযোজন হয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী বাকশালী সরকারের ক্ষমতারোহণের পর থেকে। পুলিশকে তারা নতুন এক ড্রেসআপ করেছে। মূলত এই পুলিশ বাহিনীকে দিয়েই তারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে। পুলিশকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের এমন নজির বাংলাদেশ আগে কখনো দেখেনি। আওয়ামী অবৈধ সরকার এই বাহিনীকে দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে, বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ও ভিন্নমতের বিরুদ্ধে যতভাবে সম্ভব অপব্যবহার করেছে। অসহায় নাগরিকদেরকে লা জওয়াবের মতো নীরব দর্শক হয়ে দেখতে হয়েছে এমন অপকর্মের মহা উৎসব। কাঁদছে আমার বাংলাদেশ। কাঁদছে আমার পতাকা। অশ্রুবানে ভিজে গেছে এখন ১লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি জমিন।

কখনো টাকার বিনিময়ে আবার কখনো আওয়ামীলীগের দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে পুলিশবাহিনী গুম, খুন, ধর্ষণসহ এমন কোন অপকর্ম নেই যে যেখানে পুলিশের সম্পৃক্ততা নেই। জনগণ বার বার এই নারকীয় অপকর্মের বিরুদ্ধে কণ্ঠ উদ্বেলিত করেছে। কিন্তু চুপ করে মুখ বন্ধ করে থাকার অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে বারংবার।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিরোধী মত দমনে নজিরবিহীন সাফল্য এখন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের তহবিলে। পুলিশের যাচ্ছেতাই আচরণে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ সাধারণ মানুষ। মাত্রারিক্ত উৎসাহী ভূমিকায় থেকেছে সরকারের কাছে আস্থাভাজন হয়ে সুবিধা হাতিয়ে নিতে। সরকারও ক্ষমতার মোহে এ অফার লুফে নিয়েছে। যারা সরকারের পায়রবি করেছে; আনুগত্যের পরাকাষ্ঠ প্রদর্শন করেছে তাদেরকে সরকার নানাভাবে সম্মানে ভূষিত করেছে। অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীরা রয়ে গেছে ক্রীতদাসের মতোই। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের হাল আমলের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচিতে যে ধরনের পদক্ষেপ দেখেছে এদেশের মানুষ তা মনে রাখবে বহু শতাব্দীকাল ধরে। রাষ্ট্রই পুলিশ; পুলিশই রাষ্ট্র– এমন হতাশাজনক পরিস্থিতি আর কখনো অতিক্রম করেনি বাংলাদেশ। পুলিশকে জনবিরোধী করে সাজানোর ইতিহাসও মনে হয় বাংলাদেশে এই প্রথম। জনগণের বন্ধু না করে পুলিশকে জনগণের আতঙ্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশের ইতিহাস কতটুকু সুখকর হবে তা দেখার জন্য ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আমাদের। নিম্নে সমকালীন আওয়ামী শাসনামলে পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের খণ্ড চিত্র তুলে ধরছি।

০১. ২৩ আগস্ট ২০০৯ র‍্যাব সদস্যরা একজন রিক্সা চালককে শারীরিক নির্যাতন করে। কারণ সে ট্রাফিক জ্যামের কারণে র‍্যাবের গাড়িকে সাইড দিতে সমর্থ হয়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় রিক্সা আরোহী দুই যাত্রীকে মারধর করে র‍্যাব সদস্যরা। র‍্যাব সদস্যরা রিক্সা আরোহীদের গ্রেফতার করে র‍্যাব অফিসে নিয়ে আসে। সেখানে তাদের নির্যাতন করে এবং অবশেষে র‍্যাব সদস্যদের মারার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২৪ আগস্ট ২০০৯/ আসক ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭৬)

০২. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমানের নেতৃত্বে র‍্যাব-১০ এর একটি দল ২২ অক্টোবর ২০০৯ নিউএজের সাংবাদিক এফ এম মাসুমকে যাত্রাবাড়িতে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং জনসম্মুখে নির্যাতন করে। র‍্যাব সদস্যরা মাসুমকে পেটায় এবং তার ক্ষতস্থানে লবন ছিটিয়ে দেয়। পরে তাকে র‍্যাব-১০ এর কার্যালয় নিয়ে যায়। মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ায় মাসুমকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশে অবশেষে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। র‍্যাবের আইন ও মিডিয়া উইং-এর পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'বহুল প্রচারিত নিউএজ পত্রিকার সাংবাদিক এফ এম মাসুম এবং র‍্যাব সদস্যদের মধ্যে সংঘটিত এরকম একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। ২৩ অক্টোবর বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মাসুম র‍্যাবের বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ি থানায় মামলা দায়ের করতে সমর্থ হননি। পুলিশ এজাহার গ্রহণ করে এবং হাসপাতালে মাসুমকে দেখতে যায় কিন্তু এজাহারটি নথিভুক্ত করেনি। ২৫ অক্টোবর হাসপাতালে মাসুমকে দেখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুও এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। (সূত্র: নিউএজ, ৮ ডিসেম্বর ২০০৯/আসক ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭৪)

০৩. ১৫ জুন ২০০৯ বরিশালে পুলিশের গাড়ির আঘাতে একটি টেম্পু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেম্পু ড্রাইভার এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাকে মারাত্মকভাবে পেটায়। পরে স্থানীয় লোকজন ধাওয়া করলে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ জুন ২০০৯/ আসক ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭৬)

০৪. ১৭ জুলাই ২০০৯ ধামরাই থানার পুলিশ কোন রকম গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া একজন ছাত্রদল নেতাকে গ্রেফতার করে এবং দুই দিন যাবৎ হেফাজতে রেখে নির্যাতন করে এক লাখ টাকা প্রদানে বাধ্য করে। (সূত্র: দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২২ জুলাই ২০০৯/ আসক ২০০৯, পৃষ্ঠা-৭৬)

০৫. ২১ জুন ২০০৯, র‍্যাবের হেফাজতে রেখে নির্যাতন এবং জোর করে স্ট্যাম্প কাগজে স্বাক্ষর করানোর অভিযাগে র‍্যাব-৩ এর কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন শফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন ব্যবসায়ী বিমল চন্দ্র ঘোষ। র‍্যাব কর্মকর্তা মেজর সিদ্দিকী কর্তৃক ব্যবসায়ী লিয়াকত হোসেন বাবুলকে নির্যাতন করার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৬ জুলাই বংশাল এলাকার ব্যবসয়ীরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা মেজর সিদ্দিকীকে গ্রেফতার ও তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। (সূত্র: দৈনিক সমকাল, ২ আগস্ট ২০০৯/ আসক, পৃষ্ঠা-৭৫)

০৬. ১৫ জুলাই ২০১১ রাতে হলি ফ্যামিলি স্টাফ কোয়ার্টারে খালার বাসা থেকে হেঁটে হলে ফেরার পথে সেগুন বাগিচায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কার্যালয়ের সামনে থেকে তাকে আটক করে খিলগাঁও থানার পুলিশ। সেখানেই তাকে বেদম মারধর করা হয়। পরে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে আরেক দফা কাদেরের ওপর নির্যাতন করা হয়। এক পর্যায়ে তৎকালীন খিলগাঁও থানার ওসি হেলাল উদ্দিন চাপাতি দিয়ে কাদেরের রানে কোপ দিয়ে জখম করে। এরপর পুলিশ কাদেরসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে পরের দিন ৩৯৯/৪০২ এবং অস্ত্র আইনের ১৯-এ ধারায় মামলা করে। তাকে আদালতে পাঠালে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। (সূত্র: বাংলানিউজটোয়েনটিফোরডটকম, ২৬ জুলাই ২০১১)

০৭. ৬ জুলাই ২০১১, মানিক মিয়া এভিনিউতে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিনের ওপর বরবর হামলা চালায় পুলিশ। এই ঘটনায় নেতৃত্ব দেয় মোহাম্মাদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার বিপ্লব। বিষয়টি এত পৈশাচিক ও নগ্ন ছিল যে, বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। পুলিশের এই হামলার ঘটনায় জাতীয় সংসদের স্পিকার আবদুল হামিদও দুঃখ প্রকাশ করেন। ৭ জুলাই বিএনপির সংসদীয় একটি প্রতিনিধি দল পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার (এডিসি) হারুন-অর-রশিদ ও মোহাম্মদপুর বিভাগের সহকারী কমিশনার বিপ্লব সরকারের বিরুদ্ধে শেরে-বাংলা নগর থানায় মামলা করতে যান। কিন্তু পুলিশ তাদের মামলা না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়। পরে ১২ জুলাই সিএমএম আদালতে পুলিশের ২ কর্মকর্তা এবং অজ্ঞাতনামা আরো ২৫ পুলিশ সদস্যের

বিরুদ্ধেমামলা দায়ের করলেও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ঢাকা মহানগর পুলিশের অপরাধ ও গোয়েন্দা তথ্য বিভাগের সহকারি কমিশনার মোঃ ওবায়দুল হক পুলিশকে 'নির্দোষ' উল্লেখ করে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে উল্লেখ করে। (সূত্র: দৈনিক সমকাল, ৮ জুলাই ২০১১, / দৈনিক প্রথম আলো,৬ জুলাই / নয়াদিগন্ত, ৭ জুলাই ২০১১)

০৮. ১০ জুন ২০১২, নরসিংদী জজ আদালতের মূল ফটকে জেলা যুগ্ম দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারিক হাকিম মো. ইমান আলী শেখ কে পুলিশের হেলমেট ও লাঠি দিয়ে পেটায়। ঘটনা তদন্তে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মোঃ মোখলেছুর রহমানকে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে প্রশাসন। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১০ জুন ২০১২/ দৈনিক জনকণ্ঠ, ১২ জুন ২০১২)

০৯. ১৫ জুন ২০১৩, রাজধানীর যাত্রাবাড়ির মীর হাজিরবাগ এলাকায় অবস্থিত তামিরুল মিল্লাত মাদরাসায় পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে ছাত্রাবাস থেকে ৬৬ জন শিক্ষার্থীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযানকালে পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালায়। এমনকি শিশু শিক্ষার্থীরাও নির্যাতনের শিকার হয়। আটককৃতদের মধ্যে ১৭ জনকে দেড় মাস আগের ৫ মে'র হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত গাড়ি ভাংচুর অগ্নিসংযোগ ও হামলার মামলায় আসামী দেখানো হলেও কথিত ১৭ জনের কারো নামেই মামলা নেই। (সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব ১৮ জুন ২০১৩)

১০. বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে ফেনীর বোগদাদিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে রুবেল ও রিয়াদ নামে দুই শিবির কর্মীকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই দুই শিবির কর্মীকে আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ, ২০ জুলাই ২০১৩)

১১. ৯ জানুয়ারি ২০১৫, রাজশাহীতে পিকেটারদের ধরতে না পেরে রাজশাহী কলেজ চত্বরে সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ সদস্যরা। তাদের মারধরে আহত হয় যমুনা টেলিভিশনের সাংবাদিক সোহরাব হোসেন। স্থানীয় পত্রিকার বেশ কয়েকজন সাংবাদিকও হামলার শিকার হন। এই ঘটনায় পুলিশের অভিযুক্ত উপ পরিদর্শক (এসআই) এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন ও কনস্টেবল বুলবুলকে পুলিশ লাইনে ক্লোজড করা হয়। (সূত্র: স্বদেশবার্তা, ১০ জানুয়ারি ২০১৫)

১২. ২৪ জানুয়ারি ২০১৫, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় যুবলীগ কর্তৃক তিন ছাত্র শিহাব উদ্দিন, মাহমুদ ও আবু সাইদকে নির্যাতনের পর হাসপাতালে পুনরায় পুলিশ কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ করে তাদের অভিভাবকরা। বিবৃতিতে তারা বলেন, 'আমাদের তিন সন্তান শিহাব উদ্দিন, মাহমুদ ও আবু সাইদকে যুবলীগ কর্মীরা বিনা অপরাধে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করে গাড়িতে আগুন দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পুলিশ তাদের স্থানীয়

হাসপাতালে ভর্তি করে। (সূত্র: দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ জানুয়ারি ২০১৫)

১৩. ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, রাস্তায় তর্কের জের ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে থানায় আটকে রেখে তিন ঘণ্টা নির্মম নির্যাতন চালায় পুলিশ। নির্যাতনের শিকার ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে ইংরেজি পত্রিকা নিউ এজের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি। শিক্ষার্থী নির্যাতনে জড়িত পুলিশ সদস্যদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিচারের দাবি জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি। না হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তারা। (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

১৪. ১৭ মার্চ ২০১৫, সন্ধ্যায় বাউফল থানা পুলিশ দৈনিক প্রথম আলোর পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমানকে আটক করে থানা হাজতে নিয়ে রাতভর অমানবিক নির্যাতন চালায়। পরদিন পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগে মিজানকে আসামি করে মামলা করে। আদালত শুনানি শেষে জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায় তাকে। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০১৫)

১৫. ২৩ জুন ২০১৫, বরিশালের আগৈলঝাড়া থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) এক স্কুলছাত্রকে পিটিয়ে জখম করে। আহত অবস্থায় তাকে আগৈলঝাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় । (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ জুন ২০১৫)

১৬. ৫ জানুয়ারি ২০১৬, খুলনার দৌলতপুর খানজাহান আলী আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ইমরান হোসেন নামে এক কলেজছাত্রকে নির্মম নির্যাতন করে নগরীর কার্তিককুল পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ হামিদ। এ নির্যাতনে ক্যাম্পের আরো সাত পুলিশ অংশ নেয়। প্রায় তিন ঘণ্টা নির্যাতনের পর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে থানায় হস্তান্তর করা হয় এবং পরে সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (সূত্র: দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৩ জানয়ারি ২০১৬)

১৭. ২০১৫ সালে রেকর্ডসংখ্যক প্রায় ২২ হাজার অভিযোগ এসেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তদন্ত শেষে শাস্তিও হয় ১০ হাজার পুলিশ সদস্যের। একের পর এক পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে অপারগতার কারণেই এমন অবক্ষয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। (সূত্র: দৈনিক যায়যায়দিন, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬)

১৮. ১৫ জানুয়ারি ২০১৬, যাত্রাবাড়ী থানার মীর হাজীরবাগ এলাকায় পুলিশের বেদম প্রহারে গুরুতর আহত হয় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক বিকাশ চন্দ্র দাশ। ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আরশাদ হোসেন আকাশকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ক্লোজ করা হয় ওই থানার সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নূরে আলম, কনস্টেবল শহিদুল ও লিয়াকতকে। এ ঘটনায় পুলিশের তিনটি কমিটি তদন্ত করলেও আগায়নি কোনো কিছু এমনকি এ

ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি। (সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ২০ জানুয়ারি ২০১৬)

১৯. ১৯ জানুয়ারি ২০১৬, রাজধানীর পল্টনে মেহেরবা প্লাজার সামনে আইয়ুব নামে ব্যাংক এশিয়ার এক কর্মচারিকে মারধরের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মাহবুব নামে এক পুলিশ কনস্টেবলকে আটকে রাখে জনসাধারণ। (দৈনিক আমাদের সময়, ২০ জানুয়ারি ২০১৬)

২০. ৩১ মার্চ ২০১৭, নাটোরের সাবরিনা হক মডেল একাডেমির অধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম কল্লোলকে আটকের তিনদিন পর হাতে ককটেল দিয়ে আদালতে প্রেরণ করে পুলিশ। প্রতিবেশী ও পরিবারের সদস্যরা জানায়, অধ্যক্ষ শামসুল ইসলাম কল্লোলকে তার নিজ বাড়ি থেকে ঘুম থেকে ডেকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। (সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ০৩ এপ্রিল ২০১৭)

২১. ০৩ এপ্রিল ২০১৭, যশোরে পুলিশের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছেন এক অন্তঃসত্ত্বা নারী সাবিনা ইয়াসমিন। সাবিনা ইয়াসমিনের অভিযোগ, ২৫ মার্চ ২০১৭ ইং ৫ হাজার পিচ ইয়াবা দিয়ে পুলিশ তাকে আটক দেখিয়েছে। এরপর পুলিশের হাত গেছে সাবিনা ইয়াসমিনের দিকে। একের পর এক অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের হুমকি দেয়ায় গত ২৮ মার্চ সাবিনা এ ব্যাপারে পুলিশ সুপারের কাছে আবেদন করেন। এই আবেদনে ক্ষুব্ধ হয়ে রোববার মধ্যরাতে সাবিনার বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এই পরিস্থিতি আর কোনো উপায়ান্ত না পেয়ে সোমবার সকালে বিষপান করেন তিনি। (সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম, ০৪ এপ্রিল ২০১৭)

২২. ২৬ মার্চ ২০১৭, ময়মনসিংহের সদর উপজেলার সুতিয়াখালি গ্রামের তিন রাস্তার মোড়ের বাসিন্দা সোহেল মিয়া নামের নিরীহ ব্যক্তিকে কোতোয়ালী মডেল থানা পুলিশের এক এসআই বাড়ি থেকে ধরে এনে নির্যাতন করে পঙ্গু করে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। (সূত্র: প্রজন্মকণ্ঠ, ৯ এপ্রিল ২০১৭)

২৩. ৬ এপ্রিল ২০১৭, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আবদুল্লাহ আল মামুনকে ধরে থানা হাজতে নিয়ে গুলি করার হুমকি দেয় ওই থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহিদ। মামুন ও তাঁর বাবা এই অভিযোগ করেন। (দৈনিক প্রথম আলো, ১০ এপ্রিল ২০১৭)

২৪. ৯ এপ্রিল ২০১৭ থেকে ১০ এপ্রিল ২০১৭, পর্যন্ত সাতক্ষীরা জেলার আটটি থানার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কলারোয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক এবং জামায়াতের পাঁচ নেতা-কর্মীসহ ৫১ জনকে আটক করেছে পুলিশ। (সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, ১০ এপ্রিল ২০১৭)

২৫. ১৯ এপ্রিল ২০১৭, গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর থানার এসআই মাহাবুব আলমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ মধ্যরাতে সাজু মিয়া নামের এক আসামিকে ধরতে তার বাড়িতে

যায়। তারা সাজু মিয়াকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও ছেলে আলিফকে এএসআই আরিফ বুক ও পিঠে কিলঘুষি মারে। এতে গুরুতর আহত হয় আলিফ। পরে তাকে সাদুল্লাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। (সূত্র: জাগোনিউজ, ২১ এপ্রিল ২০১৭)

২৬. ২৪ এপ্রিল ২০১৭, ৮ ডিবি পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা করেছেন মোঃ মঈনউদ্দিন নামে এক দোকান কর্মচারী। চট্টগ্রাম আদালত ভবন এলাকা থেকে তাকে তুলে নিয়ে পুলিশ তার কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। (দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪ মে ২০১৭)

২৭. ৬ অক্টোবর ২০১৬, অস্ত্র বিক্রির সময় র‍্যাবের হাতে নিউমার্কেট এলাকা থেকে আটক হন সিএমপির দুই গোয়েন্দা পুলিশ এসআই উজ্জ্বল কান্তি দাস এবং এএসআই আনিসুর রহমান। ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ওই দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ০৪ মে ২০১৭)

২৮. ২২ মে ২০১৭, ঝিনাইদহে বিভিন্ন উপজেলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২ জামায়াত কর্মী ৪১ জন গ্রেফতার করা হয়েছে। ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান জানান, ঝিনাইদহে নাশকতা প্রতিরোধ, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও মাদক বিরোধী অভিযান চলছে। এ অভিযানে ঝিনাইদহ সদর থেকে ১৬ জন, শৈলকুপা থেকে ৮ জন, মহেশপুর থেকে ৮ জন, কালীগঞ্জ থেকে ২ জন, হরিণাকুন্ডু থেকে ৩ জন ও কোটচাঁদপুর থেকে ২ জামায়াত কর্মীসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। (সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৭

২৯. ২৬ মে ২০১৭, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী এক শিক্ষার্থীকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাতকড়া পরানোর ঘটনায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি পান আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ পুলিশের চার সদস্য। (দৈনিক প্রথম আলো, ০৫ জুন ২০১৭)

৩০. ৫ জুন ২০১৭, বরিশাল জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ছাবেদ আলী নামে এক ব্যবসায়ী গৌরনদী মডেল থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) মো. দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে তল্লাশির নামে ক্যাশ থেকে ৩০ হাজার টাকা লুটের অভিযোগ করেন। (সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ০৬ জুন ২০১৭)

৩১. ০৮ জুন ২০১৭, বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী আদালত চত্বরে এক ব্যক্তি নাদিম হাসানকে কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকেন। এক পর্যায়ে পাশে পড়ে থাকা চেলাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেন। আহত অবস্থায় তাঁর সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ০৯ জুন ২০১৭)

৩২. ১১ জুন ২০১৭, ঢাকা মহানগর হাকিম মাজহারুল ইসলামের আদালতে চাঁদাবাজির

অভিযোগে রাজধানীর বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম এ জলিল, এএসআই শাহীন, দ্বীন ইসলাম, এএসআই আব্দুর রহিম, জাহানারা রশিদ, রোকেয়া রশিদ, আতাউর রহমান ও শুকুর আলীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নুরুন নাহার নাছিমা বেগম নামে এক নারী। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ২০১৭ সালের ২৬ মে বাদীর ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে যান আসামিরা। বাদী চাবি ফেরত চাইলে এএসআইর মাধ্যমে আসামিরা তার কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। (সূত্র: জাগোনিউজ, ১১ জুন ২০১৭)

৩৩. ১১ জুন ২০১৭, রোববার ঢাকা মহানগর হাকিম মাজহারুল ইসলামের আদালতে ছিনতাইয়ের অভিযোগে রাজধানীর ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুরুল মোত্তাকিমসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন মমতাজ উদ্দিন খান। মামলার অপর আসামিরা হলেন ভাটারা থানার এসআই বাবুল হোসেন ও এএসআই মারুফ। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ২০১৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে বাদীর বাসায় যান। বাসায় জোর করে ঢুকে আলমারির ভেতর থেকে ২৫ ভরি স্বর্ণ ও তিন লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যান তারা। (সূত্র: জাগোনিউজ, ১১ জুন ২০১৭)

৩৪. ১১ জুন ২০১৭, চাঁদা দাবি করার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জের ডিবির এএসআই মনিরের বিরুদ্ধে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মামলায় অভিযোগ করা হয়, ২০১৭ সালের ২৪ মে ব্যবসায়ী জসিম কদমতলীর সাদ্দাম মার্কেটের সামনে দিয়ে মোটরসাইকেলে বাসায় যাচ্ছিলেন। পথে মনির গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় দিয়ে তার গতিরোধ করে ও মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে যান। জসিম মোটরসাইকেল ফেরত চাইলে তার কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন মনির। টাকা না দিলে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয় জসিমকে। (সূত্র: জাগোনিউজ, ১১ জুন ২০১৭)

৩৫. ২৮ এপ্রিল ২০১৭, যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে কেশবপুর উপজেলার মজিদপুর ইউনিয়নের মনোয়ারা বেগম অভিযোগ করেন, গত ১৯ এপ্রিল কেশবপুর থানার ওসি শহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে তাঁর ছেলে আশরাফুল ইসলামকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে পায়ে গুলি করে পঙ্গু করে দিয়েছে। পরে পুলিশ প্রচার করে, বন্দুকযুদ্ধে আশরাফুল আহত হয়েছেন। তিনটি মিথ্যা মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। (সূত্র: প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৭)

৩৬. ১৬ মে ২০১৭, চৌগাছা উপজেলার খড়িঞ্চা বাজারে ফেনসিডিল দিয়ে চা-দোকানি আবদুর রহমানকে ফাঁসাতে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের হাতে আটক হলেন চৌগাছা থানার এএসআই সাজ্জাদুর রহমান ও মাসুদ রানা এবং কনস্টেবল সেলিম রেজা। (সূত্র: প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৭)

৩৭. ১৮ মে ২০১৭, যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে শার্শা উপজেলার অগ্রভুলট

গ্রামের নাসিমা খাতুন অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী হাতেম আলীকে বাড়ি থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে সাদাপোশাকে কয়েকজন বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। (সূত্র: প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৭)

৩৮. ১৩ জুন ২০১৭, যশোর সদর উপজেলার হৈবতপুর গ্রামের কাজী নজরুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক জাহিদুল ইসলামের পকেটে ইয়াবা ঢুকিয়ে আটকের চেষ্টা করেন কোতোয়ালি থানার এসআই শামীম আকতার। স্থানীয় লোকজনের প্রতিরোধের মুখে তিনি ওই শিক্ষককে আটক করতে পারেননি। জনতা ফুঁসে উঠলে অপর এক পুলিশ সদস্যের সহায়তায় দ্রুত তিনি সরে পড়েন। এ ঘটনায় পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দেওয়ার দুই দিন পর ১৫ জুন সন্ধ্যায় এসআই শামীমকে প্রত্যাহার করা হয়। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৭)

৩৯. ১০ জুন ২০১৭, রাত ১০টার দিকে যশোর শহরের রেল সড়কে সোনালী ব্যাংক ভবনের সামনে এক যুবকের পকেটে গাঁজা ঢুকিয়ে আটক করার সময় স্থানীয় জনগণের হাতে ধরা পড়েন কোতোয়ালি থানার এসআই মাহবুবুর রহমান। স্থানীয় লোকজন পুলিশের ওই কর্মকর্তাকে আটক করে বিক্ষোভ করলে অতিরিক্ত পুলিশ পাঠিয়ে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়। (সূত্র: প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৭)

৪০. ১১ জুন ২০১৭, মনিরামপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে ঝুমুর নামে এক নারী অভিযোগ করেন, ৬ জুন তিনি ও তাঁর শ্বশুরকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান কোতোয়ালি থানার এসআই আসাদ ও দেবাশীষ। এরপর তাঁরা তিন লাখ টাকা দাবি করেন। পরে এক লাখ টাকা দিয়ে তাঁরা ছাড়া পান। (সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৭)

৪১. ২০ জুলাই ২০১৭, শাহবাগে পরীক্ষার রুটিনসহ তারিখের দাবিতে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন শেষে মিছিল বের করলে পুলিশ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। তখনই একদম কাছ থেকে পুলিশ ছাত্রদের টার্গেট করে টিয়ারশেল ছোড়ে। এসময় সেখানে থাকা নীল পাঞ্জাবি পরা সিদ্দিকুর রহমান মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং তাকে সে অবস্থায় রেখেই পুলিশ সামনে থাকা ছাত্রদের দিকে তেড়ে যায়। সিদ্দিকুরের একজন সহপাঠী বলেন, 'যখন ছাত্রদের অযথাই ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সিদ্দিকুর একজনকে উদ্ধারে এগিয়ে যায়। এরপর তার চোখ লক্ষ্য করে টিয়ারশেল ছোড়া হয়। (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ জুলাই ২০১৭)

৪২. ২৭ জুলাই ২০১৭, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানায় বুধবার দুপুরে মারা গেছেন হেফাজতে (রিমান্ড) থাকা আসামি মাহফুজুর রহমান। পুলিশ এটিকে আত্মহত্যা বলছে। তবে পরিবারের সদস্যরা তা নাকচ করে দিয়েছেন। তাদের দাবি, ১ লাখ টাকা ঘুষ না দেয়ায় পুলিশের নির্যাতনেই মারা গেছেন মাহফুজুর। এ ঘটনায় বিচার

বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তারা। (সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০১৭)

৪৩. ২৯ আগস্ট ২০১৭, মঙ্গলবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার ফান্দাউকে পুলিশের হাতে আটকের পর মোঃ বকুল মিয়া(৫০) নামে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আটক থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। (সূত্র : দৈনিক সংবাদ, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৪৪. ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭, কালেরকণ্ঠ প্রতিবেদনে উল্লেখ করে ঢাকাসহ সারাদেশের থানা ও ইউনিটগুলোতে কঠোর নজরদারি সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণে আসছে না পুলিশের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। গত সাত বছরে প্রায় ৭৫ হাজার পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপকর্মে জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা ঘটলেই তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যদের বদলি, প্রত্যাহার বা সাময়িক বরখাস্তের মতো লঘু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ফৌজদারি আইনে তাঁদের সাজা হচ্ছে না। আবার মাঝেমধ্যে তদন্ত কমিটি কিছু সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলেও অভিযোগ আছে। (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৪৫. ১৮ মে ২০১৭, মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষার্থীদের বিনা কারণে লাঠিপেটা করে পুলিশ। ওই ঘটনায় এখনো কেউ শাস্তি পাননি। বরগুনায় ইউএনও গাজী তারিক সালমনকে অতি উৎসাহী পুলিশ সদস্যরা টেনে-হিঁচড়ে হাজতখানায় নিয়ে যান। এ ঘটনায় মাঠ পর্যায়ের কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে বদলি করা হলেও উর্ধ্বতন কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৪৬. ২০ জুলাই ২০১৭, শাহবাগে বিক্ষোভের সময় তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় পুলিশ। এতে শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমান আহত হন। তাঁর ডান চোখটি নষ্ট হয়ে গেছে। (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৪৭. ১৮ এপ্রিল ২০১৭, কাফরুলের কচুক্ষেতের নিউ ওয়েভ ক্লাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ডিএমপির সহকারী কমিশনার রুহুল আমিনসহ ১১ সদস্যকে আটক করা হয়। পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন আসার পর সবাইকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেছিল, তাঁদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে। তাঁরা আর কোনো অপকর্ম করেছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু ওই সুপারিশগুলো আমলে নেওয়া হয়নি। (সূত্র: কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৪৮. ১৮ নভেম্বর ২০১৬, সোনারগাঁও হোটেল মোড়ে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা

ছিনিয়ে নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন ট্রাফিক পুলিশের এক কনস্টেবল। ওই কনস্টেবল জামিন নিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছেন। (সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৪৯. ১৩ নভেম্বর ২০১৬, পুলিশ হেফাজত থেকে আসামি রুবেলকে পালাতে সহায়তা করার অভিযোগ ওঠে বাড্ডা থানার এসআই ইমরান উল হাসানসহ দুজনের বিরুদ্ধে। তাঁরা অর্থের বিনিময়ে আসামিকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন বলে তথ্য-প্রমাণ মিললেও তাঁদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থা। (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৫০. ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, রাতে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নার্স আবুল ফজলকে পিটিয়ে আহত করে পুলিশ। ৬ ফেব্রুয়ারি টাকা না পেয়ে কল্যাণপুর পোড়া বস্তিতে পুলিশ নিরীহ রিকশাচালক সাজু মিয়াকে গুলি করে আহত করে। (সূত্র: কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৫১. ১৮ জুলাই ২০১৭, ছিনতাইকারী সন্দেহে শাহজালাল নামে খুলনার এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশ। তাঁর স্ত্রী রাহেলা বেগমের অভিযোগ, ছিনতাইকারী বানিয়ে পুলিশ তাঁর স্বামীর দুই চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি কেএমপিতে অভিযোগ জানিয়েছেন। তবে পুলিশ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। (সূত্র: দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭)

৫২. ৯ অক্টোবর ২০১৭, জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার হারুঞ্জা শাহ পাড়া গ্রামে পলাতক আসামি মেহেদি হাসান শাপলাকে ভোরে ধরতে গিয়ে পুলিশের মারধরে সাইদুর রহমান নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর সাময়িক বরখাস্ত হন কালাই থানার দুজন এসআইসহ চার পুলিশ। (সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৩ অক্টোবর ২০১৭)

৫৩. ১৭ জুন ২০১৭, কেরানীগঞ্জ কারাগারে দেখা হয় রুহিতপুরের এক বাসিন্দার স্ত্রীর সঙ্গে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই গৃহবধূ জানান, তার স্বামী কাতার প্রবাসী। কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফেরেন গত ১৯ মে। গত ৮ জুন বাসা থেকে বেরোনোর পর রাস্তায় কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন ওই প্রবাসী। এরপর পুলিশ তাকে থানা হেফাজতে নিয়ে এক হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধারসহ গ্রেফতার দেখায়। গ্রেফতারের পর রিমান্ড চেয়ে আদালতে চালান করা হলে আদালত দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। ওই গৃহবধূ এই প্রতিবেদককে বলেন, রিমান্ডের প্রথম রাতেই থানার এক এসআই একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে তার স্বামীকে বেদমভাবে পেটাতে শুরু করে। এর পর বলেন, 'তুই ইয়াবা ব্যবসা করিস। তোর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ রয়েছে। বিদেশে বসে ইয়াবা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিস।' এক পর্যায়ে নিস্তার পেতে ওই রাতেই এসআইকে এক লাখ টাকা তুলে দিই। (সূত্র: আমাদের সময়, ৩১ অক্টোবর ২০১৭)

৫৪. ০৮ নভেম্বর ২০১৭, যশোরের কেশবপুর উপজেলার আটন্ডা গ্রামের বজলুর রহমান মোড়লের স্ত্রী আয়েশা বেগম বাদী হয়ে যশোরের আমলি আদালত অঞ্চলে গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করার অভিযোগে যশোরের কেশবপুর থানার পাঁচ পুলিশ সদস্য ও এক সোর্সের নামে মামলা করেন। আদালত বাদীর আরজি গ্রহণ করে বিষয়টি তদন্ত করতে পুলিশ অব ব্যুরো ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার আসামিরা হলেন কেশবপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মুজাহিদুল ইসলাম, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আশরাফুল ইসলাম ও এএসআই জাহাঙ্গীর হোসেন, কনস্টেবল সালাউদ্দীন, ড্রাইভার মোঃ মজনু ও পুলিশের কথিত সোর্স উপজেলার বাগদা গ্রামের ফজলুর রহমান। (সূত্র: এনটিভি নিউজ, ০৯ নভেম্বর ২০১৭/সংবাদ, ১০ নভেম্বর ২০১৭)

৫৫. ১২ নভেম্বর ২০১৭, সাভারে পুলিশের বিরুদ্ধে গভীর রাতে স্থানীয় আব্দুল আজিজের বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ভাংচুর ও লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এসময় সাভার মডেল থানার উপ পরিদর্শক (এসআই) আবুল কাসেম নগদ ৫০ হাজার টাকা লুট করেছে বলেও অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী পরিবার। তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবুল কাসেম। (সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন, ১৪ নভেম্বর ২০১৭)

৫৬. ১৮ নভেম্বর ২০১৭, পুলিশ পরিচয়ে চট্টগ্রাম নগরের হালিশহর থানাধীন ছোটপুল শান্তিবাগ শ্যামলী আবাসিক এলাকার ৬ নং রোডের একটি বাসায় প্রবেশ করে লুট করতে গিয়ে স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পড়েছেন এক পুলিশ কনস্টেবল শামীম ভুইয়া; একই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন ছিনতাইয়ের অভিযোগে বরখাস্ত হওয়া আরও এক পুলিশ কনস্টেবল। (সূত্র: সিটিজিটাইমস, ১৯ নভেম্বর ২০১৭)

৫৭. ২৯ নভেম্বর ২০১৭, ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় ফিল্ম স্টাইলে পঙ্গু স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় পাঁচজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। আসামিরা হলেন উপজেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির ওরফে টাইগার মনির, বালু ব্যবসায়ী সিদ্দিকুর রহমান ও মনির হোসেন। বুধবার রাতে উপজেলার মেডিকেল মোড় এলাকায় ধর্ষণের এ ঘটনা ঘটে। (সূত্র: বিজনেস আওয়ার, ৩০ নভেম্বর ২০১৭)

'পুলিশ জনগণের বন্ধু।' পাঠ্যকার্যক্রমের পাঠ্যসূচি কিংবা মুখের শ্লোগান হলে আমাদের আগামীর প্রজন্ম পুলিশের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল হবে তা বলা মুশকিল। যখন বন্দুকের নল কেড়ে নিচ্ছে তাজা প্রাণ তখন বলুন তো স্লোগানটিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? যখন দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কোন একটি পক্ষের হয়ে কাজ করে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, অ্যাসাইনমেন্ট ফলো করে, দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকে তখন তাদের কাছে সেবার প্রত্যাশা অরণ্যে রোদন ছাড়া বৈকি! আর এই প্রবণতার কারণে আজকের বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের দুর্ভোগ, দুর্দশা। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বাংলাদেশ থেকে

প্রকাশিত এ এস এম সামছুল আরেফিন সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা' শীর্ষক স্মারকটি প্রতিটি পুলিশ সদস্যের পড়া উচিৎ। তাহলে খুব সহজে দেশপ্রেমের পাঠ নিতে পারবেন। হৃদয়ে তৈরি হবে সেবার মানসিকতাও। আর যদি পুলিশের চলমান আচরণ চলতে থাকে তাহলে সময়ের পরিবর্তনে তাদের সে গৌরব ইতিহাস মুছে যাবে। হয়তোবা নতুন কোনো খেতাবের মুকুটে ভূষিত হবেন। প্লিজ বের হয়ে আসুন রাজনীতির এই অন্ধগলি থেকে। শুধু দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, দেশ ও মানুষকে ভালোবাসুন আগামীর একটি সোনালী ইতিহাস তৈরির জন্য। একটি রাষ্ট্রে পুলিশের এমন বর্বর আচরণে হতবাক বিশ্ববাসী; হতবাক ভুক্তভোগী জনমানুষেরা।

আমাদের সামনে এখন কঠিন পরীক্ষা। আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনই নির্ধারণ করবে বাংলাদেশের জনগণের আগামী দিনের ভবিষৎ। পুলিশবাহিনী যদি সুষ্ঠু একটি ভোটের পক্ষে না থাকে, জনগণকে ভোটারাধিকার প্রয়োগে সহযোগিতা না করে তাহলে শুধু এদেশের সাধারণ মানুষের কপাল পুড়বে না; পুলিশের কপালও পুড়বে। শুধু সময়ের প্রতিশোধের পালাবদলের অপেক্ষা করতে হবে।

১০ ডিসেম্বর ২০১৮

> বিশ্লেষকরা মনে করেন, সরকার যদি গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে আন্তরিক না হয়ে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে এই ধারা অব্যাহত রাখে, তাহলে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা শুরু হয়ে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। দেশের ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে যাবে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তাই মানবতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এই বিষবৃক্ষ মূলসহ উপড়ে ফেলতে।

গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে ব্যর্থতার পরিণাম হবে ভয়াবহ

আবু হামীম

হাফিজুর রহমান শাহীনের মা জানেন তার সন্তান আর ফিরবে না। এই দুখিনী মা তার সন্তানের কবরের কাছে গিয়ে চোখের অশ্রু ফেলে মনটাকে সান্তনা দেন। বিনা বিচারে শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশে যারা তার শাহীনকে হত্যা করছে একদিন তাদের বিচার হবে। তার সন্তান জালিম সরকারের জুলুমের শিকার হয়ে শহীদ হয়েছেন। তিনি একজন শহীদের গর্বিত মা। ২০১০ সালে চাপাইনবাবগঞ্জের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে গ্রেফতারের পর পুলিশের গুলিতে নিহত হন শাহীন। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিলেন। এই ঘটনায় শুধু দেশে নয় বিশ্বব্যাপি নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও তদন্ত করা হয়েছিল। খ্রিশ্চিয়ান ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (সিডিএ)-এর নির্বাহী পরিচালক উইলিয়াম নিকলাস গমেজ সরেজমিনে তদন্ত করে দেয়া এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন,' শিবির নেতা শাহীন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন।' আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও বিবৃতি দিয়েছিলো। এই ঘটনার এত বেশী প্রতিক্রিয়ার কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দাবি আদায় ও ক্ষমতা পরিবর্তে বিশ্বাসী একটি রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী ছাত্র সংগঠনের কর্মীকে গ্রেফতারের পর 'বন্দুকযুদ্ধ' নাটক সাজিয়ে প্রকাশ্যে হত্যার ঘটনা এটিই স্বাধীন বাংলাদেশে সম্ভবত প্রথম। এর আগে সিরাজ সিকদারসহ অন্য যারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কম-বেশী সন্ত্রাসবাদী

আদর্শে বিশ্বাসের অভিযোগ ছিলো। তারা অনেকেই চীন বিপ্লবের মহানায়ক মাও সিতুঙ এর ,'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস' এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিহিংসা কিংবা দুর্বলতায় কোন বিচারবহির্ভূত হত্যাই সমর্থনযোগ্য নয়। আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানোর অনুমতি থাকলেও এর যেন কোন প্রকার অপব্যবহার না হয়, সেদিকে অবশ্যই কঠোর নজর রাখতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, হাফিজুর রহমান শাহীন হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীনস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই মৃত্যু নিয়ে সংসদে ৩০০ বিধিতে বক্তব্য দেয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি। এই ঘটানটি নিয়ে এত কথা বলার কারণ এই ঘটনার মধ্যদিয়েই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে ভিন্ন মত ও বিরোধী দল দলন, নিপীড়নের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অপসংস্কৃতি নতুনমাত্রা পেয়েছে।

আল মোকাদ্দাস ও ওয়ালিউল্লাহর মায়েরা শাহীনের মায়ের মতো অতটা ভাগ্যবান নন। তাঁদের প্রতিটি রাত কাটে বিনিদ্র। তারা দীর্ঘ ছয় বছর ধরে অপেক্ষায় আছেন,'মা আমি এসেছি। তুমি ভালো আছো?' এই ডাক শোনার জন্য। ঘুমিয়ে পড়লে তাদের ছেলেরা এসে যদি দরজা বন্ধ পেয়ে চলে যায়। তাই তাদের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুই মেধাবী ছাত্র ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১২ ঢাকায় ব্যক্তিগত কাজ শেষে হানিফ এন্টারপ্রাইজের গাড়িতে করে ক্যাম্পাসে ফিরছিলেন। রাত সাড়ে ১১টায় রাজধানীর কল্যাণপুর বাস কাউন্টার থেকে ঝিনাইদহ-৩৭৫০ নম্বর গাড়ির সি-১ ও সি-২ সিটে বসে ক্যাম্পাসে আসার পথে রাত সাড়ে ১২টা থেকে ১টার মাঝামাঝি সময়ে সাভারের নবীনগর পৌছালে র‍্যাব-৪ এর সদস্য পরিচয় দিয়ে গাড়িটি থামানো হয়। এ সময় র‍্যাবের পোশাক ও সাদা পোশাকধারী ৮-১০ ব্যক্তি গাড়িতে উঠে আল মোকাদ্দাস ও ওয়ালিউল্লাহকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যায় বলে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে নিশ্চিত করেন গাড়িতে অবস্থানকারী যাত্রীরা এবং সুপারভাইজার সুমন। এরপর থেকে র‍্যাবের হাতে আটক দুই ছাত্রের কোনো সন্ধান পাচ্ছে না তাদের পরিবার। র‍্যাব তাদের আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। সূত্রঃ আসক, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, পৃষ্ঠা-৩

শুধু এই দুইজন মেধাবী ছাত্র নন, সাবেক সংসদ সদস্য জননেতা বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস আলী, ঢাকা সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর বিএনপি নেতা চৌধুরী আলম, সেনাবাহিনীর সাবেক ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল আমান আল আযামী, ব্যারিস্টার মীর আরমান বিন কাসেম, সাবেক রাষ্ট্রদূত মারুফ জামানসহ হাজার হাজার এমন হারিয়ে যাওয়া মানুষের স্বজনরা অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। তারা কি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেছেন, নিখোঁজ হয়েছেন না কি গুম হয়েছেন? হারিয়ে যাওয়া, নিখোঁজ হওয়া ও গুম এ শব্দগুলো দেখতে কিংবা শোনতে একই রকম মনে হলেও পারিভাষিক অর্থের দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য আছে। মানুষ ইচ্ছে করে একা একা আত্মগোপনে কিংবা চোখের আড়ালে যদি যায় তারা হারিয়ে গেছে বলা যায়। ব্যক্তিগত শত্রুরার কারণে কাউকে জোর করে শত্রু পক্ষের কেউ মাফিয়া বা সন্ত্রাসী দিয়ে তুলে নিয়ে আটকে রাখলে বা খুন করলে তিনি নিখোঁজ হন। কিন্তু রাষ্ট্র শক্তিকে ব্যবহার করে আইন-শৃঙ্খলা অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর কোন ফোর্সকে ব্যবহার করে কাউকে তুলে নিয়ে কোর্টে হাজির না করে

আটকে রাখলে কিংবা হত্যা করে লাশ গায়েব করাকে বলা হয় গুম।

জাতিসংঘের পরিভাষায় গুম

সরকারের ভাষায় 'নিখোঁজ বা রহস্যজনক আত্মগোপন' এবং মানবাধিকারকর্মীদের বর্ণনায় 'গুম' এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্যরেখা টানা সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কঠিন। এই কাঠিন্য দূর করতে 'গুম'-এর একটি সংজ্ঞা ঠিক করেছে জাতিসংঘ। ইংরেজিকে একে বলা হচ্ছে এনফোর্সড বা ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ গুম থেকে সব ব্যক্তির সুরক্ষা পাওয়ার বিষয়ে একটি ঘোষণা অনুমোদন করে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যরাষ্ট্রের অনুস্বাক্ষরের পর ২০১০ সালের ২৩ ডিসেম্বর থেকে তা একটি সনদ হিসেবে কার্যকর হয়েছে। কোন অবস্থা গুম হিসেবে গণ্য হবে তার সংজ্ঞায় তিনটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে: প্রথমত, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির মুক্তভাবে কিছু করার স্বাধীনতা হরণ করা; দ্বিতীয়ত, সরকারি কর্মকর্তাদের জড়িত থাকা, অন্তত তাঁদের জ্ঞাতসারে এটি হওয়া; এবং অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের বিষয়টি অস্বীকার কিংবা তা গোপন রাখা। বাংলাদেশে সরকার যেহেতু আজ পর্যন্ত একটি ঘটনাতেও তার কোনো ধরনের ভূমিকা স্বীকার করেনি, সেহেতু তারা দাবি করতেই পারে যে গুম বলে কোনো কিছু এ দেশে ঘটে না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের কোনো না কোনো সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার প্রমাণ এবং আলামতের কথা ভুক্তভোগীদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা করে আসছেন। সুতরাং সরকারের অস্বীকৃতি এ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পরিবারগুলোর দাবিকে আরও জোরালো ভিত্তি দিচ্ছে। সরকারের দাবির প্রতি অবিশ্বাস যে শুধু দেশের ভেতরেই সীমাবদ্ধ তা নয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি (দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলান্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেস) আছে যাদের ম্যান্ডেট হচ্ছে শুধু গুমের অভিযোগগুলো অনুসন্ধান ও বিবেচনা করা। তাদের কাজ হচ্ছে হাওয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সন্ধানকাজে তার পরিবারকে সহায়তা করা। এই কমিটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে ২০১৬ সালের মে থেকে ২০১৭ সালের মে পর্যন্ত সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুমের ঘটনাগুলোর বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। ওই প্রতিবেদনে তারা বলেছে যে বাংলাদেশ থেকে নতুন গুমের অভিযোগ আসা বাড়তে থাকায় এবং এসব অভিযোগের বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে কোনো জবাব না আসায় তারা উদ্বিগ্ন। এতে কোনো অবস্থাতেই যে গুম গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। গুমবিষয়ক সনদের ১০(২) অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে এতে বলা হয় যে আটক ব্যক্তিকে কোথায় কীভাবে আটক রাখা হয়েছে, তা তার পরিবারকে দ্রুততম সময়ে জানানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিবেদনে এরপর কমিটি দুটি চিঠির জবাব না পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে। একটি চিঠি ২০১১ সালের মে মাসের ৪ তারিখে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অহরহই গুমকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আর ২০১৬ সালের ৯ মার্চ দেওয়া অপর চিঠিতে গুমের ঘটনার অভিযোগ আতঙ্কজনকভাবে বাড়ার কথা বলা হয়েছিল। কমিটি বাংলাদেশে নিরাপত্তা এবং গোয়েন্দা

সংস্থাগুলো এবং আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বলে আরও একটি সাধারণ অভিযোগের কথা জানিয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়ে এ বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি আবারও একটি চিঠি দেওয়ার কথা জানিয়েছে। এরপর ওই কমিটি তার প্রতিবেদনে জানিয়েছে, সরেজমিনে পরিস্থিতি জানার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফরের জন্য ২০১৩ সালের ১২ মার্চ তারা সরকারকে একটি চিঠি দিয়েছে এবং সেই চিঠির জবাবের জন্য ২০১৪ সালের ১৪ অক্টোবর, ২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর এবং ২০১৬ সালের ১৮ নভেম্বর আলাদা চিঠিতে তাগিদ দিয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনোটিরই জবাব মেলেনি। তাদের প্রতিবেদনে দেশওয়ারি বিভিন্ন দেশের যেসব পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০১৬ সালের মে মাসে তাদের কাছে বাংলাদেশে গুমের অভিযোগ ছিল ৩৪টি এবং ২০১৭-এর মে মাসে ওই অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯-এ। (প্রথম আলোয় ২০ নভেম্বর প্রকাশিত এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের হিসাবে সংখ্যাগুলো আরও বেশি।) দেশে যদি গুম নাই ঘটে তাহলে জাতিসংঘের স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাতে সরকারের এত দ্বিধা কেন? তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে এমন কোনো নোংরা কিছু কি কেউ লুকিয়ে রেখেছে?

ভয়াবহ চিত্র

গুম ও বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত চিত্র খুবই ভয়াবহ। অনলাইন নিউজ পোর্টাল এশিয়ানবার্তা ২৪.কম ২০১৭ সালকে গুম-খুনের ঘেরাটোপে বন্দি বছর উল্লেখ করেছিল। তারা বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ১০ বছরে এ ধরনের ৫৪৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিখোঁজ হয়েছেন যার মধ্যে ৩৯৫ জনকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর ২০১৭ সালের অক্টোবর পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছেন ৫০ জন। যাদের ৩৮ জনের খোঁজ মেলেনি। মজার বিষয় হচ্ছে নিখোঁজ কিংবা অপহরণের শিকার কারও জন্যই কোনো ধরনের মুক্তিপণ চাওয়া হয়নি। এদিকে দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি দাবি করছে, ২০০৭ সাল থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত তাদের দলের ২০২ নেতাকর্মী গুম হয়েছেন।

গত ৪ ডিসেম্বর (২০১৮) জাতীয় প্রেস ক্লাবে মায়ের ডাক নামের একটি সংগঠন একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এতে বলা হয়,'২০১০ সালের ২৫ জুন, রাজধানীর ফার্মগেট এলাকা থেকে বিএনপি নেতা চৌধুরী আলম অপহৃত হন। এর দুই বছর পর ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল মধ্যরাতে রাজনীতির বনানীতে থেকে অপহৃত হন বিএনপির তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইলিয়াস আলী। পরের বছর ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর নিখোঁজ হন সাজেদুল ইসলাম সুমন। শুধু চৌধুরী আলম, ইলিয়াস আলী কিংবা সুমনই নন, তাদের মতো এখন ৪২৩ জন বিএনপির নেতাকর্মী গুম-নিখোঁজ রয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে বিএনপি দাবি করেছে নিহত এক হাজার ৫১২ জন নেতাকর্মীর মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন ৭৮২ জন। নিখোঁজ-গুম হওয়া এদের কাউকে

এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে, নিখোঁজদের ফিরে আসার অপেক্ষায় আজও আছেন তাদের পরিবার- আত্মীয় স্বজনরা। স্বজনদের খোঁজ চেয়ে গত ৪ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের এ সংবাদ সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন ৪০ পরিবার। যাদের বেশিরভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলের নিখোঁজ কর্মীদের স্বজন। সংবাদ সম্মেলনে নিখোঁজ স্বজনরা দাবি করেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল রাষ্ট্রীয়ভাবে গুম-খুন ও ক্রসফায়ারের মতো জঘন্য কাজে সম্পৃক্ত হবেন না- তার অঙ্গীকার ইশতেহারে থাকতে হবে। গুমের সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড , জার্মান বার্তা সংস্থা ডয়েচ ভেলের এক প্রতিবেদনে সম্প্রতি বলা হয়েছে,' আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসবে ১৫ মে থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাসে মাদকবিরোধী অভিযানে নিহত হয়েছে ২৭৬ জন। আর জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন মোট ৪৩৭ জন। ২০১৭ সালে ১২ মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ১৬২টি। ২০১৬ সালে ১৯৫, ২০১৫ সালে ১৯২, ২০১৪ সালে ১৫৮ এবং ২০১৩ সালে নিহত হয়েছিলেন ২০৮ জন। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভোটের বছর ২০১৮ সালের ১০ মাসে ২০১৭ সালের ১২ মাসের চেয়ে তিনগুন বেশি বিচারবহির্ভূত হত্যা হয়েছে। বাংলাদেশে মে মাসে শুরু হওয়া মাদকবিরোধী অভিযান নিয়ে বিতর্ক আছে। ২৬ মে রাতে টেকনাফের কাউন্সিলর একরামুল হককে হত্যার পর এই অভিযান প্রশ্নের মুখে পড়ে। তারপর বেশ কিছুদিন অভিযান থমকে যায়। বিরতি দিয়ে শুরুর পর এখন তা আবার নতুন করে গতি পাচ্ছে। মাদকবিরোধী অভিযানে প্রথম মাসেই নিহত হয় ১৩৮ জন আর গ্রেপ্তার হয় ১০ হাজারেরও বেশি। এই অভিযানে গ্রেপ্তারবাণিজ্য এবং টাকা না পেয়ে 'ক্রসফায়ারের' অভিযোগও আছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট এলিনা খান বলেন, 'আমরা মানবাধিকার কর্মীরা অনেক বছর ধরেই এই বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকলেও শাসকগোষ্ঠী কখনোই আমলে নেয়নি। আর এখন কেউ এর শিকার হলেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় মাদকের সঙ্গে জড়িত'। 'যে-কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থকালেই তো তাকে হত্যা করা যায় না। বিচারে সোপর্দ না করে হত্যা করা সংবিধান, আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। শাসকগোষ্ঠী একটা শর্টকাট পথ বেছে নিচ্ছে। আর যারা এই কাজ করছেন, তারাও মনে করছেন সরকার আমাদের ওপর নির্ভরশীল'। তিনি বলেন, 'এখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের দুটি স্টাইল আমরা খেয়াল করছি। একটা হলো বন্দুকযুদ্ধ এবং আরেকটা হলো লাশ উদ্ধার। লাশ উদ্ধারের সংখ্যা এখন বাড়ছে'। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'নির্বাচনের বছরে একটু হাওয়া বদলের প্রবণতা থাকে। তখন অনেক কিছুই ঢিলেঢালা হয়ে যায়। এর সুযোগ নেয় অনেকেই। ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডও বেড়ে যায়'।

মানবাধিকার কর্মী এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাবেক নির্বাহী পরিচালক নূর খান বলেন, 'এ বছর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার দুটি কারণ আছে বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। মে মাস থেকে শুরু হওয়া চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে এরই মধ্যে

দুশরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আর এটা নির্বাচনের বছর। আমরা অতীতে দেখেছি, নির্বাচনসহ বিশেষ বিশেষ সময়ে ক্রসফায়ার, বন্দুযুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়'। মাদকবিরোধী অভিযানের পরও মাদকের ব্যবসা এবং মাদক ব্যহারকারী কমছে না। নতুন মাদকবিরোধী আইন সংসদে পাশ হয়েছে। তাতেও কোনো ফল এখানো দেখা যাচ্ছে না। তারপরও কেন এই অভিযান? কেন এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড? নূর খান মনে করেন, 'যে-কেনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে একটা সাময়িক উপশম পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। আসলে তা শেষ পর্যন্ত কাজে আসে না। আরেকটি হলো নির্বাচনের আগে একটা ভয়ার্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে প্রতিবাদী মানুষও কথা বলতে সাহস না পায়'।

সরকারের বক্তব্যের সাথে বাস্তবতার মিল নেই

এত শত আলামত এবং স্বজনহারা পরিবারগুলোর অভিযোগ সবকিছু অস্বীকার করে সরকার হাস্যকর সব দাবি করছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাংবাদিক কামাল আহমেদ বলেন,'গুম বিষয়ে সরকারের বক্তব্য তার আগের মেয়াদেও যা ছিল, এখনো তাই আছে। সরকারের প্রথম কথা, দেশে গুম বলে কিছু নেই। দ্বিতীয় যে কথাটি সবচেয়ে বেশি শোনা যায় তা হলো সরকারকে বিব্রত করতে এটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কৌশল এবং কথিত 'গুমের শিকার' ব্যক্তি আসলে আত্মগোপন করেছেন। কেউ কেউ পাওনাদারদের থেকে রক্ষা পেতেও স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকছেন। তৃতীয় যে কথাটি সরকারের কাছ থেকে শোনা যায়, সেটি হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাঁদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সরকারের এসব কথার বিশ্বাসযোগ্যতা এখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। পাওনাদারদের এড়াতে ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেলেও যেতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ক্ষেত্রে এমন নজির বিরল। আবার সরকারকে বিব্রত করতে বিএনপির নেতা ইলিয়াস আলী এখনো পালিয়ে আছেন, কিংবা সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন ভারতে গিয়ে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে নিজেকে তুলে দিয়েছেন এমন কথা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকেরা বিশ্বাস করলেও অন্য কারও কাছেই তা গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে একজন প্রতিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী, যাঁর সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠতার কথা সর্বজনবিদিত, কিংবা ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়নে নির্বাচিত কোনো পৌর মেয়র সরকারকে বিব্রত করতে গা ঢাকা দেবেন এমন যুক্তি হাস্যকর। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে উদ্ধারের চেষ্টা করছে বলে বারবার বলা হলেও উদ্ধারের দৃষ্টান্তও তেমন একটা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপহরণকারীরাই অপহৃত ব্যক্তিকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে।'

সরকার আন্তরিক হলে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধ হতো

সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকে হাতিয়ার হিসেব ব্যবহার করছে বিরোধী দলের এমন অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। সরকার সত্যি সত্যি গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে আন্তরিক হলে এক দিনেই এই সমস্যা বন্ধ হয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সরকার রাজনৈতিক হীন ও ক্ষুদ্র স্বার্থে

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে এই বেআইনী কাজে ব্যবহার করায় সমস্যা দিন দিন ডালপালা ছড়াচ্ছে। শিকড় আরো গভীরে গিয়ে সমস্যা আরো শক্তিশালী হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অসৎ কিছু সদস্য সরকারকে কখনো ভুল বুঝিয়ে কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা ও অবৈধভাবে অর্থবিত্ত কামানোর লোভ উল্লেখিত বেআইনি কাজ করছে। এতে শুধু বিরোধী দল, সাধারণ জনগণ এবং তাদের শিকার ব্যক্তি ও পরিবারগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, সরকার - সরকারি দলও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের নেতা-কর্মীরাও আক্রান্ত হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জের আলোচিত ৭ খুনের ঘটনা তার সবচেয়ে বড় প্রকাশ্য প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হলো সরকার আন্তরিক হলে কিভাবে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার লাগাম টানা যায়? এক্ষেত্রে সরকারকে মহান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মানতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাধ্য করতে কঠোর হতে হবে। রাজনৈতিক কারণে হামলা-মামলা, গ্রেফতার হয়রানি বন্ধ করতে হবে। অতীতে রাজনৈতিক কারণে করা সকল মামলা বাতিল করতে হবে।

গ্রেফতার, রিমান্ড ও হাইকোর্টের নির্দেশনা

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার উপর বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট(ব্লাস্ট) এর করা ১৯৯৮ সালের একটি রিট পিটিশনের উপর প্রথমে হাইকোর্টের রায় ও পরে সরকার কর্তৃক করা তার উপর আপিলের রায়ে গ্রেফতার, রিমান্ড সম্পর্কে হাইকোর্টের নির্দেশনা মানতে সরকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে বাধ্য করলে বিনাবিচার হত্যা ও গুম বন্ধ হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। আসামীকে রিমান্ডে নিয়ে কিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, তার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে, যদি আসামীর প্রতি নির্যাতন করা হয় সে ক্ষেত্রে রিমান্ড মঞ্জুরকারী আদালতের কি ভূমিকা হবে তার সবকিছুই আইন, বিধি, পুলিশ প্রবিধান এমনকি আদালতের রুলিং এ বিস্তারিতভাবে আছে। কিন্তু আমাদের দেশের আইন-বিধি কিংবা প্রশাসনিক হাজারও নির্দেশনাগুলোর মতো রিমান্ড সম্পর্কিত নির্দেশনাগুলোও প্রতিনিয়তই লঙ্ঘিত হচ্ছে। এবার আসুন দেখা যাক বিনাপরোয়ানায় গ্রেফতার ও আসামীর রিমান্ড সম্পর্কে মাহামান্য হাইকোট কি কি নির্দেশনা দিয়েছেনঃ

১. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো শুধু নিবর্তনমূলক বা ডিটেনশন দেবার মানসে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করবে না।

২. কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারকালে তারা অবশ্যই তাদের পরিচয়পত্র প্রদর্শন করবে।

৩. গ্রেফতারের তিন ঘন্টার মধ্যেই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে।

৪. কোন ব্যক্তিকে তার বাড়ি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রেফতার না করে অন্যকোন স্থান থেকে গ্রেফতার করা হলে গ্রেফতারের এক ঘন্টার মধ্যে তার আত্মীয়-স্বজনদের

টেলিফোন কিংবা বার্তাবাহকের মাধ্যমে গ্রেফতারের বিষয়ে অবহিত করতে হবে।

৫. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা পাওয়ার জন্য তার আত্মীয়-স্বজন এবং আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে হবে।

৬. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইলে আইনপ্রয়োগকারীগণ তা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে জেলখানায় একটি কাঁচ নির্মিত ঘরের মধ্যে করবেন। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আইনজীবী এবং আত্মীয় স্বজনগণ বাইরে থেকে এ জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

৭. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের আগে ও পরে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে।

৮. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করলে ম্যাজিস্ট্রেট একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। যদি মেডিকেল বোর্ডের অনুসন্ধানে আসামীর করা অভিযোগ সত্য হয় তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩৩০ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পুলিশের বিভিন্ন নির্বতনমূলক নির্দিষ্ট এ্যাক্ট আছে যার অপব্যহার হচ্ছে। যেমন: ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এলাকাসহ সকল মেট্রোপলিটনে নিজস্ব আইন রয়েছে। এসব আইনে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারার বিকল্প এক বা একাধিক ধারা রয়েছে (যেমন ডিএমপি এ্যাক্টের ৮৬ নম্বর ধারা)। তাই এসব অধিক্ষেত্রে ৫৪ ধারায় কোন মানুষকে গ্রেফতার করা জরুরী নয়। এর বাইরে সংসদ কর্তৃক পাশ করা পুলিশ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য প্রায় সকল প্রকার বিশেষ আইনে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করার সুযোগ রয়েছে। এই কারণেই বর্তমানে দেশের থানাগুলোতে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের সংখ্যা অনেকটাই নিম্নগামী। অনেক থানায় দুই তিন মাসেও কোন ব্যক্তিকে এ ধারায় গ্রেফতার করা হয়নি। তাই পুলিশের উল্লেখিত এ্যাক্টের ব্যাপারেও নির্দেশনা প্রয়োজন।

প্রতিনিয়ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের অনেকেরই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরবর্তীতে অনেকের লাশ পাওয়া যাচ্ছে। দেশে এই পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার নজির ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালত যে মন্তব্য করেছেন, তা বাস্তবতার আলোকেই করেছেন। সাদা পোশাকে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক কাউকে গ্রেফতারের ঘটনায় আপিল বিভাগ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ইউনিফর্ম না পরে গ্রেফতারের ঘটনাকে ভয়াবহ বলে অভিহিত করেছেন। সাদা পোশাকে গ্রেফতারের বিষয় নিয়ে সচেতন মহলও বিভিন্ন সময়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে এবং হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সাদা পোশাক পরে ও বিনাওয়ারেন্টে গ্রেফতারের সুযোগ অনেক অপরাধীও নিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে মানুষকে অপহরণের মতো ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এ ধরনের ঘটনায় কারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আর কারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বেশধারী তা সাধারণ মানুষের পক্ষে চিনতে পারা মুশকিল হয়ে পড়ে। কাউকে গ্রেফতার করতে হলে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উচিত হবে নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরে এবং যথাযথ গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে গ্রেফতার করা। যাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে তার পরিবারকে একটি লিখিত রশিদ দিতে হবে, যাতে লেখা থাকবে কোন থানার কোন পুলিশ অফিসার কয়টা সময় এবং কেন তাকে গ্রেফতার করলো।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের আইনের শিক্ষক অ্যাডভোকেট ড. শাহদীন মালিক বলেন, বিভিন্ন দেশে গত শতাব্দীর ৭০, ৮০ ও ৯০-এর দশকে সংঘটিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের বিচার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সনদও হয়েছে। বিচারগুলো এ জন্যই হচ্ছে যে প্রতিটি দেশ ও সমাজ ক্রমে বুঝতে পারছে যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম কোনো সমাজেরই কল্যাণ বয়ে আনেনি। দায়ী ব্যক্তিদের বিচার না করলে রাষ্ট্র কল্যাণকর রাষ্ট্রে উন্নীত হতে পারে না। যে দেশে যখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুম বেড়ে যায়, তখন সে দেশে অদ্ভুত ধরনের ব্যক্তিরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বশীল পদগুলোতে থাকেন। পরে তাঁরা বিচারের সম্মুখীন হন এবং শাস্তি পান। এখন শাস্তি ভোগ করছেন নিকট অতীতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, পুলিশের মহাপরিদর্শক, এনএসআইয়ের প্রধানসহ অন্যরা। ২০ বছর পর যখন ইতিহাস লেখা হবে, সেই ইতিহাস হবে চিলি, আর্জেন্টিনা, চাঁদ ও অন্যান্য দেশে আজকে যে রকম ইতিহাস লেখা হচ্ছে, সে রকম। ২০ বছর পরে ২০১৭ সালে সংঘটিত গুমের শাস্তির ইতিহাস যদি আমরা লিখতে না পারি, অর্থাৎ চলে যাওয়া বছরে গুমের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও শাস্তির ইতিহাস যদি রচিত না হয়, তাহলে ২০৩৭ সালে হয়তো বাংলাদেশ হবে একটা দুর্বল রাষ্ট্র, যেখানে খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাস, নির্যাতন, গণহত্যা ইত্যাদিই হবে আইন। কিন্তু এই রাষ্ট্রকে আমরা কোনো মতেই ব্যর্থ রাষ্ট্র হতে দেব না। তাই বিচারের ইতিহাস অবশ্যই লেখা হবে। এবং লেখা হবে খুব শিগগিরই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল প্রিয়জনের গুমের বিষয়ে স্বজনদের বিচার চাইতে আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন । তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে যতগুলো গুমের ঘটনা ঘটেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা সরকারবিরোধী রাজনীতি করেন, তারা শিকার হয়েছেন। গুম হত্যার চেয়ে জঘন্য। এটা যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধও।' আসিফ নজরুল বলেন, 'গুম হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। এটা খুনের থেকেও জঘন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন আইনে যে সংজ্ঞা দেয়া আছে, সেখানেও এটাকে চরম জঘন্য অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা আছে।' 'বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনে বলা হয়েছে, গুম বা খুন যখন পরিকল্পিত ও ব্যাপক সংখ্যায় হয়, তখন সেটাকে আমরা মানবতাবিরোধী বলতে পারি। যুদ্ধাপরাধ,

মানবতাবিরোধী অপরাধের মতো আন্তর্জাতিক অপরাধ বলা যায়'। কাজেই আমাদের ভাববার কারণ হচ্ছে, গুম হয়েছে পরিকল্পিতভাবে এবং সংখ্যার দিক থেকেও এটা ব্যাপক।' 'কাজেই আমি মনে করি, গুমের শিকার হওয়া যেসব পরিবার আছেন আপনারা যদি দেশে বিচার না পান, আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে এর বিচার পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে চেষ্টা করবেন।'

আসিফ নজরুল বলেন, 'বহু বছর ধরে আমরা রাষ্ট্রের কাছে বিচার চাচ্ছি, কিন্তু কোনো বিচার হচ্ছে না। আমাদের সংবিধানে বলা আছে, যেকোনো নাগরিকের আইন অনুযায়ী বিচার করতে হবে। আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, বাংলাদেশের কোন আইনে আছে যে, একটা মানুষকে আপনি কোনো বিচার না করে, কোনো কথা না বলে গুম করে দেবেন। তাকে হত্যা করবেন বা নিখোঁজ করে দেবেন?' 'সরকারের কাছে গুম হওয়ার কারণ জানতে চাইতে হবে। দেশে আজ নির্বাচনী ডামাডোলের মধ্যে আপনারা এই প্রশ্ন তোলেন। যারা ভোট চান তাদের প্রশ্ন করেন, আমাদের ভাইয়েরা, আমাদের সন্তানেরা কেন গুম হয়েছে?'

বিশ্লেষকরা মনে করেন, সরকার যদি গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে আন্তরিক না হয়ে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতে এই ধারা অব্যাহত রাখে, তাহলে দেশে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা শুরু হয়ে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। দেশের ভিত্তিমূল দুর্বল হয়ে যাবে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তাই মানবতার পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এই বিষবৃক্ষ মূলসহ উপড়ে ফেলতে।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কথাসাহিত্যিক।

“

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্যে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ এখন জাতীয় দাবি। জনগণের ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এই দাবি উঠেছে। প্রভাবশালী দেশ, সংস্থা এবং ঢাকায় কর্মরত বিদেশি কূটনীতিকরাও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবিতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দিচ্ছে। বিশ্বরাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন এমন প্রভাবশালী কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং আগামীতে বন্ধুত্ব থাকবে কি না তা নির্ভর করছে ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ওপর।

”

আওয়ামী শাসনামলে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র চরম ভূলুণ্ঠিত

মাহবুব এহসান

আওয়ামী লীগ যে কখনোই গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইন ও সাংবিধানিক শাসনে বিশ্বাসী ছিল না, তা তাদের শাসনামল পর্যালোচনা করলেই উপলব্ধি করা যায়। তারা মুখে গণতান্ত্রিক হলেও মানসিকতায় অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারি ও ফ্যাসীবাদী। এটি কোন কথার কথা নয় বরং এ বিষয়ে দলটির পক্ষে আত্মস্বীকৃতিও রয়েছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানে ভাগ্নে সাবেক যুবলীগ সভাপতি শেখ ফজলুল হক মনির বক্তব্য থেকে। তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এক জনসভায় বলেছিলেন, ‘আমরা আইনের শাসন চাই না, বঙ্গবন্ধুর শাসন চাই’। আসলে এটিই হচ্ছে আওয়ামী লীগের উপলব্ধি; গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। তারা আইনের শাসনে বিশ্বাসী নয় বরং স্বেচ্ছাচারিতায় বিশ্বাসী। অবশ্য একথা মেনে নিতে খুব সমস্যা হতো না, যদি আওয়ামী শাসনামলে দেশে সুশাসন বজায় থাকতো। কারণ, শাসন প্রক্রিয়া যা-ই হোক অন্তত সুশাসন ও গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

এ বিষয়ে প্রাজ্ঞজনরাও একমত। দার্শনিক প্লেটোও সে দিকেই অঙ্গলী নির্দেশ করেছেন। তার মতে, ‘When the prince is virtuous, law are unnecessary; when

prince is not virtuous, law is useless.' অর্থাৎ 'শাসক যখন হবেন ন্যায়বান, তখন আইনের শাসন নিষ্প্রয়োজন। আবার যখন হবেন দুর্নীতিপরায়ণ তখন আইন হবে নিরর্থক'। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, শেখ মুজিব সহ আওয়ামী লীগের কোন শাসনামলেই সুশাসন ছিল না। গণমানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা তো তারা দিতেই পারেনি বরং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় গণমানুষের অধিকার হরণ করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তারা ৩৭ হাজার বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে হত্যা করেছিল। জাসদ নেতা সিরাজ শিকদারকে হত্যা করে জাতীয় সংসদে উল্লাস প্রকাশের ঘটনাও ঘটেছে আওয়ামী শাসনামলেই। তাই আওয়ামী-বাকশালী শাসনামলকে দুঃশাসনের দিনলিপি বলায় অধিক যুক্তিযুক্ত।

একথা অনস্বীকার্য যে, একটি গণতান্ত্রিক, সুখী, সমৃদ্ধ, শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয় নিয়েই আমরা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছিলাম। কিন্তু আওয়ামী লীগের ক্ষমতালিপ্সা, অপরাজনীতি ও অহমিকার কারণেই স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক অতিক্রান্ত হলেও সে প্রত্যাশা পূরুণ হয়নি বরং অর্জন যৎসমান্যই বলতে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যখন পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল, তখন ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত বা চিরস্থায়ী করার জন্য যা যা করা দরকার তাই করেছে। উপেক্ষিত হয়েছে জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি। পরিকল্পিতভাবে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বহুধাবিভক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা হয়েছে এবং এখনও তা অব্যাহত আছে।

বিশেষ মহলকে খুশি করার জন্য রাষ্ট্রীয় সংবিধানকে ভিনদেশী সংবিধানের ডুপ্লিকেট কপি বানানো হয়েছে। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গৃহীত সংবিধানে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। যেহেতু সেই সংবিধান গণমুখী ছিল না তাই তদানীন্তন সরকার অল্প সময়ের ব্যবধানে সংবিধানে ৪ বার সংশোধনী এনেছে। যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কথা বলে দেশের মানুষকে মরণপণ যুদ্ধে ঠেলে দেয়া হয়েছিল সে গণতন্ত্রই তাদের কাছে আর নিরাপদ থাকেনি। মানবাধিকারের নামে গণমানুষের অধিকারকে পদদলিত করা হয়েছে। সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের কথা বলা হলেও তা এখনও আমাদের কাছে অধরা রয়ে গেছে।

দেশ স্বাধীনের পর দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রাখেনি স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দাবিদার রাজনৈতিক দল বরং গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক মেরেছিল আওয়ামী লীগই। তারা সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একদলীয় বাকশালী ও ফ্যাসীবাদী শাসন কায়েম করেছিল। The Newspaper (Announcment Of declaration) Act-1975 মাত্র ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ব পত্রিকা বাদে সকল সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তদানীন্তন সরকার এই এক্ট পাসের আগেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং গণমাধ্যম কর্মীদের নানাভাবে হেনস্তাও করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২৯ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে দৈনিক গণকণ্ঠ সম্পাদক আল মাহমুদ অভিযোগ করেছিলেন, 'গণকণ্ঠ

অত্যন্ত বেআইনিভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে তথাকার পৌনে তিনশ' সাংবাদিক ও কর্মচারী বেকার হইয়া পড়িয়াছেন। সাংবাদিক ও কর্মচারীদের মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়া অফিস হইতে কাজ অসমাপ্ত রাখা অবস্থায় বাহির করিয়া দেয়া হইয়াছে'। (ইত্তেফাক-৩০ মার্চ, ১৯৭৩)

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্যর্থতার কারণেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে এবং অনেক চড়ামূল্যেই আমাদেরকে এই স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকালের পরিক্রমায়ও আমাদের স্বাধীনতা এখনও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারেনি। মূলত আওয়ামী লীগের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারি ও ফ্যাসীবাদী মানসিকতার কারণেই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ধারা বারবারই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর ১৯৯৬ সালে দেশের নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ক একটি সমঝোতা হলেও আওয়ামী লীগের অবৈধ ক্ষমতালিপ্সা ও আত্মকেন্দ্রীক রাজনীতির কারণেই সে অর্জন ধরে রাখা যায়নি। ফলে আমরা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সহনশীলতার অভাবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছি।

মূলত ক্ষমতাসীনদের উপর্যুপরি ব্যর্থতার কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন, জীবনমান, সুশাসন ও নিরাপত্তা লাভে সমর্থ হইনি। ফলে রাজনৈতিক সংকট আমাদের পিছু ছাড়েনি। বিকশিত হয়নি গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা কেন্দ্রীক ও নেতিবাচক রাজনীতির কারণে আমরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায়ও পিছিয়ে পড়েছি। জাতীয় ক্ষেত্রেও আমরা উন্নয়নের ধারাবাহিকতাও রক্ষা করা করতে পারিনি। মূলত ২০০৮ সালে পাতানো ও ষড়যন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে গণতন্ত্র, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের রক্ষাকবজ কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল করে দেশে রাজনৈতিক সংকটকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। আমরা সে অশুভ বৃত্ত থেকে কোন ভাবেই বেড়িয়ে আসতে পারছি না বরং ক্রমেই তা জটিল হতে জটিলতর হচেছ।

মূলত, ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা জাতির ঘাড়ে আবারও জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। সেই তামাশা ও ভাঁওতাবাজীর নির্বাচনে ১৫৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় বিনা ভোটেই সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। সে নির্বাচন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোন মহলেই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। এই তামাশার নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের এক তরফা নির্বাচনকে প্রহসনের নির্বাচন উল্লেখ করে এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিশ্ব গণমাধ্যম বাংলাদেশের নির্বাচনের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বলেছে, বিরোধী দলহীন নির্বাচনে সরকারের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বিবিসি, রয়টার্স, এ্যাসোসিয়েট প্রেস (এপি), এএফপি, আল-জাজিরা, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রভাবশালী সাময়িকী ফিনান্সিয়াল টাইমসসহ বিশ্বের প্রায় সব প্রভাবশালী গণমাধ্যমেই বাংলাদেশের নির্বাচন 'সহিংস' এবং ভোটার 'খরায়' ভুগছে বলে মন্তব্য করেছে। পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে কড়া সমালোচনায় মুখর ছিল বিশ্ব গণমাধ্যম।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়, বাংলাদেশের বিরোধীদলের বর্জনের নির্বাচন ছিল সহিংস। তাদের শিরোনাম ছিল, সহিংসতা আর বয়কটের মধ্যদিয়ে হয়েছে ভোট গ্রহণ। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে আগুন, ককটেল ও বোমা বিস্ফোরণ, সহিংসতা ও নিরাপত্তাবাহিনীর সরাসরি গুলীতে হতাহতের খবরও গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করছে সংবাদ মাধ্যমটি।

কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা 'বাংলাদেশর নিবার্চনে মৃত্যু' শিরোনামে তাদের অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, এক তরফা এ নির্বাচনে পুলিশের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘর্ষে কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয়েছে। সহিংসতা হয়েছে কমপক্ষে এক হাজার ভোটেকেন্দ্রে। এই অবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিকে গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যাবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করে তারা।

আল-জাজিরাও তাদের শীর্ষ সংবাদ হিসেবে বাংলাদেশের নির্বাচনকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছে পুলিশের গুলিতে বিরোধী জোট কর্মীদের মৃত্যু সহিংসতা ও বিভিন্ন জায়গায় ভোটকেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ করে আল-জাজিরার সংবাদে বলা হয়, বিতর্কিত এই নির্বাচন দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিকে হুমকির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম এসোসিয়েট প্রেস (এপি) খবরে বলা হয়, নিরাপত্তাহীনতার কারণে ভোটকেন্দ্রে যাননি বেশীরভাগ ভোটার। তবে নিরুত্তাপ এ নির্বাচনে উত্তাপ ছড়িয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নির্বাচনের দিনেও ১৮-দলীয় জোটের কর্মীদের উপর ব্যাপক সহিংস আচরণ করেছে পুলিশ। বিরোধীদের লক্ষ্য করে গুলী ছুড়েছে তারা। এমনকি সকাল ৮ টায় ভোটগ্রহণ শুরুর পর কমপক্ষে ১০০টি ভোটকেন্দ্রে বিরোধীদের সঙ্গে পুলিশের সহিংসতা হয়েছে, যা নির্বাচনকে 'প্রহসনের নির্বাচনে' পরিণত করেছে।

একটি প্রশ্নবিদ্ধ ও অগ্রণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় এসে এখন তারা মেয়াদপূর্তির দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যাসন্ন। কিন্তু ক্ষমতাসীনদের অতিমাত্রায় ক্ষমতালিপ্সার কারণে সে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা নিয়ে রীতিমত প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি রাজনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের বিষয়ে সংলাপ নিয়ে যে আশাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল তাও রাজনৈতিক একগুয়েমীর কারণেই সফল হতে পারেনি। বিরোধী দল নানা প্রতিকূলতার মধ্যেই নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যতই এগিয়ে আসছে সরকার অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই নির্বাচনী ময়দানকে আরও বেশী অসমতল করে তুলছে।

সঙ্গত কারণেই দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এখন খাদের কিনারে। আর এজন্য দেশের মানুষ ক্ষমতাসীনদেরই দায়ী করছেন। পরমত সহনশীলতা গণতন্ত্রের মূল উপাদান। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের কতিপয় অধিকার সংরক্ষণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক ৩ ধরনের অধিকার ভোগ করবে : ১. সামাজিক অধিকার,

২. রাজনৈতিক অধিকার এবং ৩. অর্থনৈতিক অধিকার।

সামাজিক অধিকার ঃ জীবনধারনের অধিকার. ২. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, ৩. মতপ্রকাশের অধিকার, ৪ সভা-সমিতি করার অধিকার, ৫. সম্পত্তি ভোগের অধিকার, ৬. ধর্মীয় অধিকার, ৭. আইনের অধিকার, ৮. চুক্তির অধিকার, ৯. ভাষার অধিকার, ১০. পরিবার গঠনের অধিকার ও ১১. শিক্ষা লাভের অধিকার।

রাজনৈতিক অধিকার ঃ ১. ভোটাধিকার, ২. প্রার্থী হওয়ার অধিকার, ৩. অভিযোগ পেশ করার অধিকার, ৪. সমালোচনার অধিকার, ৫. চাকরি লাভের অধিকার ও ৬. বসবাসের অধিকার।

অর্থনৈতিক অধিকার ঃ কাজের অধিকার, ২ উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার, ৩. অবকাশ যাপনের অধিকার, ৪. সংঘ গঠনের অধিকার ও ৫. রাষ্ট্র প্রদত্ত প্রতিপালনের অধিকার ইত্যাদি।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের যেসব অধিকারের স্বীকৃত রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি বরং নাগরিকরা তাদের অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ এসব অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রেরই সাংবিধানিক দায়িত্ব। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র জনগণের শাসন, শাসক গোষ্ঠীর জবাবদিহিতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও স্বাধীন গণমাধ্যমকে সরকার মোটেই গুরুত্ব না দিয়ে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্যই গণতান্ত্রিক সকল রীতিনীতি উপেক্ষা করছে। আর শাসনকাজে জনগণের সম্পৃক্ততা উপেক্ষা করে দেশকে এগিয়ে নেয়া মোটেই সম্ভব নয়। শাসনকাজে জনগণের মতামতের প্রতিফলন না থাকায় জনগণ অনেকটাই রাজনীতি বিমূখ হতে শুরু করেছেন। ফলে রাষ্ট্রাচারে ফ্যাসীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী স্থায়ীত্ব লাভ করতে শুরু করেছে।

মূলত পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া মহাজনী মূলধনের চরম জাতীয়তাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও সন্ত্রাসমূলক প্রকাশই হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ চরম জাতীয়তাবাদী, অযৌক্তিক ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষ এবং উদ্দেশ্য সাধনে চরম বর্বরতার আদর্শ প্রচার করে। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের চরম সঙ্কটের পরিচয়বাহক। সাম্রাজ্যবাদী যুগ হচ্ছে পুঁজিবাদের চরম যুগ। জাতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ যখন নিঃশেষিত, তখন পুঁজিবাদ নিজের শোষণমূলক ব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র গ্রহণ করে। ফ্যাসিবাদের মূলনীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. প্রথমত, ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নয়। মূলত ফ্যাসিবাদ ছোট, মধ্যম, বড় এবং সর্বোচ্চ নেতা যা আদেশ করবেন, তাই রাষ্ট্রের আদেশ বলে নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে।

খ. ফ্যাসিবাদ সমাজতন্ত্রেও অবিশ্বাস করে।

গ. ফ্যাসিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বতন্ত্র স্বীকৃত হয় না। ফ্যাসিবাদের মূলমন্ত্র হলো

সবকিছুই রাষ্ট্রের আওতাভূক্ত, কোনো কিছুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয় বরং কোনো কিছুই রাষ্ট্রের বাইরে নয়।

ঘ. ফ্যাসিবাদ শান্তি কামনা করে না। ফ্যাসিবাদ নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। মুসোলিনির মতে, মহিলাদের নিকট যেমন মাতৃত্ব, পুরুষদের নিকট তেমন যুদ্ধ-বিগ্রহ।

ঙ. ফ্যাসিবাদে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং দলীয় নেতা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন হন। একদল ও একনেতা সরকারের এবং সমাজের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেন।

চ. ফ্যাসিবাদে এলিট শ্রেণির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্বাস করা হয় যে, পৃথিবীতে কিছু ব্যক্তি শাসন করতে এবং শাসিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করে।

মূলত নেতিবাচক ও বিভেদের রাজনীতির কারণে আমরা অনেক পিছিয়েছি। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র যখন উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হচ্ছে, তখন আমরা নিজেরাই আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছি। আমরা যে প্রত্যাশা নিয়ে পিণ্ডির গোলামী থেকে মুক্তি লাভের জন্য মরণপণ যুদ্ধ ও বিজয় অর্জন করেছিলাম প্রতিহিংসা ও অপরাজনীতির কারণে এর সুফল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি। দেশে আজও গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সুস্থধারার রাজনীতি চর্চার সংস্কৃতি এখনও গড়ে ওঠেনি। মূলত আওয়ামী লীগের অপরাজনীতি ও ক্ষমতালিপ্সার কারণেই আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে ওঠেনি।

বস্তুত, অপশাসন-দুঃশাসন, জুলুম-নির্যাতন, বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গণহারে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, দুর্নীতি-লুটপাট ও দেশে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষসহ নানাবিধ ব্যর্থতার কারণেই ১৯৭৫ সালে এক দুঃখজনক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগকে দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়েছে। ১৯৯৬ সালে অতীত ভুলের জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে তারা দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা তাদের অতীত বৃত্ত থেকে কোনোভাবেই বেড়িয়ে আসতে পারেনি। তাই তারা ক্ষমতায় এসেই পুরনো চেহারায় ফিরে আসে এবং দীর্ঘ ৫ বছর অপশাসন-দুঃশাসন চালায়। সে সময় দেশে আইনের শাসন ছিল খুবই ভঙ্গুর। ক্ষমতাসীনরা নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতেই দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের উপর চালানো হয় অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন। তারা ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধকে বিশেষভাবে টার্গেট করে ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও আলেম-উলামাদের উপর দলন-পীড়ন চালায়। ফলে আওয়ামী লীগ সরকার গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তাদেরকে ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়।

এবার আওয়ামী ষড়যন্ত্রের নতুন মাত্রা শুরু হয়। তারা ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে তাদের পক্ষে কখনোই

ক্ষমতায় ফিরে আশা সম্ভব নয়। তাই তারা দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার জন্য নানাবিধ কুটকৌশলের আশ্রয় নেয়। মূলত দেশে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত করার জন্যই ২০০৬ সালে একটি সাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের সহিংস আন্দোলন গড়ে তোলে আওয়ামী লীগসহ তাদের মিত্ররা। ফলে ২৮ অক্টোবর ট্রাজিডির মত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এই দিন আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড বিশ্ববিবেককে স্তম্ভিত করে দেয়। ২০০৬ সালে পল্টন ট্রাজেডির ঘটনা সভ্যতার ইতিহাসে সকল নির্মমতা ও নৃশংসতাকে হার মানায়। ফলে আমরা বহির্বিশ্বে কলহপ্রিয় জাতি হিসেবে পরচয় লাভ করেছি। তা ছিলো আওয়ামী লীগের ক্ষমতাকেন্দ্রীক ও নেতিবাচক রাজনীতির ফসল।

২০০৬ সালের সহিংস আন্দোলনের প্রেক্ষিতেই একটি সাংবিধানিক কেয়ারটেকারের পরিবর্তে অসাংবিধানিক জরুরি সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। আজ যারা সংবিধানের দোহায় দিয়ে দেশের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সহ গোটা জাতিকে জিম্মি করে রেখেছে সেই আওয়ামী লীগ অসাংবিধানিক জরুরি সরকারকে তাদের আন্দোলনের ফসল বলে দাবি করেছিল। মূলত আওয়ামী লীগ সহ দেশীয় ও দিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে অসাংবিধানিক জরুরি সরকার প্রায় দু'বছর শাসন চালায়। এ সরকারের সরকারের মূল মিশন ও ভিশনই ছিল বিরাজনীতিকরণ। আর সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে মামলা দিয়ে তাদেরকে নানাভাবে হয়রানী করে। এমনকি জনপ্রিয় জাতীয় নেতাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডও প্রদান করা হয়। শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন অসাংবিধানিক জরুরি সরকার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের পাতানো ও ষড়যন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ১/১১ এর অনুঘটকদের ক্ষমতায় আনে। আমাদের দুর্ভাগ্যে যোগ হয় নতুন মাত্রা।

আওয়ামী লীগ পাতানো ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর জরুরি সরকারের বিরাজনীতিকরণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে। সংবিধান মোতাবেক দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র স্বীকৃত হলেও ক্ষমতার গ্রহণের পরই আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী মত ও দলকে দমন করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় দেশে রাজনৈতিক তৎপরতা ও বিরোধী মতের ওপর দলন-পীড়ন শুরু করা হয়। সংবিধান অনুযায়ি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও রাজপথে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার হলেও সরকার বিরোধী দল সহ সাধারণ মানুষ সেসব অধিকার থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে। রাজপথে সভা-সমাবেশ করাকে সন্ত্রাসবাদ ও বিরোধী দলের ঘরোয়া কর্মসূচিকে গোপন বৈঠক ও নাশকতার ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দিয়ে নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতার ও কথিত রিমান্ডের নামে নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি পুলিশী হেফাজতে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ঠাণ্ডা মাথায় গুলী করে অনেককে বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়। হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, গুম, অপহরণ, গুপ্তহত্যা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনীতির নামে এমন অপরাজনীতি বিশ্ব ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ঘটনা।

আওয়ামী লীগ যতবারই ক্ষমতায় এসেছে ততবারই তারা দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ২০০৮ সালে তারা পাতানো ও ষড়যন্ত্রের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে উপলব্ধি করে যে, দেশে সুস্থধারার গণতান্ত্রিক চর্চা হলেও তাদের দলীয় অস্তিত্বই হুমকির মুখোমুখো হয়ে পড়বে। বিশেষ করে তারা ক্ষমতায় না থাকতে পারলে ২০০৬ সালের পল্টন হত্যাকাণ্ড ও ২০০৯ সালের বিডিআর হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। তাই তারা তাদের ক্ষমতাকে নির্বিঘ্ন ও নিরঙ্কুশ করার জন্য আদালতের রায়ের দোহায় দিয়ে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল করে। অথচ তারাই একসময় কেয়ারটেকার সরকারের বিধান সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজপথে হিংসাত্মক ও সহিংস আন্দোলন করছিল। তারা কেয়ারটেকার সরকারের সুবিধাভোগী হলেও তারাই কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিকে সংবিধান থেকে উচ্ছেদ করছে। যা আওয়ামী লীগের আদর্শিক দেউলিয়াত্বই প্রমাণ করে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই দেশ থেকে বিরোধী দলনির্মূলের গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও নিগ্রহের পথ বেছে নেই । ক্ষমতাসীনরা জাতিকে মেধা ও নেতৃত্বশুন্য করতে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। তারা এজন্য দেশের আদর্শবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও দলটির শীর্ষনেতাদের বিশেষভাবে টার্গেট করে। সরকারের সে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই দলীয় প্রসিকিউশন, সাজানো সাক্ষী ও ফরমায়েসী বাদীর মাধ্যমে জামায়াতের শীর্ষনেতাদের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধের মামলা রুজু করা হয় এবং কথিত বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে সংগঠনের সাবেক আমীর, সাবেক সফল মন্ত্রী ও বরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সাবেক সহকারি সেক্রেটারি জেনারেল মোহাম্মদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লা এবং সাবেক কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মীর কাসেম আলীকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করা হয়। কারারুদ্ধ করে রাখা হয় বিশ্ব বরেণ্য মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সহ বরেণ্য জাতীয় নেতাদের। সম্প্রতি এদের সাথে যোগ হয়েছেন তিন বারের সফল প্রধানমন্ত্রী ২০ দলীয় জোট নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

আওয়ামী লীগ নিজেদের অবৈধ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতেই বিরোধী দলের উপর দলনপীড়ন এখনও অব্যাহত রেখেছে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেয়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব হলেও সরকার তাদেরকে বিরোধী দলের উপরই লেলিয়ে সারাদেশেই জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। বিশেষ করে বিরোধী দল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে ক্রাকডাউন চালানো হয়। ফলে দেশে মারাত্মকভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ব্যাপকভাবে ঘটতে থাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা। মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়, ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত চার বছরেই রাজনৈতিক

সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়নের ফলে ৭৭৫ জন নিহত হন। ২০১৩ তে এ সহিংসতা আরও বেড়েছে। অধিকার-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ এর জানুয়ারি মাসেই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে ১৭ জন নিহত এবং ১৬৪৩ জন আহত হয়েছে। তারপর তেকে পুরো ২০১৩ সাল জুড়ে পুলিশ র‍্যাব ও বিজিবিকে দাঁড় করে দেওয়া হয়েছে বিরোধী দলের বিপরীতে তাদেরকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যার জন্য। এ বছরের বিভিন্ন সময়ে বিরোধী দল কর্মসূচি দিলেই তাদের উপর হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে এ বাহিনী। রাজনৈতিক নেতা হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি সরকার বরং সরকারের আজ্ঞাসহ ছাড়া যে বা যারাই আন্দোলন করেছে তাদেরকেই হতে হয়েছে হত্যা-গুমের শিকার।

২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৫ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় পরিকল্পিতভাবে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ৫৭ জন দেশপ্রেমী সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয় এবং দেশের সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী বিডিআরকে ভেঙে গড়ে তোলা হয় বিজিবি। বিজিবিকে সরকার সীমান্ত প্রহরা বাদ দিয়ে বিরোধী দল দমনের কাজে ব্যবহার করছে। ফলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার বিষয়টি রীতিমত হুমকী মুখোমুখি। দেশের সীমান্তও এখন পুরোপুরি অরক্ষিত। ফলে সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী নির্বিচারে পাখির মত মানুষ হত্যা করছে। কিন্তু সরকার এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কোন প্রতিবাদও করতে পারছে না। ফলে দেশের সীমান্ত এখন পুরোপুরি অরক্ষিত।

আওয়ামী ফ্যাসীবাদীরা শুধু বিরোধী দলের উপর দলন-পীড়ন চালায়নি বরং যারা তাদের ব্যর্থতা ও অপকর্মের সমালোচনা করেছে তাদের উপরই চালানো হয়েছে জুলুম-নির্যাতন। বঙ্গোপসাগরে গ্যাস ব্লক ইজারা বাতিলের দাবিতে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পূর্ব নির্ধারিত পেট্রোবাংলা ঘেরাও কর্মসূচি উপলক্ষে ২ সেপ্টেম্বর ২০০৯ রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে একটি মিছিল কারওয়ান বাজারের পেট্রোবাংলা অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে বিজয়নগরে পুলিশের বেধরক লাঠিচার্জে অর্থনীতিবিদ ড. আনু মুহাম্মদসহ প্রায় অর্ধশতাধিক নেতকর্মী আহত হন। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। তাছাড়া মত প্রকাশের অধিকারও রয়েছে প্রতিটি নাগরিকের। সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'Every citizen shall have the right to assemble and participate in public meetings and processions peacefully and without arms, subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of public order or public health.'

অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও সোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

মূলত আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই তারা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের সে ষড়যন্ত্র এবং

ফ্যাসীবাদী-বাকশালী মানসিকতার অংশ হিসেবেই জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হয় এবং ৫ জানুয়ারি একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। তারা একইভাবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো সরকারের পাতানো ফাঁদে এবার পা দেয়নি। ২০ দলীয় জোটসহ বিরোধী দলগুলো একাদশ জাতীয় সংসদ অনেকটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে আশা করা হয়েছিল যে সরকার একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার বিষয়ে ইতিবাচক হবে এবং সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করবে। কিন্তু বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যতই সদিচ্ছা দেখাচ্ছে সরকার ততই নির্বাচনী ময়দানকে অধিক অসমতল করে তুলছে। একাদশ জাতীয় সংসদের তফসিল ঘোষণার পেক্ষাপটে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবী মামলা, গণগ্রেফতার এমনকি জামিনে থাকা পুরাতন মামলায়ও গ্রেফতার-হয়রানি অব্যাহত আছে। ফলে সরকারি দলের প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালালেও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীরা আদালতে মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত থাকছেন। কোথাও বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা জামিনের আবেদন নিয়ে হাজির হচ্ছেন; কোথাও কর্মীরা জামিন চেয়ে আবেদন করছেন; কোথাও গ্রেফতার ঠেকাতে আগাম জামিনের আবেদন, কোথাও স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে পুলিশি গ্রেফতার ঠেকাতে আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

মূলত অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের লক্ষ্যে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' এখন জাতীয় দাবি। জনগণের ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক মহল থেকেও এই দাবি উঠেছে। প্রভাবশালী দেশ, সংস্থা এবং ঢাকায় কর্মরত বিদেশি কূটনীতিকরাও লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবিতে সংশ্লিষ্টদের তাগিদ দিচ্ছে। বিশ্বরাজনীতি-অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন এমন প্রভাবশালী কয়েকটি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং আগামীতে বন্ধুত্ব থাকবে কি না তা নির্ভর করছে ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ওপর। অথচ নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি তো দূরের কথা খোদ নির্বাচন কমিশনই বিরোধী দলের সাথে রীতিমত পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। ফলে নির্বাচনী ময়দান ক্রমেই অধিক অসমতল হয়ে উঠছে। যা অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য মোটেই সহায়ক নয়।

মূলত সিভিল প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাম্প্রতিক আচরণে মনে হচ্ছে তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে দায়িত্ব পালন না ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তিতেই ব্যস্ত রয়েছে। প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাই পর্বে তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামান্য ত্রুটির জন্য কারো কারো প্রার্থিতা বাতিল করা হলেও গুরুতর অভিযোগের পরও অনেকের মনোনয়ন গ্রহণ করা হয়েছে। ঋণখেলাপি হওয়ায় কিছু মনোনয়ন বাতিল করা হয়; আবার একই অপরাধে অভিযুক্ত অনেকের মনোনয়ন বৈধ করা হয়েছে। তাই বর্তমান কমিশনের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে এমন আস্থা কেউই রাখতে পারছে না। দিন যতই যাচ্ছে সে সন্দেহ ততই জোরালো

হচ্ছে।

মূলত দেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছে সাবেক সিইসি কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদের রকিব কমিশন। ৫ জানুয়ারির তামাশা ও ভাঁওতাবাজীর নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি শতকরা ৫ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও রকিব কমিশন ভোটার উপস্থিতি দেখিয়েছে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ। শুধুমাত্র ঢাকা সিটিতেই ২৯ টি কেন্দ্রে কোন ভোটারই ভোট প্রদান করেনি। কিন্তু রকিব কমিশনের তেলেসমাতিতে সেসব কেন্দ্রের ভোটের কোন অভাব হয়নি। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনে রকিব কমিশনের ভূমিকা দেশ-বিদেশে নিন্দিত হয়েছে। বর্তমান কমিশন বিদায়ী কমিশনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে মাত্র। তাই অরণ্যে রোদন করে কোন লাভ হবে বলে কেউই মনে করেন না।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের সচিব-বিভাগীয় কমিশনার-ডিসি-এসপি এমন ৯২ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে তাদের বদলি ও প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক পরিচিতি, কর্মকাণ্ডের তথ্যও দেয়া হয় নির্বাচন কমিশনে। এদের মধ্যে মাত্র একজন এসপি (নারায়ণগঞ্জ) বদলি করে সেখানে আরো কট্টর আওয়ামীপন্থী ও বিতর্কিত ব্যক্তিকে পদায়ন করা হয়। এখন ভোট গ্রহণের ক্ষণ গণতা শুরু হলেও সারাদেশে ব্যাপক ধরপাকড় চলছে। যা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

মাঠপর্যায়ে ভোটের লাগাম যাদের হাতে সেই রিটার্নিং অফিসারদের সরকারি দলের প্রার্থীর অনুকূলে নজিরবিহীন পক্ষপাতিত্ব নির্বাচনের আগেই ভোট প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। অধিকাংশ রিটার্নিং অফিসার আইনের অধীনে থেকে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের বদলে দলবাজি ও খেয়ালখুশি মতো প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ-বাতিল করেন। দেখা যায় সারাদেশে ১৪১ জন ধানের শীষ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। আর নৌকা প্রতীকের মাত্র ৩ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। তাছাড়াও আওয়ামী লীগ থেকে যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হন তাদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় ব্যাপকভাবে।

জাসদের শহীদ উদ্দিন মাহমুদ ঢাকা-১৮ ও ফেনী-১ আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। একই কাগজ ও তথ্যে দাখিল করা মনোনয়নপত্র ফেনী-১ এ রিটার্নিং অফিসার গ্রহণ করেন; অথচ ঢাকায় রিটার্নিং অফিসার ঢাকা-১৮ মনোনয়ন বাতিল করে দেন। ঋণখেলাপির অভিযোগে পটুয়াখালী-১ থেকে জাতীয় পার্টির বরখাস্তকৃত মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলদারের মনোনয়ন বাতিল করা হয়। অথচ দলটির নতুন মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গার হলফনামায় মামলার তথ্য গোপন করলেও রংপুর-১ এ তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। ৫ হাজার টাকা ক্রেডিট কার্ডে বাকি থাকায় ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থী হবিগঞ্জের ড. রেজা কিবরিয়ার মনোনয়ন বাতিল হয়। বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় চট্টগ্রামে মোর্শেদ খানের মনোনয়ন বাতিল হয়। অথচ বিকল্পধারার মেজর (অব:) আবদুল মান্নান, মাহী বি

চৌধুরী, ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয় কোটি কোটি টাকা ঋণখেলাপি হওয়ার পরও। আদালতে সাজা এবং ঋণখেলাপি হওয়ায় বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, মির্জা আব্বাস, রুহুল কবির তালুদকার দুলু, আমান উল্লাহ আমান, ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন, আবদুল করিম আব্বাসী, বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী, শাহ মজিবুল হক, আসলাম চৌধুরী, গিয়াস উদ্দীন কাদের চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিনুল হক, সামির কাদের চৌধুরী, ওয়াদুদ ভূইয়া, আফরোজা আব্বাসের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

হলফনামায় সই না দেয়ায় মনোনয়ন বাতিল হয় গোলাম মাওলা রনির। অথচ সাজাপ্রাপ্ত ঢাকার হাজী মোহাম্মদ সেলিম, চাঁদপুরের ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। ১৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত বরিশাল-৪ আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী পঙ্কজ দেবনাথের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। খুলনায় নৌকা মার্কার একাধিক প্রার্থীর হলফনামা অসম্পূর্ণ থাকায় ডিসি অফিসে ডেকে এনে তা পূরণ করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের পরও ধানের শীষের প্রার্থী সরকার বাদল, মোর্শেদ মিলটন, আশফাক হোসেনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। মানিকগঞ্জে ঘটেছে নজিরবিহীন ঘটনা। জেলার তিনটি আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীদের জমা দেয়া মনোনয়নে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের 'সই ভুয়া' অভিযোগ তুলে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়। অবশ্য আপীলের মাধ্যমে বাতিল হওয়া প্রার্থিতা অনেকেই ফেরত পেয়েছেন। ভোটের আগেই বিতর্কিত ইসি নির্বাচনে কতটা নিরপেক্ষ থাকবে তা দেখার জন্য দেশবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী এক পক্ষ নৌকা মার্কা নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নেমেছে। অপর পক্ষ ধানের শীষের প্রার্থীরা পুলিশের হয়রানি থেকে বাঁচতে আদালতপাড়ায় জামিনের জন্য দৌড়ঝাঁপ করছেন। প্রার্থীদের কেউ কেউ এখনো কারাগারে রয়েছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের বিশিষ্টজন, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন মিডিয়ায় লেখালেখি, সাক্ষাৎকার ও টিভির টকশোতে ইসির বিতর্কিত ভূমিকাকে নজিরবিহীন এবং পক্ষপাতমূলক হিসেবে অবিহিত করছেন। তাদের বক্তব্য এখন পর্যন্ত ইসির যে দুর্বল ভূমিকা তা কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদের মতোই। আপীলে অনেকে প্রার্থীতা ফিরে পেলেও মাঠ পর্যায়ে প্রশাসন যেভাবে বিশেষ দলের পক্ষে কাজ করছে তাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আশাটা আপাতত সুদূরপরাহতই বলে মনে হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা নিশ্চিত হওয়া গেছে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি কখনোই শ্রদ্ধাশীল ছিল না এখন নয়। ভিন্নমত তারা কখনো সহ্য করেনি। বর্তমান মেয়াদে ক্ষমতায় আশার পর তারা বিরোধী দলের উপর নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছে। হাজার হাজার বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। বিরোধী দলের উপর জুলুম-নির্যাতন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে হামলা, মামলা, গ্রেফতার রিমান্ড ও নির্যাতনের পথ বেছে নেয়া হয়েছে। যোগসাজসী ও ভিত্তিহীন মামলায়

অনেককে শাস্তিও দেয়া হয়েছে। সরকারের প্রতিহিংসায় নির্মম ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বিরোধী দলীয় সাবেক হুইপ জয়নুল আবেদীন ফারুক, সাবেক প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, সাবেক উপমন্ত্রী আব্দুল সালাম পিন্টু, নাগরিক ঐক্যের আহবায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী, জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ড. মুহা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইন, আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, সাংবাদিক শফিক রহমান ও শওকত মহমুদ সহ অগণিত বিশিষ্ট নাগরিকগণ। পরিকল্পিতভাবে একের পর এক হত্যা করা হয়েছে বরেণ্য জাতীয় নেতাদের। যা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী ও বাকশালী চরিত্রের পরিচয় বহন করে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন খুবই অত্যাসন্ন। আওয়ামী লীগ দেশে আবারও ৫ জানুয়ারির তামাশা ও ভাঁওতাবাজীর নির্বাচনের আদলে আবারও নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু বিরোধী দল এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় আওয়ামী লীগের আশায় কিছুটা হলেও গুঁড়ে বালি পড়েছে। তাই দেশকে ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার মুক্ত করতে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সকলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সীমাহীন দুর্নীতি

“
ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে সরকার দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, উপরন্তু জনগণের করের টাকা দিয়ে সরকার ব্যাংকগুলোর মূলধন জোগান দিচ্ছে। এতে ব্যাংক লুটপাটকারীরা আরো উৎসাহিত হচ্ছে। তারা বলছে, আর যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে খেলাপি সংস্কৃতি কমবে না
”

ঋণখেলাপি ও ব্যাংক লুটপাট

১০ বছরে খেলাপি ঋণ হয়েছে সাড়ে ৫ গুণ

দুর্বল হয়ে পড়ছে ব্যাংকিং খাত

আশরাফুল ইসলাম

বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে দেশের ব্যাংকিং খাতে অবলোপনসহ খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে ৫ শ' শতাংশ। আর অবলোপন বাদে (নিট) খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে ৩ শ' শতাংশ। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসে। তখন ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা। আর ঋণ অবলোপন ছিল প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। সব মিলে সামগ্রিক খেলাপি ঋণ ছিল প্রায় সাড়ে ২৪ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর শেষে অবলোপনসহ খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা। এর মধ্যে অবলোপন বাদে খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা।

ঋণ দিয়ে তা আদায় করতে পারছে না ব্যাংক। এতে ফি বছরই খেলাপি ঋণ বাড়ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ঋণের সুদের হারে। কাঙ্ক্ষিত হারে সুদহার কমাতে পারছে না। আবার ঋণ আটকে পড়ায় ব্যাংকগুলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণ করতে পারছে না। ফলে তহবিল ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাড়ছে। কমছে প্রকৃত আয়। এভাবেই দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে ব্যাংকগুলো।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব এবং ঋণ বিতরণে রাজনৈতিক প্রভাবসহ বিভিন্ন কারণে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। ব্যাংক কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সরকারি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণের হার বেশি। সোনালী, জনতা ও বেসিক

ব্যাংকের মতো কিছু ব্যাংক বিশাল অঙ্কের খেলাপি ঋণের কারণে উচ্চ খেলাপি ঋণে জর্জরিত। এ ছাড়া সম্প্রতি ফারমার্স ব্যাংকসহ কিছু কিছু বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশিষ্টরা। আর খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করছে। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে সরকার দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, উপরন্তু জনগণের করের টাকা দিয়ে সরকার ব্যাংকগুলোর মূলধন জোগান দিচ্ছে। এতে ব্যাংক লুটপাটকারীরা আরো উৎসাহিত হচ্ছে। তারা বলছে, আর যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকলে খেলাপি সংস্কৃতি কমবে না। বরং খেলাপি ঋণ বাড়লে ভালো গ্রাহকদের দুর্ভোগই সবচেয়ে বেশি। কারণ যারা খেলাপি হয়েছেন, তাদের নেয়া ঋণের সুদাসল না পেয়ে ব্যাংক ভালো গ্রাহকদের ঋণ দেয়ার সময় সুদ বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রসঙ্গত, অবলোপনকৃত ঋণ মন্দ ঋণ হওয়ায় নীতিমালা অনুযায়ী এসব ঋণ ব্যাংকের খেলাপি ঋণের আর্থিক প্রতিবেদন থেকে আলাদা করে রাখা হয়।

ব্যাংকাররা জানান, ব্যাংকিং খাতে এ দৃশ্যমান খেলাপির চেয়ে কয়েক গুণ বেড়েছে অদৃশ্য খেলাপি ঋণের পরিমাণ; যার হিসাব প্রকৃতপক্ষে আনা যাচ্ছে না। এসব ঋণগ্রহীতা প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাচ্ছে না।

গত ১০ বছরে মোটা দাগে যেসব ব্যাংক কেলেঙ্কারির কথা জনগণ জেনেছে, তার মধ্যে উলেখযোগ্য ছিল হলমার্ক, বিসমিল্লাহ, বেসিক ব্যাংক, ফারমার্স ব্যাংক, এনন টেক্স, ক্রিসেন্ট লেদার প্রভৃতি। অখ্যাত কোম্পানি হলমার্ক সোনালী ব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত কমিটি সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার তথ্য উদঘাটনের পর তদন্ত কমিটির কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। বাধা দেয়া হয় হলমার্ক হাতিয়ে নেয়া অর্থের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের তথ্য উদঘাটনে। বিসমিল্লাহ গ্রুপ জনতা ব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি ব্যাংক থেকে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়। পরে প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা বিদেশে পাড়ি জমান। বেসিক ব্যাংক থেকে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। এ টাকা আজো উদ্ধার হয়নি। ফলে একসময় ভালো ব্যাংক হিসেবে উদাহরণ দেয়া যেত, সেই বেসিক ব্যাংক এখন ধুঁকে ধুঁকে মরছে। বর্তমান সরকারের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরের লাইসেন্স নেয়া ফারমার্স ব্যাংক থেকে ঋণের নামে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বের করে নেয়া হয়। সাধারণ গ্রাহকেরা ব্যাংকের টাকা আজো ফেরত পাচ্ছে না। উপরন্তু ব্যাংকটিকে সরকারি ৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা দিয়ে স্যালাইন হিসেবে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। হালে জনতা ব্যাংক থেকে এনন টেক্স ও ক্রিসেন্ট লেদার নামক আরো দু'টি কোম্পানির প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার ঋণ অনিয়মের তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে। এর বাইরে শীর্ষ আরো ৫-৬টি বড় ব্যবসায়ী গ্রুপ নানা অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা বের করে নিচ্ছে। কিন্তু প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে না পারছে ব্যাংক কিছু করতে, না পারছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, ব্যাংক লুটপাট ও খেলাপির ভয়ঙ্কর এ চিত্র এক দশক আগেও চোখে পড়েনি। তখন ব্যবসা করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেই লোকসান করে খেলাপি হতেন। খুব কমসংখ্যক ব্যবসায়ীই ঋণ নিয়ে ইচ্ছা করে খেলাপি হতেন। খেলাপি ঋণ 'মহামারি আকার' ধারণ করেছে মূলত ২০১২ সাল থেকে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের স্থিতি ছিল ২০ হাজার কোটি টাকা, আর অবলোপনকৃত ঋণ ছিল ১১ হাজার কোটি টাকা। এ হিসাবে অবলোপনসহ ওই সময় খেলাপি ঋণ ছিল ২১ হাজার কোটি টাকা।

গত ১০ বছরের খেলাপি ঋণের চিত্র বিশেষণ করলে দেখা যায় ২০০৮ সাল শেষে খেলাপি ঋণ কিছুটা কমে ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকায় নামে, খেলাপির হার দাঁড়ায় ১০.৭৯ শতাংশ। এই ঋণ ও এর হার পরের বছরগুলোতে ছিল এ রকম : ২০০৯ সাল শেষে খেলাপি ঋণ ২২ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৯.২১ শতাংশ। ২০১০ সালে ২২ হাজার ৭০৯ কোটি টাকা এবং মোট ঋণের ৭.২৭ শতাংশ, ২০১১ সালে ২২ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা (৬.১২ শতাংশ), ২০১২ সালে ৪২ হাজার ৭২৫ কোটি টাকা (১০.০৩ শতাংশ), ২০১৩ সালে ৪০ হাজার ৫৮৩ টাকা (৮.৯৩ শতাংশ), ২০১৪ সালে ৫০ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা (৯.৬৩ শতাংশ), ২০১৫ সালে ৫১ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা (৮.৭৯ শতাংশ) এবং ২০১৬ সালে ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা (৯.২৩ শতাংশ)। আর ২০১৭ সাল শেষে খেলাপি ঋণ হয় ৭৪ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। আর চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে হয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা ৮ লাখ ৬৮ হাজার ৭ কোটি টাকার ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আর এ সময়ে অবলোপন হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এ হিসাবে প্রকৃত খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে দেড় লাখ কোটি টাকা।

সংশিষ্টরা জানিয়েছেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ঋণখেলাপিরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও ব্যাংকগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ছে এবং ভালো ব্যবসায়ীদের ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে জালিয়াতি করে ঋণ দেয়া ও নেয়ার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছে, তাকে 'ব্যাংক লুটপাট'-এর সাথে তুলনা করছেন বিশেষকেরা। একসময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো থেকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা ঋণ নিয়ে খেলাপি হলেও এখন এ সংস্কৃতি বেশির ভাগ ব্যাংকেই ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাংকাররাও ভুয়া কাগজে ঋণের নামে টাকা দিয়ে বিশাল অঙ্কের কমিশন খাচ্ছেন। সরকারি বিভিন্ন বৈঠকেও ব্যাংক থেকে জাল-জালিয়াতি করে টাকা নিয়ে পরিশোধ না করার ঘটনাকে 'লুটপাট' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সামনে ব্যাংকিং খাতের ভবিষ্যত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল হয়ে পড়েছে।

০৬ ডিসেম্বর ২০১৮

দশ কেলেঙ্কারিতে লোপাট ২২,৫০২ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক প্রথম আলো

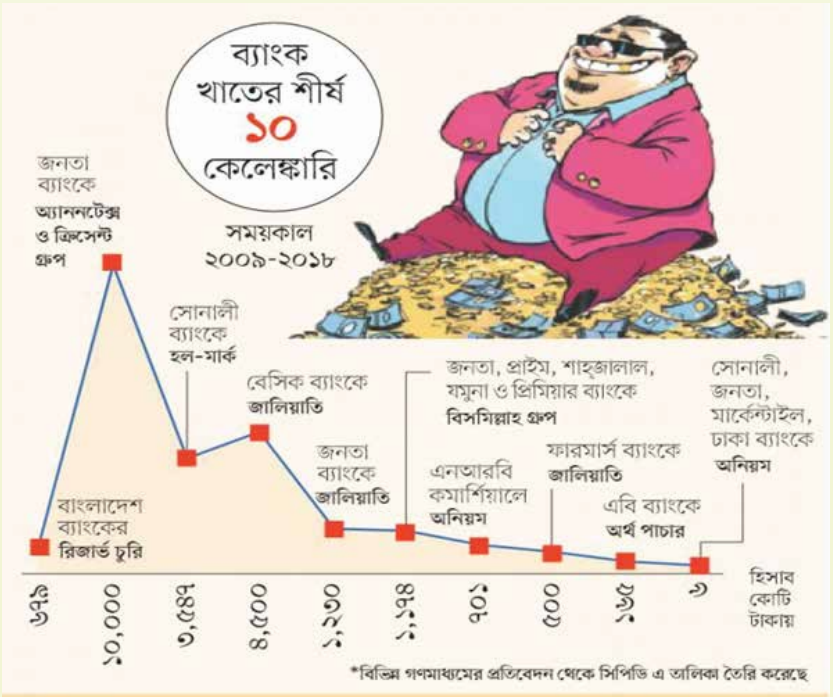

গত ১০ বছরে ব্যাংক খাতের ১০টি বড় কেলেঙ্কারিতে লোপাট হয়েছে ২২ হাজার ৫০২ কোটি টাকা। এসব কেলেঙ্কারি ঘটেছে মূলত সরকারি ব্যাংকে। সোনালী ব্যাংকের হল-মার্ক গ্রুপ দিয়ে শুরু হলেও সবচেয়ে বেশি কেলেঙ্কারি ঘটেছে জনতা ব্যাংকে। আরও রয়েছে বেসিক ও ফারমার্স ব্যাংকের অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা।

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। আর এসব তথ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সংলাপে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যেন ব্যাংকিং খাতকে অনিয়ম ও লুটপাটের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেন। ব্যাংকিং খাতকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য ব্যবহার না করা হয়। আর ভবিষ্যতে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা যেন অর্থ লুটপাটের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাংক খাতকে বেছে না নেন।

সিপিডির আয়োজনে গতকাল শনিবার 'বাংলাদেশের ব্যাংক খাত নিয়ে আমরা কী করব' শীর্ষক এই সংলাপ স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ফাহমিদা খাতুন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সংলাপে আরও অংশ নেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ও বর্তমান ব্যাংকার এবং সাবেক সরকারি কর্মকর্তারা। তাঁরা দেশের ব্যাংক খাতের দুরবস্থা, ঝুঁকি, সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

১০ বছরে ১০ কেলেঙ্কারি

মূল নিবন্ধে ফাহমিদা খাতুন বলেন, গত ১০ বছরে জনতা ব্যাংক থেকে অ্যাননটেক্স, ক্রিসেন্ট ও থারমেক্স গ্রুপ মিলে ১১ হাজার ২৩০ কোটি টাকা হাতিয়েছে। বেসিক ব্যাংক থেকে বের হয়ে গেছে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা। সোনালী ব্যাংক থেকে হল-মার্ক নিয়ে গেছে ৩ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা। বিসমিল্লাহ গ্রুপ নিয়েছে ১ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া রিজার্ভ চুরির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হারিয়েছে ৬৭৯ কোটি টাকা। নতুন প্রজন্মের এনআরবি কমার্শিয়াল ও ফারমার্স ব্যাংক থেকে লোপাট হয়েছে ১ হাজার ২০১ কোটি টাকা। এবি ব্যাংক থেকে পাচার হয়েছে ১৬৫ কোটি টাকা।

ব্যাংক খাতের এই ১০টি বড় কেলেঙ্কারিতে লোপাট হওয়া ২২ হাজার ৫০২ কোটি টাকা দিয়ে কী করা সম্ভব, তারও একটি চিত্র তুলে ধরেছে সিপিডি। সেখানে বলা হয়েছে, এই টাকা দিয়ে পদ্মা সেতু নির্মাণের ৭৮ শতাংশ বা পদ্মা সেতুর রেলসংযোগ প্রকল্পের ৬৪ শতাংশ ব্যয় নির্বাহ করা যেত। আবার সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে প্রায় ৪১ শতাংশ টাকার জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল।

সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় ব্যাংক খাত

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ব্যাংক খাতে জবাবদিহি নেই। সংক্রামক ব্যাধির মতো সরকারি ব্যাংকের সমস্যা বেসরকারি ব্যাংকে ছড়িয়ে পড়ছে। এটা বড় উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশের ব্যাংক, পরিচালনা পর্ষদ ও তদারকি ব্যবস্থা টালমাটাল হয়ে গেছে। ব্যাংক ধ্বংস হলে কাটিয়ে ওঠা

কঠিন হবে। সুশাসনের প্রচণ্ড অভাব দেখা যাচ্ছে। যারা টাকা মেরে দিচ্ছে, তাদের কিছুই হচ্ছে না।'

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংককে শুধু ক্ষমতা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, প্রয়োগ করতে জানতে হবে। তবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ করা কঠিন। ব্যাংক খাতের সমস্যা সমাধানে স্বাধীন কমিশন প্রয়োজন।

সংলাপের সম্মানিত অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ বলেন, এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে ব্যাংক খাত, প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছে। ব্যাংকের ৯০ শতাংশ অর্থের জোগান দেয় আমানতকারীরা। তাদের দেখার জন্য ব্যাংকে কেউ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব আমানতকারীদের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখভাল করার। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এ দায়িত্ব পালনে অক্ষম। ধনী মালিকদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে সাধারণ আমানতকারীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ আরও বলেন, সুদ নির্ভর করে বাজারের ওপর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দোহাই দিয়ে ব্যাংক মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সুদহার নির্ধারণ করে দিলেন। বলা হলো, না মানলে এমডিদের চাকরি চলে যাবে। এসব কিসের আলামত? ব্যাংক খাত থেকে ভদ্রলোকদের সরিয়ে কি লুটপাটকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে? তাঁর পরামর্শ হচ্ছে, ব্যাংক খাত নিয়ে সমীক্ষা সংসদে তুলে ধরা প্রয়োজন। জাতীয় সংসদ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিয়োগ দেওয়া উচিত। তাহলেই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ জমিদারের ভূমিকায় থাকবে না।

তিনজনের কারণে ঝুঁকিতে ২৩ ব্যাংক

আলোচনায় অংশ নিয়ে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ জাতীয় নির্বাচনে ঋণখেলাপি প্রার্থীদের মনোনয়ন বৈধতা সম্পর্কে বলেন, প্রভাবশালী প্রার্থীদের ব্যাংক থেকে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে পুরোনো ঋণের কিছু অংশ পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে খেলাপি ঋণের পুনঃ তফসিল করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বাজার থেকে শেয়ার কিনে যেকোনো ব্যাংকের মালিকানা নেওয়া যায়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ কাঠামো না থাকায় এক ব্যবসায়ী গ্রুপ একচেটিয়াভাবে অনেকগুলো ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। পুরো অর্থনীতিকে কিছু ব্যবসায়ীর হাতে জিম্মি করে ফেলার একই ভুল যেন আবার না করি।

এই অর্থনীতিবিদের মতে, কয়েক বছর ধরে ব্যাংকিং খাতে উন্নয়নের বদলে অনুন্নয়ন হচ্ছে। অথচ এই খাতের মধ্য দিয়ে অর্থনীতি অগ্রসর হয়। এই প্রথম দেখা যাচ্ছে, আমানতকারীদের মধ্যে প্রশ্ন জাগছে- কোন ব্যাংকে টাকা রাখলে তা নিরাপদ থাকবে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালীরা অনিয়ম করে ঋণ নিয়েও পার পেয়ে যান।

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশে ১০ জন বড় ঋণগ্রহীতার মধ্যে ৩ জন বিপদে পড়লে ২৩টি ব্যাংক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে।

এই খাতের সংস্কার আজ থেকে নয়, গতকাল থেকেই শুরু করা উচিত ছিল। নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যাংকার ও বড় ঋণগ্রহীতার এই চক্রে হাত দিতে হবে। বিপদগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে শর্তহীন পুনঃ অর্থায়ন করা হচ্ছে। মালিকদের পর্ষদে ছয় বছরের পরিবর্তে নয় বছর থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে আমানতকারীরা ঝুঁকিতে পড়ছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি ইঙ্গিত করে জাহিদ হোসেন আরও বলেন, সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রকদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, এটি ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। আমরা এখন ভুল পথে আছি। যাঁরা ব্যাংক খাতকে নিয়ন্ত্রণ করবেন, তাঁদের স্বাধীনতা না দিলে কিংবা তাঁদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা না হলে, বইপত্রে এত কিছু লিখেও কোনো লাভ হবে না। সর্বোপরি, ব্যাংক খাত ঠিক করতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন হবে।

ব্যাংক লুট করা একশ্রেণির ব্যবসায়ীদের ব্যবসা হয়ে গেছে- এই মন্তব্য করেন অর্থনীতিবিদ আবু আহমেদ।

ফারমার্স ব্যাংকে ছিলেন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি

ফারমার্স ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এহসান খসরু সংলাপে বলেন, 'ফারমার্স ব্যাংক পুনর্গঠন করা না হলে দেড় লাখ আমানতকারীর মধ্যে বিপর্যয় নেমে আসত। এতে নতুন আটটি ব্যাংকেও বিপর্যয় ঘটত। ব্যাংকের পচন শুরু হয় পর্ষদ থেকে। ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কেউ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। সামাজিকভাবে ছোট করার আশঙ্কা, চাকরি চলে যাওয়ার ভয়- এসব কারণে আমরা তাদের (পরিচালনা পর্ষদ) সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হই।'

ফারমার্স ব্যাংকের অনিয়ম রোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিলম্বিত ভূমিকা প্রসঙ্গে এহসান খসরু বলেন, ফারমার্স ব্যাংকে তো বাংলাদেশ ব্যাংকের চেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বসে ছিলেন। তিনি আবার সরকারের আর্থিক হিসাব কমিটিতেও ছিলেন। প্রসঙ্গত, সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মহীউদ্দীন খান আলমগীর ফারমার্স ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ইস্টার্ণ ব্যাংকের এমডি আলী রেজা ইফতেখারের সুপারিশ হলো, স্বাধীন ব্যাংক কমিশন গঠনের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন স্বাধীনভাবে কাজ করা। ব্যাংক খাতের কিছু জায়গায় ব্যর্থতা আছে, তবে সাফল্যের সংখ্যাই বেশি।

'কিছু হলে ব্যাংকারদের দোষ হয়। ব্যাংকারদের এখন কেউ ভালো চোখে দেখে না। প্রশ্নের মধ্যে পড়তে হয়। অথচ ঋণখেলাপি হলে নেপালে পাসপোর্ট জব্দ করা হয়। বাংলাদেশের আর্থিক খাতে কে কী নিয়ন্ত্রণ করছে- সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। এটাই বড় সংকট' -এভাবেই ব্যাংকিং খাতের কথা বলেছেন এনসিসি ও মেঘনা ব্যাংকের সাবেক এমডি নুরুল আমিন।

তবে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান নিজাম চৌধুরী বলেন, 'জাতি হিসেবে

আমরা শুধু সমালোচনা করি। গত ১০ বছরে রাষ্ট্রীয় পৃ'পোষকতায় কোনো অর্থ পাচার হয়নি। ব্যাংক খাত এগিয়ে চলছে।

নিজেদের মালিক মনে করেন পরিচালকেরা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ মনে করেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থার ভূমিকা সঠিক থাকলে ব্যাংক খাতে এত কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটত না।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের পরিচালক শাহ মো. আহসান হাবিব বলেন, বাংলাদেশে খেলাপি ঋণ যে হারে বাড়ছে, তা উদ্বেগের বিষয়। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে তো সরকারি ব্যাংক নিয়ন্ত্রণের পুরো ক্ষমতা নেই।

সাবেক অর্থসচিব সিদ্দিকুর রহমান বলেন, খেলাপি ঋণ আদায় করা যাবে কি না, এ সিদ্ধান্ত সরকারপ্রধানের পক্ষ থেকে আসতে হবে।

এমসিসিআইয়ের সাবেক সহসভাপতি কামরান টি রহমান বলেন, নিজেদের মালিক মনে করেন ব্যাংকের পরিচালকেরা। তাঁদের বিশ্বাস করে মানুষ ব্যাংকে টাকা জমা রাখে, এটা তাঁরা মনেই করেন না।

বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ও তরুণ ব্যবসায়ী তাবিথ আউয়াল বলেন, সামনে নির্বাচন, ঋণখেলাপিদের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহারে বিশেষ ঘোষণা থাকতে হবে। ব্যাংকঋণ নিয়ে শোধ করছেন না, এমন কারও মনোনয়ন দেওয়া উচিত হবে না। বিএনপি এমন কাউকে মনোনয়ন দিলে সুশীল সমাজ তা তুলে ধরতে পারে।

নাগরিক কমিশন গঠনের সুপারিশ

সিপিডির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া না হলেও আগামী নির্বাচনের পর ব্যাংক খাত নিয়ে একটি নাগরিক কমিশন করবে সিপিডি। ওই কমিশন ব্যাংক খাতের একটি স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরবে। কেন ব্যাংক খাতের এই অবস্থা, সেই কারণগুলো উদ্ধার করবে। পরে সমাধানের পথ খোঁজা হবে। ব্যাংক খাত হলো অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ডকে সচল রাখতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোকে ইশতেহারে বলতে হবে, ব্যাংক খাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করবে না। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধিবিধান করা হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে ব্যাংক খাতকে নিষ্কৃতি দিতে হবে।

০৯ ডিসেম্বর ২০১৮

> শুধু দুর্নীতি, লুটপাট আর পাচারই নয়, ব্যাংকিং খাত জিম্মি হয়ে পড়েছে মাত্র ২০ জন ঋণখেলাপির কাছে। এইসব ঋণখেলাপিরা সরকারের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। দেশের টাকা, দশের টাকা মেরে দিয়ে এরা অবৈধ সরকারের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে, লেনদেন করছে

ব্যাংক ও শেয়ারবাজারখেকো আওয়ামী লীগ

আদম অংকুর

অবৈধভাবে ক্ষমতাগ্রহণ করা ও ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকা শোষকচক্র সবসময়ই দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটুও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০০৮ সালে অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে আঁতাতের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করে। ২০১৪ সালে ভোটারবিহীন, একতরফা নির্বাচন নামক প্রহসন মঞ্চায়ন করে সেই অবৈধ ক্ষমতা দশ বছর দীর্ঘায়িত করার পরও তারাই ক্ষমতায়। জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন ২৩ দলীয় জোট আওয়ামী স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবারের নির্বাচনের অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত না নিলে এই অবৈধ শাসকগোষ্ঠী আবারও যেনতেন একটি নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতায় থাকার পাঁয়তারা করত।

গত দশ বছরে এদের শাসনকালে দুঃশাসন ও দুর্নীতি চরম মাত্রায় উপনীত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রায় সকল সেক্টরে, প্রশাসনের উচ্চমহল থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই ছড়িয়ে দিয়েছে দুর্নীতি। দেশের ব্যাংকিং সেক্টরেও তারা ইতিহাসের সর্বোচ্চ বিপর্যয় ডেকে এনেছে দুর্নীতি, লুটপাট ও অর্থপাচারের মাধ্যমে।

২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার বা প্রায় ৮০৮ কোটি টাকা ডিজিটাল পদ্ধতিতে হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে চুরি করা হয় যা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কে গচ্ছিত ছিল। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের বাংলাদেশ অ্যাকাউন্ট থেকে চুরি হওয়া ১০০ মিলিয়ন ডলার ফিলিপাইনের জুয়ার বাজারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান গভর্নর আতিউর রহমান ব্যাপক সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মার্চ ২০১৬ তারিখে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার আগে তিনি জনসম্মুখে বলেন, দেশের স্বার্থে আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। তবে এদেশের অর্থনীতিবিদরা জানেন যে আতিউর রহমানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ অর্থ চুরির সঙ্গে সরকারের উচ্চপর্যায়ের হাত আছে। সে কারণেই আতিউরকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে।

গত দশ বছরে দেশ থেকে ৬ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে। দুর্নীতিবাজ সরকারের নিজস্ব লোকেরাই এ অর্থ পাচার করেছে। গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০০৯ সালে পাচার হয়েছে ৬১২ কোটি ৭০ লাখ ডলার, ২০১০ সালে ৫৪০ কোটি ৯০ লাখ ডলার, ২০১১ সালে ৫৯২ কোটি ১০ লাখ ডলার, ২০১২ সালে ৭২২ কোটি ৫০ লাখ ডলার, ২০১৩ সালে ৯৬৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার, ২০১৪ সালে ৭০০ কোটি ৬৯ লাখ ডলার, ২০১৫ সালে ৪ হাজার ৬২৭ কোটি টাকা, ২০১৬ সালে ৫ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। [লন্ডন টাইমস, ৭ আগস্ট ২০১৭]

সোনালী ব্যাংকে কিভাবে কত প্রকারে দুর্নীতি হয়েছে তার চিত্র একনজরে দেখা যাক পত্র-পত্রিকার শিরোনাম থেকে। 'সোনালী ব্যাংকে সর্ববৃহৎ অর্থ কেলেঙ্কারি' [মানবকণ্ঠ, ৪ অক্টোবর ২০১৩], গ্রীণ প্রিন্টার্স লিমিটেড দেড়শ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে (ঐ), সোনালী ব্যাংকে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকার জালিয়াতি (আমার দেশ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম বহির্ভূত বিপুল অংকের ঋণদায় তৈরি (প্রথম আলো ২ জুলাই ২০১৩), ৪০১ কোটি টাকা ঋণ খেলাফিতে সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তারা জড়িত (ঐ), সোনালী ব্যাংকের নিকট ৪২টি ব্যাংক পাওনা ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (যুগান্তর ২২ অক্টোবর ২০১৩), ৩ হাজার ১৫৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লোকসানে সোনালী ব্যাংক (ঐ)।

সোনালী ব্যাংকের শুধুমাত্র রূপসী বাংলা শাখা থেকেই ২০১০-২০১২ সময়ের মধ্যে জালিয়াতির মাধ্যমে ৩ হাজার ৫শ ৪৭ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এরমধ্যে এক হলমার্ক গ্রুপই লুটে নিয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি। ২০০৯ সালে প্রদীপ কুমার দত্ত ডিএমডি থাকাকালে এ কেলেঙ্কারির সূত্রপাত। এই প্রদীপ কুমার দত্ত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ শহরে বহু সংখ্যক আবাসিক প্লট ও ফ্ল্যাটের মালিক। নামে বেনামে তার অসংখ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া গেছে। ৯০-০১, ১৮৫ স্ট্রীট হলইজ নিউইয়র্ক-১১৪২৩ এই ঠিকানায় তার মালিকানাধীন বাড়ি। রাজধানীর ৫ সিদ্ধেশ্বরীতে 'অবসরা' নামক ভবনের ষষ্ঠ তলায় ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ফ্ল্যাট তাকে দিয়েছে হলমার্ক। ময়মনসিংহ শহরের সি কে ঘোষ রোডে ১২টি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ৬ তলা বাড়ির দাম আড়াই কোটি টাকা। নামে বেনামে আরও ১৭ কোটি টাকার ফ্ল্যাট,

গ্রামের বাড়িতে ৮০ বিঘা জমি... আরো কত কী !

শুধু সোনালী ব্যাংক নয় জনতা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক এক্সিম ব্যাংক, কর্মাস ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, এবি ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ইউ সি বি এল, এন সি সি ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক [বিডিবিএল] থেকে সর্বশেষ দেশের সবচাইতে জনপ্রিয় ইসলামী ব্যাংকেও হানা দিয়েছে এই দুর্নীতিবাজ অবৈধ সরকারের পোষ্যরা।

শুধু দুর্নীতি, লুটপাট আর পাচারই নয়, ব্যাংকিং খাত জিম্মি হয়ে পড়েছে মাত্র ২০ জন ঋণখেলাপির কাছে। এইসব ঋণখেলাপিরা সরকারের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। দেশের টাকা, দশের টাকা মেরে দিয়ে এরা অবৈধ সরকারের সঙ্গে দহরম-মহরম করছে, লেনদেন করছে। এই ঋণখেলাপিদের নিয়ে প্রতিবেদন লিখেছে দৈনিক যুগান্তর ১০ জানুয়ারি ২০১৩। রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারের ৭ ব্যাংকে ৩১ পরিচালক নিয়োগ নিয়ে পত্রিকাটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ১৯ নভেম্বর ২০১২। এরকম রাজনৈতিক দুর্নীতিবাজদের নিয়োগ দিয়ে সর্বত্র দলীয়করণের মাধ্যমে গত দশ বছর ধরে দুর্নীতির মহোৎসব চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা।

ব্যাংকিং সেক্টরের পাশাপাশি শেয়ারবাজারও লুটে নিয়েছে এই লুটেরা সরকার। শেখ হাসিনা সরকারের দুর্নীতির এক নিষ্ঠুর উপাখ্যান শেয়ারবাজার লুটপাট। ২০১১-১২ অর্থ বছরে শেয়ারবাজার থেকে তারা লুটে নিয়েছে প্রায় ১ লাখ কোটি টাকা। ৩৩ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাদের হাহাকারে সারাদেশ স্তম্ভিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রথমবার শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটে নিয়েছিল এই আওয়ামী লীগের লুটেরা গোষ্ঠী। ২০১১-১২ অর্থ বছরে তারা সেই রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। পুঁজি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ৩৩ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীর মধ্যে বহু মানুষ আত্মহত্যা করেছে। এই নির্লজ্জ লুটেরা সরকার তারপরও সব লুটেপুটে খাচ্ছে।

এই ভয়াবহ দুর্নীতিবাজ ফ্যাসিবাদী সরকার যদি ক্ষমতায় থেকে যায় তাহলে আঠারো কোটি মানুষের বাংলাদেশ মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে যাবে। তাই এখনই সময় আসন্ন নির্বাচনকে সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করার। এই নির্বাচনে গণমানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং সেই ভোটের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার অতীতের চাইতেও ভয়ানক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু জনতার সাহস ও একতার কাছে হার মানতে তারা বাধ্য হবেই।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

> “শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন সিদ্ধান্ত নেবে তারা প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক কী কারণ জানা নেই, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনও সেই সিদ্ধান্তটি নেয়নি। কেন নেয়নি আমি জানি না। আমি শিক্ষামন্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে কখনও উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনিনি, ‘আমি এই দেশের ছেলে-মেয়েদের কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে আর কখনও প্রশ্ন ফাঁস হবে না!’”

কেন ‘প্রশ্ন ফাঁস মানি না, মানবো না’

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমার একজন ছাত্রী, যে এখন আমার সহকর্মী, আমাকে জিজ্ঞেস করল, স্যার প্রশ্ন ফাঁসের ওপর অমুক চ্যানেলের অনুষ্ঠানটা দেখেছেন? আমি টেলিভিশন দেখি না, কাজেই মাথা নাড়লাম। বললাম, দেখিনি। সে বলল, স্যার আপনাকে দেখায়। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, আজকাল সব অনুষ্ঠান স্মার্টফোনে দেখা যায়। অপমান ও লজ্জার একটি দৃশ্য থেকে মানুষ যেভাবে চোখ ফিরিয়ে নিতে চায়, এই বিষয়টা থেকেও মনে মনে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইছিলাম। কিন্তু আমি সাহস করে সেটা বলতে পারলাম না। তাই একটা অপমান ও লজ্জার ঘটনা থেকেও অনেক বেশি মর্মান্তিক একটি অনুষ্ঠান আমাকে দেখতে হলো। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে উত্তেজিত ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষার আগে মাতামাতি করছে। টেলিভিশন চ্যানেল কিশোর-কিশোরীর চেহারা ঝাপসা করে দিয়েছে, যেন তাদের চেনা না যায়। অশালীন ও ভায়োলেন্ট দৃশ্য এভাবে ঝাপসা করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে স্কুলের পোশাক পরা কিশোর-কিশোরীর চেহারা এখন অশালীন কিংবা ভায়োলেন্ট দৃশ্যের সমপর্যায়ের, এগুলো ঝাপসা করে রাখতে হয়। আমি এই বয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য বানিয়ে বানিয়ে কিশোর উপন্যাস লিখি, সায়েন্স ফিকশান লিখি। আমি এদের নিয়ে স্বপ্ন দেখি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এই কিশোর-কিশোরীদের আদর্শহীন নীতিহীন ভবিষ্যতহীন ঘাগু ক্রিমিনাল বানানোর প্রথম ধাপটি হাতে ধরে পার করিয়ে দিচ্ছে। এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি? তারা হয়তো এত অল্প বয়সে এ রকম একটি অপরাধ করতো না, কিন্তু আমরা তাদের অপরাধ করতে শিখিয়েছি। এর দায়িত্বটি কে নেবে?

শুধু যে ছেলে-মেয়েরা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে মাতামাতি করছে তা নয়, ছেলে-মেয়েদের বাবা-মায়েরাও একই আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে নির্লজ্জের মতো ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে ছোটাছুটি করছেন। রাত জেগে ফেসবুক থেকে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নামিয়ে আনছেন, পরিচিত মানুষজন শিক্ষকদের দিয়ে তার সমাধান করিয়ে আনছেন। তারপর ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। একজন কিশোর কিংবা কিশোরী দেখছে তার বাবা-মায়েরা আসলে দুর্বৃত্ত। আমি জানি না তারা অবাক হয়েছিল কিনা, অনেকে হয়তো হয়েছে। অনেকে হয়তো বাবা-মায়ের এই অপরাধের সঙ্গী হয়নি, একরোখা তেজস্বী হয়ে সৎ থেকেছে। কিন্তু আমি জানি অনেক শিশু সেটা পারেনি, তারা এই অসততার ভাগী হয়েছে। তারা মেনে নিয়েছে। আজীবন বাবা-মাকে ঘৃণা করে করে একটা অন্যায় জীবন শুরু করেছে। এটা হওয়ার কথা ছিল না। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেশে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। হাজার হাজার পরিবারের কোমল ভালোবাসার বন্ধনটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসের কারণে যারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে তারা হচ্ছে এই দেশের সোনার টুকরো ছেলে-মেয়েরা যারা পণ করেছে তারা অন্যায় করবে না, অপরাধ করবে না। প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরও তারা সেই প্রশ্ন দেখেনি, নিজের কাছে সৎ থেকেছে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তাদের সেই দীর্ঘশ্বাস আমি মাঝে মাঝে শুনতে পাই, আমি তাদের কী বলে সান্ত্বনা দেব, বুঝতে পারি না। তারা গভীর এক ধরনের হতাশা নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার চারপাশে অন্যেরা নির্বিকারভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, যাদের পরীক্ষার ফল হয়তো অনেক ভালো হবে। জোর করে সৎ হয়ে থাকা ছেলে-মেয়েরা এক ধরনের বিস্ময় এবং হতাশা নিয়ে আবিষ্কার করছে যে, তারা নিজ হাতে নিজেদের ভবিষ্যতের জীবনটিকে অনিশ্চিত করে দিচ্ছে। এই দেশে পরীক্ষার ফল ভালো না হলে ভবিষ্যতের দরজাটি একটা একটা করে বন্ধ হয়ে যায়। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন না দেখে তারা হয়তো দুর্বৃত্তদের জন্যে দরজা খোলা রেখে একজন একজন নিজেদের ভবিষ্যতের দরজাগুলো বন্ধ করে পেছনে সরে এসেছে। তাদের সেই গভীর হতাশা আর তীব্র ক্ষোভের সামনে এসে দাঁড়ানোর সাহস কার আছে? জীবনের শুরুতে তারা অবাক হয়ে দেখেছে এই দেশটি দুর্বৃত্তদের দখলে। তাদের পাশে কেউ নেই। আমরা কেমন করে তাদের সান্ত্বনা দেব? সাহস দেব? ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাব? পৃথিবীর আর কোনও দেশে কি এরকম উদাহরণ আছে, যেখানে একটি রাষ্ট্র এত পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতটা ভেঙে শিক্ষার্থীদের অপরাধী হিসেবে বড় করে তোলে?

২০১৪ সালেও আমি প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছি। রেডিও টেলিভিশনে চেঁচামেচি করেছি। এমনকী একদিন প্রতিবাদ করে শহীদ মিনারে বসেও থেকেছি। আমার সঙ্গে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির কিছু ছেলে-মেয়ে ছিল। আমার পরিচিত কিছু বন্ধুবান্ধব ছিলেন এবং টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিকরা ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমি প্রথমবার আবিষ্কার করেছিলাম যে, আমার এই হাস্যকর ছেলেমানুষী প্রতিবাদে এই দেশের বড় বড় শিক্ষাবিদ নেই। সবাই আমার মতো প্রতিবাদ

করার জন্য বৃষ্টিতে বসে ভিজবেন, আমি সেটা মোটেও আশা করি না। কিন্তু পত্র-পত্রিকায় একটু লিখবেন, রেডিও টেলিভিশনে বক্তব্য দেবেন- আমি অন্তত সেটা তো আশা করতে পারি। সেটা ঘটেনি। আমার মনে আছে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে এই দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষকে আমি সিলেট থেকে ফোন করে কিছু একটা করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বিষয়টা নিয়ে একটা সেমিনার জাতীয় কিছু করবেন, সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করবেন। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত কিছু করলেন না।

২০১৭ সাল আবার হুবহু একই ব্যাপার ঘটতে শুরু করছে। এই দেশের কিছু তরুণ ছেলে-মেয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে কিনা তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছে। প্রতিবার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নগুলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের পাশাপাশি ছাপিয়ে একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তারপরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝতে পারি। প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সেটা মেনে নিলে তাদের পরীক্ষাটা বাতিল করে আবার পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা বাতিল করে আবার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়াটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা তারা যেহেতু প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করতে পারছেন না তাই আবার পরীক্ষা নেওয়া হলে আবার যে সেই প্রশ্ন ফাঁস হবে না সেই গ্যারান্টিটুকু কে দেবে? কাজেই তাদের জন্য যেটা করা সহজ সেটাই করছেন, কিছু না করে চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে আছেন। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানেন কিছু গুরুত্বহীন মানুষ কয়েকদিন চেঁচামেচি করে এক সময় ক্লান্ত হয়ে থেমে যাবে। আর এই দেশের যারা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাবিদ তারা কিছু বলবেন না। তারা নির্বোধ নন। পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের মতো 'তুচ্ছ' একটা বিষয় নিয়ে কথা বলে তারা কখনও সরকারকে বেকায়দায় ফেলবেন না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় একেবারে কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকার বিষয়টা আমি বুঝতে পারি কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তারা কোনও একটা বক্তব্য দেন আমি সেটা বুঝতে পারি না। আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি যখন দেখেছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনও একজন কর্মকর্তা বলেছেন যে, আসলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। কিছু মানুষ গত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র যাচাই-বাছাই করে একটা সাজেশন দিচ্ছে এবং ঘটনাক্রমে সেই সাজেশনের একটা-দু'টি প্রশ্ন সত্যিকারের প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে তার বেশি কিছু নয়। যারাই খবরের কাগজ পড়েন তারা সবাই জানেন এই কথাটি ভুল কথা নয়, এটি মিথ্যা কথা। শুধু মিথ্যা কথা নয় এ ধরনের কথাকেই নিশ্চয়ই ডাহা মিথ্যা কথা বলে। আমরা সবাই জানি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু ফাঁস হয়েছে (এবং ফাঁস হচ্ছে) কাজেই এ রকম একটা ডাহা মিথ্যা কথা বলে কোনোভাবেই কোনও দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমার দুঃখ সম্পূর্ণ অন্য জায়গায়। যখন প্রশ্নপত্র পুরোপুরিভাবে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে তখন যদি মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা করা হয়

যে, আসলে এটি একটি সাজেশন মাত্র তখন একটা খুবই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে যায়। যারা প্রশ্ন ফাঁস করে যাচ্ছে তাদের একটা 'ইনডেমনিটি' দিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে যারা জড়িত তারা নিশ্চয়ই আনন্দে অট্টহাসি দিতে থাকেন। কারণ দেশের আইনে তারা কোনও অপরাধ করেননি। প্রশ্নপত্রের সাজেশন দেওয়া মোটেও অন্যায় কোনও কাজ নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজের মুখে সেই কথাটি বলেছে।

কাজেই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু যে প্রশ্ন ফাঁস হতে দিয়ে এই দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে তা নয়, যারা এই প্রশ্ন ফাঁস করে যাচ্ছে তাদের অপরাধকেও পুরোপুরি মার্জনা করে দিচ্ছে। এর চাইতে বড় দুঃখের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

২.

সবাই জানে পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস অনেক বড় একটা সমস্যা। একটা সমস্যা নিয়ে আহাজারি না করে সমস্যাটার সমাধান করে ফেলা নিশ্চয়ই অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। তাহলে আমরা কেন সেই কাজটি করছি না?

এই প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই একেকজনের কাছে একেক রকম। কিন্তু আমার কাছে উত্তরটি খুবই সহজ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যখন সিদ্ধান্ত নেবে তারা প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক কী কারণ জানা নেই, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনও সেই সিদ্ধান্তটি নেয়নি। কেন নেয়নি আমি জানি না। আমি শিক্ষামন্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে কখনও উচ্চকণ্ঠে বলতে শুনিনি, 'আমি এই দেশের ছেলে-মেয়েদের কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে আর কখনও প্রশ্ন ফাঁস হবে না!'

তারা সবসময় চুপচাপ থেকেছেন, প্রশ্ন ফাঁসের জন্য দায়িত্ব অবহেলার কারণ দেখিয়ে কখনও কারও চাকরি যায়নি। প্রশ্ন ফাঁসের এত বড় একটা ব্যাপারের কারণে কখনও কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেননি। আমরা বরং দেখে আসছি এখন পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটিকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

আমি খুব জোর গলায় বলে আসছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাইলেই প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হয়ে যাবে। কেন বলছি তার কারণটি খুব সহজ। বাংলাদেশ এখন মোটেও হেলা-ফেলার দেশ নয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশের সঙ্গে অসম্মানজনক ব্যবহার করার পর তাদের পুরাপুরি উপেক্ষা করে বাংলাদেশ নিজের অর্থায়নে পদ্মা ব্রিজ তৈরি করার সাহস এবং ক্ষমতা দেখিয়েছে। আজ থেকে এক যুগ আগে আমরা কেউ ভাবিনি এই সরকার মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করতে পারবে, এই সরকার শুধু বিচার করেনি, বিচার কার্যকরও করেছে। এই দেশে যখন ব্লগারদের হত্যা করা হচ্ছিল তখন কোনও একটা কারণে সরকার জঙ্গিদের ধরার ব্যাপারে তৎপরতা দেখায়নি, কিন্তু হোলি আর্টিজানের ঘটনার পর যখন

সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছে তখন তাদের দমন করে এনেছে। এ রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়, সব উদাহরণের পেছনের ঘটনাটি খুবই সহজ, যখনই সরকার কিছু একটা করতে চেয়েছে সরকার সেটা করতে পেরেছে। এই দেশে সরকার এত বড় বড় কাজ করে ফেলতে পারে আর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস না করে তারা একটা পরীক্ষা নিতে পারবে না আমি সেটা বিশ্বাস করি না। সরকারকে শুধু সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা এই কাজটি করবে।

এর আগেরবার মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা হয়েছিল। তখন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলো এবারে তারা কিছুতেই আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেবে না। তারা সঠিক মানুষকে দায়িত্ব দিলো। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিও সঠিক মানুষদের নিয়ে টিম তৈরি করলেন, তারা মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষাটি একেবারে নিখুঁতভাবে নিয়ে নিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই পুরো প্রক্রিয়াটি একেবারে কাছে থেকে দেখার। কিভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস না করে পরীক্ষা নেওয়া যায়, এখন আমি সেটা জানি।

তাই আমি এত জোর গলায় বলতে পারি কর্তৃপক্ষকে শুধু একবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না, তাহলেই এই দেশে প্রশ্ন ফাঁস হবে না!

শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শুধু চাইতে হবে যে, তারা প্রশ্ন ফাঁস হতে দেবে না। কিন্তু তারা এখনও সেটা চাইছে না। তাহলে কেমন করে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হবে?

শুধু একটিবার তাদের মুখ ফুটে বলতে হবে, 'এই দেশের মাটিতে আর কখনও প্রশ্ন ফাঁস হবে না।'

এই কথাটি উচ্চারণ করতে তাদের এত দ্বিধা কেন?

লেখক: কথাসাহিত্যিক, শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

> এই প্রশ্নপত্র ফাঁস নামের মহামারি রোগের চিকিৎসার প্রথম ধাপ হলো, সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। তারপর তাকে চাইতে হবে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস তারা বন্ধ করতে চায়ও

চুপ! প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি!

আনিসুল হক

অধঃপতনের শেষতম খাদটায় গিয়ে পৌঁছেছি, আমরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দিয়েছি। আরও অনেকের মতো পরীক্ষার আগের রাতে আমার ফেসবুকের দেয়ালে অনেকেই প্রশ্নপত্র সেঁটে দেন, ই-মেইলে প্রশ্নপত্র যে ফাঁস হয়েছে তার নমুনা আসে, সেসব ই-মেইল আরও আরও সাংবাদিকের কাছেও যায়, যেমন যায় অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের কাছে। তিনি আগের রাতে পাওয়া প্রশ্নপত্র আর পরের দিনের সত্যিকারের প্রশ্নপত্রের ছবি পাশাপাশি প্রকাশ করে দেখিয়েছেন, প্রশ্নপত্র আসলেই ফাঁস হয়েছে কি না। আমি বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে খবর দেখলাম, বাচ্চারা বলছে, পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে, কারণ আগের রাত ১০টায় আমাদের কোচিং সেন্টারের স্যার এসে আমাদের কতগুলো প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিয়েছেন, আজকে সেসব প্রশ্নই পরীক্ষায় এসে গেছে। এর পরও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষ বলছে, না, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি।

এটাকে বলে ডিনায়াল সিনড্রোম। অস্বীকার করা। এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে যখন জিগ্যেস করা হয়, এই, তুমি নাকি নেশা করছ? সে সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করবে। তারপর যেদিন তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলবেন, এই তো তুমি নেশার জিনিস নিচ্ছ; তখন সে বলবে, এটা সেই জিনিস না। ওই রকম দেখতে বটে, তবে এটা কোনো নেশাদ্রব্য নয়। তারপর যখন আপনি তার রক্ত-প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখবেন যে সে সত্যিই মাদক নিচ্ছে, তখন সে বলবে, এটা আমি একটু শখ করে নিয়েছি, এই এক দিনই, এর আগেও কখনো নিইনি, পরেও নেব না, আমার নেশা হয়নি, আমি এটা এখনই ছেড়ে দিতে পারব।

মাদকাসক্তির চিকিৎসা যাঁরা করেন, সেই বিশেষজ্ঞরা বলেন, মাদকাসক্তির একটা লক্ষণ হলো, রোগী তা অস্বীকার করবে। খুব সুন্দর করে মিথ্যা কথা বলবে। খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলবে। তারপর আপনি যখন তাকে বলবেন, এই তো প্রমাণ, সে রেগে যাবে।

আমাদের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে মন্ত্রী, কর্মকর্তারা একদম মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের মতো আচরণ করছেন। তাঁরা ডিনায়াল সিনড্রোমে ভুগছেন। তাঁরা খুব সুন্দর বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। এটা কতিপয় দুষ্টুলোকের মিথ্যা অপপ্রচার। তারপর যখন তাঁদের হাতে প্রমাণ তুলে দেওয়া হচ্ছে, তাঁরা রেগে যাচ্ছেন। বলছেন, তোমার হাতে নকল প্রশ্ন, তার মানে তুমিই অপরাধী।

চিকিৎসকেরা বলেন, মাদকাসক্তি থেকে মুক্তির প্রথম উপায় হলো স্বীকার করে নেওয়া যে আমি মাদক নিয়ে থাকি, আমি নেশা করি। এটা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ এই চিকিৎসা খুবই কঠিন। এর পরের ধাপ হলো, রোগীকে চাইতে হবে যে সুস্থ হবে, সে নেশা ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে।

এই প্রশ্নপত্র ফাঁস নামের মহামারি রোগের চিকিৎসার প্রথম ধাপ হলো, সরকারকে স্বীকার করতে হবে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। তারপর তাকে চাইতে হবে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস তারা বন্ধ করতে চায়ও।

বাঙালি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই কথার ওপরে আর কোনো কথা নেই, 'রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।' বাঙালি যে মানুষ নয়, তার সর্বশেষ ও সবচেয়ে জলজ্যান্ত প্রমাণ হলো সে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে। কোচিং সেন্টারের কর্তাদের ঘুম নেই, তাঁরা রাত ১০টায় পাওয়া প্রশ্নপত্র নিয়ে ছুটছেন তাঁদের ছাত্রদের কাছে, তাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলছেন, গাধা, এই হলো প্রশ্ন আর এই হলো উত্তর।

যে লাখ লাখ বাচ্চা পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের আর তাদের মা-বাবার দুর্দশা দেখে আমার চোখ ফেটে জল আসতে চাইছে। বাবা বসে আছেন ফেসবুকে, দেখতে পাচ্ছেন প্রশ্নপত্রের নমুনা বেরিয়ে গেছে, এখন তিনি কী করবেন? তাঁর ছেলেমেয়েকে ডেকে তুলে সেসব প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দেবেন? জীবনের শুরুতেই চুরিবিদ্যার জীবাণু ঢুকিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য অসুস্থ বানাবেন শিশুটিকে। আবার ছেলেমেয়ের বন্ধুরা পরীক্ষায় ভালো করবে আর তাঁর ছেলেমেয়ে খারাপ করবে, তখন তো বাচ্চাটার মন ভেঙে যাবে। আমি ভয়ে আমার ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব যাদের ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের জিগ্যেস করছি না যে তোমরা কী করছ। এর চেয়ে বিব্রতকর প্রশ্ন তার জন্য আর কী হতে পারে?

বাংলাদেশ দুর্নীতিতে অনেকবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই দেশে সবকিছু চলছে জুয়োচুরি দিয়ে। সব পেশাতেই ভালো মানুষ আছেন, অনেকেই আছেন, সেটা স্বীকার করে নিই, তা না হলে এত দুর্নীতি, এত অন্যায়, এত পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত এই দেশে সূর্য আলো দিত না, মেঘ বৃষ্টি দিত না। তবু আমার মনে হয়, এই হতভাগা দেশে শিক্ষক শিক্ষকের চাকরি

পান লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে, পুলিশ পোস্টিং পায় লাখ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে, শিশুকে স্কুলে ভর্তি করাতে হয় লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে। এই দেশে প্রকৌশলীরা ট্রুথ কমিশনে স্বীকার করেছেন যে কোটি কোটি টাকা তাঁরা আয় করেছেন অবৈধ পথে, এই দেশে চিকিৎসকেরাও সুযোগ পেলে দুর্নীতি করেন। তো এই পোড়ার দেশে হাজার হাজার পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র যাবে, আর তা কেউ খুলে দেখবেন না, তাঁর ছেলেমেয়েকে দেবেন না, সে তার বন্ধুকে দেবে না আর তা ছড়িয়ে পড়বে না, এটা হতেই পারে না। যিনি প্রশ্নপত্র রচনা করেন, সেখান থেকে শুরু করে ছাপাখানা, বিলি-বণ্টন, খামে পোরা, বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো, হলের গেট পর্যন্ত পৌঁছানো- এত সব আয়োজনের সর্বত্র এটা ফাঁস হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছে।

কাজেই আমার পরামর্শ হলো:

১. প্রাথমিক ও জুনিয়র সমাপনী পরীক্ষা তুলে দিন। ছেলেমেয়েরা আনন্দের জন্য পড়ুক, ফলের জন্য নয়। জ্ঞানের জন্য পড়ুক, সার্টিফিকেটের জন্য নয়। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার সার্টিফিকেট দিয়ে কী হবে? আমি জানি, এই পরীক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের একটা কারণ ছিল, যাতে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা ঝরে না পড়ে। ঝরে পড়ার এক শ একটা কারণ আছে। এই সার্টিফিকেটের লোভে কেউ ফাইভ পর্যন্ত পড়বে না।

২. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পাঁচ সেট প্রশ্ন করুন। পরীক্ষার দিন সকালে লটারি করে ঠিক করা হবে কোন সেটে পরীক্ষা হবে। সেটা মোবাইলে/ই-মেইলে/ফোনে সব হলে হলে জানিয়ে দিন।

প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নপত্রেই যাতে লেখা যায়, সেভাবে জায়গা রেখে প্রশ্নপত্র তৈরি করুন।

পাঁচ সেট প্রশ্ন ফাঁস হলে সবগুলো যদি কেউ শিখে আসে, তাহলে সে অন্তত কিছু পড়াশোনা করতে বাধ্য হবে।

আর অভিভাবকদের বলি, পরীক্ষার ফল দিয়ে কী হয়? আসলে তো দরকার জ্ঞান, আসলে তো দরকার উপলব্ধি, আসলে তো দরকার দক্ষতা। আসলে তো দরকার বিবেক।

আপনার ছেলেমেয়েকে ফাঁস করা প্রশ্নের সন্ধান দিয়ে আপনি নিজের বিবেককে ধ্বংস করছেন, আপনার ছেলেমেয়ের বিবেককে ধ্বংস করছেন। আপনি গোল্ডেন এ প্লাস পেয়ে থাকলেও জগতের কিচ্ছু এসে যায় না। আপনার অন্তরের ভেতরে আপনি জানেন, আপনি কী।

রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষায় পাস করতেন না, আইনস্টাইন কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভালো ছাত্র বলে সুনাম অর্জন করেননি, টেন্ডুলকার বা সাকিব ক্লাসের ফার্স্টবয় নন, পরীক্ষার রেজাল্টের পেছনে ছোটা বন্ধ করুন, যদি আপনার সন্তানকে জীবনে সফল ও সুখী দেখতে চান।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৪।

“

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ ধরনের কেলেঙ্কারির পর কোনো সভ্য দেশের শিক্ষামন্ত্রী স্বপদে বহাল থাকতেন কিনা সন্দেহ। নিশ্চয়ই তিনি ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার করে পদত্যাগ করতেন। কিন্তু সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীর জন্য এটা কোনো বিষয়ই নয়। তিনি বহাল তবিয়তে তার পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং একই বাগাড়ম্বর আওড়াতে থাকেন গণমাধ্যমের সামনে। অপরদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসও চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে।

”

অবিরাম প্রশ্নপত্র ফাঁস

মানুষরূপী দানব তৈরির সুদূরপ্রসারী মেগা প্রজেক্ট!

আখতার বাবুল

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে একটি অতি পরিচিত দৃশ্য হলো পরীক্ষা শুরুর আগের রাতে ফেসবুকে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরের দিন পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে মিলিয়ে দেখা গেল মূল প্রশ্নের সাথে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের প্রায় শতভাগ মিল। যারা আরেকটু স্মার্ট তারা ফেসবুকের পাশাপাশি হোয়াটস অ্যাপ ও ভাইবারসহ আরো নানা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পেয়ে থাকেন। আর শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের কর্তাব্যক্তিদের গতানুগতিক প্রতিক্রিয়া হলো- দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না, এরপর আর প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মধ্যে দু'চারজন চুনোপুঁটিকে আটক করে বাগাড়ম্বর সংবাদ সম্মেলন করার দৃশ্যও হরহামেশা চোখে পড়ে। কিন্তু পরিস্থিতি একই রয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

এবার একটা সহজ সমীকরণ মেলাতে চাই। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে বর্তমান সরকার ও তার শিক্ষামন্ত্রী যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন তাতে ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী মূল্যবোধের কোনো স্থান দেয়া হয়নি। কিন্তু পাঁঠাবলি থেকে শুরু করে হিন্দুত্ববাদের অসংখ্য উপাদান পরতে পরতে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। এর মানে হলো একটি কোমলমতি শিশু তার শিক্ষাজীবন শুরু করে পর্যায়ক্রমে যখন মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকে পা রাখবে তখন সে আপাদমস্তক একজন নাস্তিক কিংবা

কিছুটা হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে আস্তিক হিসেবে গড়ে উঠবে। অবশ্য ধর্মীয় মূল্যবোধকে সুদীর্ঘকাল ধরে লালন করে তিল তিল গড়ে ওঠা এদেশের পরিবার ও সমাজব্যবস্থা এক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করবে। তবে, এই পরিবার ও সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে স্টার জলসা ও স্টার প্লাসের মতো ভারতীয় চ্যানেল এবং হাজারো নাইট শো সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

অপরদিকে, একটি শিশু ও তরুণ যখন সততা, দেশপ্রেম ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার কথা ঠিক তখনই সেই শিশু-কিশোরটি ফেসবুক খুলে বসে থাকে পরের দিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাবার আশায়। পেয়েও যাচ্ছে অনায়াসে। আর এজন্য বাবা-মাকে দেদার পয়সাও খরচ করতে দেখছে সেই শিশু-কিশোরটি। আর যেই তরুণ-তরুণীটি এভাবে প্রশ্নপত্র জোগাড় করতে পারেনি, সে যখন দেখছে যে পরীক্ষার আগের রাতে যারা প্রশ্নপত্র পেয়েছে, তাদের পরীক্ষা তার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে, তখন ওই কোমলমতি শিক্ষার্থীর মনটা যে কতটা বিষিয়ে যায় তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাস্তবতা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? একদিকে শিশুকাল থেকে শিখছে নাস্তিক্যবাদ যাতে পরকাল ও মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কোনো বালাই নেই এবং যেখানে শেখানো হচ্ছে যে এই দুনিয়াই সব। সফলতা কিংবা ব্যর্থতা যা কিছু তা সব এই দুনিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অপরদিকে, পর্যায়ক্রমে শিশুটি যতই বড় হচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছে যে কঠোর পরিশ্রম বা নিয়মিত অধ্যয়নের কোনো মূল্য নেই; এবং আগের রাতে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করার মধ্যেই বেশি লাভ। এভাবে, গত প্রায় এক দশক ধরে যে কয়েকটি প্রজন্ম ক্রমেই বেড়ে উঠছে তারা কতটা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে? এরা বড় হয়ে যদি এক একজন সুবিধাভোগী, ঘুষখোর ও ধর্মহীন দানবে পরিণত হয় সেটা কি অবাক হবার মতো ঘটনা হবে? এ অবস্থা আরো কিছুকাল চললে খুব শিগগিরই দেশ ভরে যাবে মেধাশূন্য মানব দানবে যাদের কাছ থেকে দেশ, জাতি ও ধর্ম বলে কিছু থাকবে না। এরা শুধু নিজের ভোগবিলাস ও স্বার্থ সিদ্ধি করতে গিয়ে দেশটাকে রীতিমতো নরকে পরিণত করবে বলে অনেকেরই আশঙ্কা।

এদিকে, পরিস্থিতি এখন এতটাই নাজুক যে শুধুমাত্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী স্বপ্নের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হচ্ছে অহরহ। অর্থের লোভে অসাধু সিন্ডিকেট চক্র, শিক্ষক ও কোচিং সেন্টার এই অপতৎপরতার সাথে সংশিষ্ট এবং শিগগিরই তাদের দমন করা হবে- এ ধরনের সস্তা বুলি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ হয়তোবা আওড়াতে পারেন। এ ছাড়া আর কিইবা বলবেন তিনি? কিন্তু আমি অন্তত এমন সরল সমীকরণে বিশ্বাস করি না এবং দেশের সচেতন জনগণও বিশ্বাস করে না বললেই আমার ধারণা। আমি মনে করি, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত রয়েছে।

পৃথিবীজুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের একটি অতিপ্রিয় পলিসি বা নীতিমালা হলো- যদি কোন

জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে সবার আগে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দাও। এবার একটু হিসাব মেলাই- নব্বইভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এই ভূখণ্ডটি তার নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক তা একেবারেই কাম্য নয় এমন কেউ কি আছে? আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। একটি উদার, মুসলিম ও সহনশীল জাতি হিসেবে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাক তা কখনোই যেই প্রতিবেশী মেনে নিতে পারেনি তা সবাই খুব ভালো করে জানেন। তাই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে এদেশের নাস্তিক্যবাদী শক্তির প্রতি সব ধরনের মদদ ওই প্রতিবেশীর কাছ থেকে আসছে বলেই এদেশের বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস।

তবে, নিজেদের ব্যর্থতার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপানো এক ধরনের কাপুরুষতা বৈ আর কিছু নয়। তাই প্রতিবেশী দেশ কিংবা বহিঃশক্তিকে দোষ দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর মতো হীনমন্যতায় ভুগতে চাই না। শুধুমাত্র ঘটনার গভীরে যাবার স্বার্থে আসল কারণগুলো খতিয়ে দেখতে গিয়েই আমাকে এই কথাগুলো বলতে হলো। কারণ এটাই হলো আজকের বাস্তবতা, আজকের বাংলাদেশ। ক্ষমতার মসনদে বসে আজকে যাদের শক্তিধর প্রতিবেশীর সামনে হাত কচলাতে কচলাতে হাতের রেখা মুছে ফেলার উপক্রম হয়েছে তাদের কাছে আমি সবিনয়ে জানতে চাই- আপনারা কি জানেন যাদেরকে আপনারা অকৃত্রিম বন্ধু বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলছেন তাদের অলঙ্ঘনীয় বিদেশনীতি (Foreign Policz) হলো- সব প্রতিবেশীই আমার শত্রু, কেউ আমার বন্ধু নয়।

এবার কয়েকটি অসঙ্গতির প্রতি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শিক্ষামন্ত্রী যা বলছেন আর বাস্তবে যা হচ্ছে তার কিছু খতিয়ান দেখতে চাই। চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি ইংরেজি দৈনিক 'দি ডেইলি স্টার' এর শিরোনাম ছিল 'Allegation of SSC question paper leak, again' অর্থাৎ 'মাধ্যমিকে আবারো প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ'। প্রতিবেদনের খানিকটা তুলে ধরছি:

'Allegations of question paper leakage in the ongoing SSC examinations surfaced again despite education minister's insistence that there was no possibilitz of question leakage this time. Students and guardians said sample questions, similar to those of the Bangla second paper under the Dhaka Board held on Sundaz, were also found before the English first paper examination zesterdaz. Some guardians in Dhaka alleged thez found sample questions on different Facebook pages the night before the exams, which were circulated through different online voice and messaging services like WhatsApp and Viber.'

অর্থাৎ 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আবারো কালিমালিপ্ত হলো চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষা যদিও শিক্ষামন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছিলেন যে এবারের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো সম্ভাবনা

নেই। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জানান, গত রোববার (৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) ঢাকা বোর্ডের অধীনে যে বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। গতকাল (৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) ইংরেজি প্রথমপত্র পরীক্ষার আগে এটা নজরে আসে। ঢাকার কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেন, পরীক্ষাগুলোর আগের রাতে কয়েকটি ফেসবুক পেজে তারা প্রশ্নপত্র (sample questions) পান। হোয়াটস অ্যাপ ও ভাইবারসহ বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ব্যাপারে আগেই প্রচারণা চালানো হয়েছিল।'

সরকার এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ কেন নিচ্ছে না সে ব্যাপারে অভিভাবকদের ক্ষোভের বিষয়টিও উঠে আসে ডেইলি স্টারের প্রতিবেদনে। শিক্ষার্থীদের বরাত দিয়ে ডেইলি স্টার আরো জানায়, বাংলা দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সাথে আগের রাতে পাওয়া প্রশ্নপত্র মিলিয়ে দেখা যায় অনেক কিছু মিলে যাচ্ছে। রচনা ও প্যাসেজসহ কী কী হুবহু মিলেছে তারও বিস্তারিত তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে।

কিন্তু মজার বিষয় হলো গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহাবুবুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ তারা পাননি। এমনকি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি আরো একধাপ এগিয়ে বলেন, সোমবার মধ্যরাতে (৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭) ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা মূল প্রশ্নপত্রের সাথে ফেসবুকের প্রশ্ন মিলিয়ে দেখেছেন। কোন প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি জাল প্রশ্নপত্রের পেছনে না ঘোরার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবানও জানান।

শিক্ষামন্ত্রীর এমন বাগাড়ম্বরের পর এক সপ্তাহ পেরুতে পারেনি এরই মধ্যে চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত ৬ জনকে আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তারা সবাই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এ ঘটনায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতোই ফাঁস হয়ে যায় শিক্ষামন্ত্রীর মিথ্যাচার। ডেইলি স্টারের ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এর সংবাদ শিরোনাম ছিল '6 held over SSC question paper leak' অর্থাৎ 'মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায়ে ৬ জন আটক'। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি) পুলিশের সংবাদ সম্মেলনের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, চলমান মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে ৬ জনকে নানা উপকরণসহ আটক করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, 'The arrestees were admins of various Facebook groups such as All Board Examinee, SSC Question 2017 Dhaka Board and SSC Question 2017 Barisal Board, the police official said. Thez distributed fake question papers via messenger group on Facebook using fake IDs and on messaging site Whatsapp. Each question paper was sold between Tk. 500 to Tk. 25,000 .'

অর্থাৎ 'পুলিশ কর্মকর্তারা বলেন, আটককৃতরা বিভিন্ন ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন বা নিয়ন্ত্রক। All Board Examinee (সব বোর্ডের শিক্ষার্থী), SSC Question 2017 Dhaka Board (এসএসসি প্রশ্ন ২০১৭ ঢাকা বোর্ড) এবং SSC Question 2017 Barisal Board (এসএসসি প্রশ্ন ২০১৭ বরিশাল বোর্ড), ইত্যাদি নামের ফেসবুকের অ্যাডমিন তারা। ভুয়া ফেসবুক আইডি ব্যবহার করে তারা এই পেজগুলো চালাতো এবং হোয়াটস অ্যাপে ছড়িয়ে দিত। প্রতিটি প্রশ্নপত্র তারা ৫ শ' টাকা থেকে শুরু করে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করতো।'

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ ধরনের কেলেঙ্কারির পর কোনো সভ্য দেশের শিক্ষামন্ত্রী স্বপদে বহাল থাকতেন কিনা সন্দেহ। নিশ্চয়ই তিনি ব্যর্থতার দায়ভার স্বীকার করে পদত্যাগ করতেন। কিন্তু সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রীর জন্য এটা কোনো বিষয়ই নয়। তিনি বহাল তবিয়তে তার পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং একই বাগাড়ম্বর আওড়াতে থাকেন গণমাধ্যমের সামনে। অপরদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসও চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। সুদূরপ্রসারী এই চক্রের কাছে যেন অসহায় হয়ে পড়েন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

চলতি বছরের ৯ মার্চ 'প্রশ্নফাঁস উদ্বেগজনক, নিরসন হওয়া দরকার'- এই শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'অব্যাহত প্রশ্নফাঁসের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তা নিরসনের আহ্বান জানিয়েছেন দেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবী-সংস্কৃতিব্যক্তিত্ব ও নাগরিক। আজ বৃহস্পতিবার 'শিক্ষা ও শিশু রক্ষা আন্দোলন' নামে এক সংগঠন গণমাধ্যমে এ বিবৃতি পাঠিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হচ্ছে বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও প্রচারমাধ্যম থেকে তাঁরা জানতে পারছেন। চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষাতেও বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রশ্নফাঁস হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় এসেছে। এগুলোর বিষয়ে তদন্ত করে কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, তা জানা যায়নি।

তাঁরা সরকারের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন, এগুলোর সঠিকভাবে তদন্ত করা হোক। প্রশ্নফাঁস প্রমাণিত হলে পরীক্ষাগুলো পুনরায় গ্রহণ করা হোক। একই সঙ্গে প্রশ্নফাঁসের মতো অসৎ প্রক্রিয়ার সঙ্গে উচ্চ থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত, যারাই জড়িত থাকুক, তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। তা না হলে এটা শিক্ষাঙ্গনে ভয়াবহ দুর্যোগ ডেকে আনবে। জাতির এই ক্ষতি কখনো কাটিয়ে ওঠা যাবে না।'

কিন্তু শত বিবৃতি ও উদ্বেগে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে প্রশ্নপত্র ফাঁস। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না এই দুষ্ট ক্ষত থেকে। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি উল্লেখ করতে চাই। 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্নফাঁস : এফ ইউনিটের ভর্তি বাতিল, আবার পরীক্ষা'–এই শিরোনামে গত ৬ মার্চ দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের

খানিকটা হলো: 'কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার এফ ইউনিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের সত্যতা পাওয়ায় ওই ইউনিটের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। নতুন করে ওই ইউনিটের পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তা ছাড়া এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে সাময়িক বহিষ্কার, দু'জন শিক্ষককে পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ও স্নাতকোত্তর বিভাগের এক শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব এবং স্নাতক শ্রেণীর সনদ বাতিল করা হয়েছে।'

বাংলাদেশের ইতিহাসে শিক্ষাক্ষেত্রে কখনোই যা ঘটেনি তাও ঘটেছে আওয়ামী লীগের শাসনামলে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে সব শিক্ষার্থীর স্বপ্নের বিসিএস (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পর্যন্ত ফাঁস হয়েছে। এমনকি ৩৩তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পর্যন্ত বাতিল করতে হয়েছিল। '৩৩তম লিখিত পরীক্ষা হঠাৎ স্থগিত : বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস?'- এই শিরোনামে ২০১২ সালের ৭ অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের খানিকটা হলো: 'আকস্মিকভাবে স্থগিত করা হয়েছে ৩৩তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে বলে কয়েক দিন ধরে আলোচনা চলছিল। তবে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) থেকে বলা হয়েছিল, 'গুজবে কান দেবেন না'। কিন্তু গতকাল শনিবার শেষ পর্যন্ত পিএসসি গুজবে কান দিয়েছে। আজ রোববার থেকে এই লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল।'

পরবর্তীতে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত অনেককে আটকও করা হয়। যাই হোক, লেখা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। 'আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন' শিক্ষামন্ত্রীর সবশেষ অনুভূতির কথা একটু তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেছেন, 'আমরা এমন একটি পরিবেশের মধ্যে আছি যা আমরা সব খুলে বলতেও পারি না, সহ্যও করতে পারি না। কিন্তু আমরা আর সহ্য করব না। সত্যিকার অর্থে আমাদের মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক বেশি দরকার।' 'প্রশ্নপত্র ফাঁসে ৭ শিক্ষকসহ ১৯ জনের নাম এসেছে'- এই শিরোনামে গত ১১ মার্চ ২০১৭ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে শিক্ষামন্ত্রীর এমন বক্তব্য তুলে ধরা হয়।

সত্যি কথা বলতে কখনো শিক্ষকের দোষ, কখনো অভিভাবকের দোষ, আবার কখনোবা শিক্ষার্থীদের দোষ দিয়ে কিংবা লোক দেখানো আক্ষেপের মধ্যেই যে শিক্ষামন্ত্রীর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ তা সবার কাছেই পরিষ্কার। কারণ আসল ক্ষত যে অন্যখানে। সেখানে মলম না লাগালে কাজের কাজ কিছুই হবে না। কিন্তু একতরফা নির্বাচন ও ভারতের একচেটিয়া সমর্থন নিয়ে স্বৈরাচারী কায়দায় ক্ষমতায় টিকে থাকা এই সরকারের পক্ষে সেই আসল ক্ষত সারিয়ে তোলা কখনোই সম্ভব হবে না।

একটু ভেবে দেখুন, আমরা যে বয়সে 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ', 'একতাই বল', 'কে ওই শোনালো মোরে আজানের ধ্বনি', 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'- এমন শত শত নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের কথা শুনে মুগ্ধ হতাম, শিক্ষকের মর্যাদার ওপর চমৎকার কবিতা ও গল্প

শুনতাম, সেই বয়সের এখনকার সন্তানেরা সারাদিন ফেসবুক নিয়ে বসে থাকে ফেসবুক বিশেষজ্ঞ হওয়ার আসায় যাতে পরীক্ষার আগের রাতে কোনমতেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আর টিভির পর্দায় আমরা যখন টিপু সুলতান ও সিন্দাবাদের মতো কাহিনী দেখতাম, এখন সেখানে পরকীয়া ও পারিবারিক কলহনির্ভর ধারাবাহিক নাটকে পূর্ণ স্টার জলসা দেখছি। সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, পিস টিভি, ইসলামিক টিভি ও দিগন্তের মতো দর্শকনন্দিত টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর। এখন যা করণীয় বলে আমার বিশ্বাস তা হলো- প্রত্যেক পরিবারকে এক একটি সুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে, গড়ে তুলতে হবে পারিবারিক পাঠাগার ও গবেষণাগার, পাড়া ও মহল্লায় মহল্লায় গড়ে তুলতে হবে গণ পাঠাগার যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের জ্ঞানসমৃদ্ধ বই থাকতে হবে। শাহজালাল, শাহমাগদুগ ও শাহপরাণের এই বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিতে হবে, আসল শত্রু-মিত্র চিনতে ভুল করা যাবে না।

লেখক : সাংবাদিক

এপ্রিল, ২০১৭

“
প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে গেলো কয়েক বছরে এমন কোনও পরীক্ষা নেই যেখানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি! অথচ আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কী ভয়ানক নির্বিকার! একটা ত্রুটিমুক্ত ও ভালো পরীক্ষার আয়োজন যদি করা না যায়, তাহলে মন্ত্রী হিসেবে এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে?
”

প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে ‘খোঁচাখুঁচি’ করার কিছু নেই?

চিররঞ্জন সরকার

এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বিষয়ে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি গণভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘এ প্রশ্নপত্র ফাঁস নতুন বিষয় নয়, যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। কখনও প্রচার হয়, কখনও হয় না। এটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করার কিছুই নেই।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘মন্ত্রী-সচিব গিয়ে তো প্রশ্ন ফাঁস করেননি। তাদের কেন সরে যেতে হবে, যারা করেছে, তাদের ধরিয়ে দিন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো। আপনাদের তো সেখানে অনেক সোর্স আছে।’

এসব কথা বলে প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গুরুতর বিষয়টিকে একেবারে তরল বানিয়ে দিলেন! এরপর প্রশ্নপত্র ফাঁস ব্যাপারটি যদি ‘প্রাতিষ্ঠানিক’ হয়ে দাঁড়ায়, এ ব্যাপারে কেউ কিছু না বলে, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না! অথচ আমরা আশা করেছিলাম, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো একটি জাতীয় গুরুতর ঘটনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের কঠোর সংকল্পের কথা বলবেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রতিরোধে সরকারের অঙ্গীকারের কথা বলবেন, দোষীদের শাস্তি ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ব্যক্তিদের সরে যাওয়ার কথা বলবেন। এই সমস্যা সমাধানের কথা বলবেন। আর নিতান্তই যদি সমস্যার সমাধান বাতলাতে না পারেন, তাহলে অন্তত দুঃখ প্রকাশ করবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমাদের অবাক করে দিয়ে বলেছেন, ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস নতুন কিছু নয়। যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছে।’ তার মানে দাঁড়াচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস অবৈধ নয়; যেহেতু যুগ যুগ ধরে তা চলে আসছে, কাজেই ‘ঐতিহ্যগত’ভাবেই তা স্বাভাবিক ব্যাপার! প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ-পর্যায় থেকেই আসলে

প্রশ্নপত্র ফাঁসকে বৈধতা দিয়ে দেওয়া হলো! শুধু তাই নয়, এর মধ্য দিয়ে দায় এড়ানোর একটা চেষ্টাও রয়েছে!

আমরা ছোটকাল থেকে পরীক্ষায় নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা শুনে এসেছি। পরীক্ষায় নকল হয়, উত্তরপত্র লিখে দেওয়া হয় এমন সব অভিযোগের কথা আমরা অতীতে শুনেছি, দেখেছি। কিন্তু পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় এটা গত এক দশকের উদ্ভাবন! অন্য সময়ের কথা বাদই দেওয়া যাক, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেই সময়ও তো এসএস□সি, এইচএস□সি কিংবা অন্য কোনও পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা আমরা শুনি□নি। তাহলে কি ওই সময়েও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে? আর তাই য□দি হয়, তাহলে তিনি সেটা বন্ধ করার উদ্যোগ নেননি কেন? যুগ যুগ ধরে চলা অনিয়ম বন্ধ করা কি প্রধানমন্ত্রীর কাজ নয়?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেছেন, 'এটা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করার কিছুই নেই। মন্ত্রী আর সচিব গিয়ে তো প্রশ্ন ফাঁস করেননি, তাদের কেন সরে যেতে হবে?'

সত্যিই কি তাই? বিষয়টি নিয়ে খোঁচাখুঁচি করার কিছু নেই? প্রধানমন্ত্রীর কাছে সবিনয়ে জানতে চাই, মন্ত্রীর কাজটা তাহলে কী? উন্নত দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলে সংশিষ্ট মন্ত্রীরা কেন পদত্যাগ করেন? তারা তো গাড়ি চালান না! আর বাংলাদেশ ব্যাংকের গর্ভনর আতিউর রহমানই বা কেন পদত্যাগ করেছিলেন? তিনি তো রিজার্ভ চুরি করেননি? শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিবের যদি দায় না থাকে, তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় কার? শিক্ষার্থীদের? অভিভাবকদের? নাকি এ দেশের হতভাগ্য নাগরিকদের?

দেশের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় যাদের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়, সেই মন্ত্রী-সচিবদের যদি কোনও দায়-দায়িত্ব না থাকে, তাহলে দায়টা আসলে কার?

প্রধানমন্ত্রী গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরিয়ে দিন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো।' প্রশ্ন হলো প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরিয়ে দেওয়া কি গণমাধ্যমকর্মীদের কাজ? গণমাধ্যম কর্মীরা কি সরকার, প্রশাসন, মন্ত্রণালয় কিংবা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য? চোর ধরার দায়িত্ব কি তাদের?

মাত্র তিন মাস আগে (২৪ নভেম্বর ২০১৭) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ভুলের দায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী। কেবল দুঃখ প্রকাশই নয়, এ ভুলের দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন পরীক্ষা বোর্ড প্রধান কিম সাং-হুন। সাং-হুনের পদত্যাগের সিদ্ধান্তের আগে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী হাওয়াং উ-ইয়ে বলেন, 'আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি এবং প্রশ্নপত্র তৈরি প্রক্রিয়া আরও উন্নত করতে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ দরকার বলে স্বীকার করছি। কিন্তু আমাদের দেশে ঘটনার দায় স্বীকার, ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করার নজির নেই।'

এটা আমাদের চরম দুর্ভাগ্য! শিক্ষাক্ষেত্রে ক্যানসারের মতোই একটি মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস। তথ্য-প্রমাণসহ গণমাধ্যমে এই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা প্রকাশিত হলেও সংশ্লিষ্ট

কর্তাব্যক্তিরা তা অস্বীকার করার মহান ব্রত নিয়েছেন! বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা, পিএসসি থেকে শুরু করে মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়, বাদ যায় না ব্যাংক বা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষাগুলোও। প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নিন্দার ঝড় ওঠে, শিক্ষামন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে ট্রলের বন্যা বয়ে যায়। শিক্ষার্থী, তাদের বাবা-মা, সাধারণ মানুষ সবাই প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করলেও অন্ধকারে থেকে যান কেবল শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টরা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বাড়ির পাশের পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে বসে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্রের সমাধান খুঁজতে দেখে যখন হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে টেলিভিশনের সামনে বসি, তখন নিউজ স্ক্রলে দেখতে পাই, 'প্রশ্ন ফাঁসের কোনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি, পরীক্ষা সুষ্ঠু হয়েছে-শিক্ষামন্ত্রী।' পরের লাইনটা হতাশা আরও কয়েকগুণ বেড়িয়ে যায়, 'প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে!'

আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর উদার চোখে প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও প্রমাণ পান না। তাই কারও বিরুদ্ধে 'উপযুক্ত ব্যবস্থা'ও আর নেওয়া হয়ে ওঠে না! আমাদের দেশে মন্ত্রী-সচিব থেকে শুরু করে চৌকিদার-দফাদার, সরকারি দলের নেতা, বিরোধী দলীয় নেতা কেউই পদত্যাগের মতো চরম ত্যাগটি স্বীকার করতে চান না। আর এই না চাওয়াটাই আমাদের রাজনীতির একটা মস্ত গলদ। এই গলদ সরানোর গুরুত্বটাই কেউ অনুধাবন করেন না। অনেকেই বলেন, পদত্যাগ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। হ্যাঁ, পদত্যাগে সমস্যার সমাধান হবে না ঠিক কিন্তু সমাধানের পথ খুলে যাবে। কারণ পদত্যাগ মানেই হচ্ছে, ব্যর্থতার দায় স্বীকার করা। আর যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন যে, কাজটি ভুল হয়েছে, ততক্ষণ আপনি ভুল শোধরাবেন কী করে? ভুল শুধরে উন্নয়নের দিকে ধাবিত হতে হলে প্রথমেই ভুল স্বীকার করতে হবে। আপনি যদি ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যর্থতার দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে। তা না হলে সেটা হবে চরম নৈরাজ্যেরই বহিঃপ্রকাশ!

দেশের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবেন, এমন বেশিরভাগ অভিভাবকই বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ। এর অনেক কারণ আছে। সবচেয়ে বড় কারণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা স্বীকার না করা ও ঠেকাতে না পারা। অনেকেরই অভিযোগ, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে দেশের শিক্ষার গলায় ফাঁস পরিয়ে গোটা জাতিকে অথর্ব বানানোর চক্রান্ত চলছে। যারা লেখাপড়া করে শিক্ষা অর্জন করতে চায় তেমন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বর্তমানে ভয়ানক হতাশ।

একজন পরীক্ষার্থীর বক্তব্য, 'অনেক খেটেখুটে যে পরীক্ষা দিয়েছি, নিয়মমতো পড়াশোনা করেছি, এখন আমি যদি 'এ' পাই এবং একজন পরীক্ষার্থী ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে 'এ প্লাস' পায়, তাহলে আমি পড়াশোনায় উৎসাহ পাব কীভাবে? ছোটবেলা থেকে যে শুনে এসেছি, সৎ পথে থেকো, সৎ কাজে সিদ্ধি লাভ হয়, এ বিষয়টাই তো ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। এসব কথার জবাব কে দেবে?'

ছোট ছোট শিশুদের হাতে ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্ন ধরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা দিতে পাঠানো হচ্ছে, সেই ছোট ছোট শিশুদের অন্যায় করতে শেখানো হচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও এ ধরনের

নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই। একটা দেশের মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙে দেওয়ার এর চেয়ে পরিপূর্ণ কোনও পদ্ধতি আছে কি? প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে গেলো কয়েক বছরে এমন কোনও পরীক্ষা নেই যেখানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি! অথচ আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কী ভয়ানক নির্বিকার! একটা ত্রুটিমুক্ত ও ভালো পরীক্ষার আয়োজন যদি করা না যায়, তাহলে মন্ত্রী হিসেবে এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে? এরপরও পদে থাকার নৈতিক সমর্থন মেলে কী?

পাঠদান-পদ্ধতি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী কোনও কার্যকর পদ্ধতির উদ্ভাবন চোখে পড়ছে না। শিক্ষাব্যবস্থা জ্ঞানমুখী না হয়ে ক্রমেই সনদমুখী হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞানচিন্তা, দর্শনচিন্তা, সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে চিন্তাভাবনা একটা নির্দিষ্ট মাত্রাতেই আটকে আছে। উল্টো যেন অন্ধকারকেই শিক্ষার মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কী বলবেন? প্রধানমন্ত্রীই বা কী বলবেন? এসব নিয়ে কথা বলাটা কি নিছকই ‘ ‘খোঁচাখুঁচি’? সত্যিই কি এসব নিয়ে ‘খোঁচাখুঁচি’ করার কিছুই নেই?

লেখক: কলামিস্ট

বাংলাট্রিবিউন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০১৮

> বাংলাদেশে এখন উন্নতমানের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক দুর্ধর্ষ খুনের মামলার অপরাধীকেও ধরা সম্ভব হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে কোনো নাম-নিশানা বা বিন্দুমাত্র 'ক্লু' রেখে যায় না অপরাধী, সেখানেও পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অপরাধীকে পাকড়াও করছে, রহস্যের কূল-কিনারা করছে। (আবার সাগর-রুনি, তনু-মিতু-তৃকী হত্যার মত আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল মামলার কূল-কিনারা না হওয়াটাও রহস্যজনক। এতে জনমনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে তদন্তকারী সংস্থাগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে, সংশ্লিষ্ট সব মহল সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ালে, এই অসাধু চক্রটিকে ধরা অসম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি।

প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতির গলায় ফাঁস

মোফাজ্জল করিম

আমাদের ছেলে বেলায় সে আজ ৬০/৬৫ বছর আগের কথা স্কুলে একটা মজার বিতর্ক প্রতিযোগিতা হতো। বিষয় : বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ। এ নিয়ে কখনো-সখনো পরীক্ষায় রচনাও লিখতে হতো। আজ এত যুগ পরে এটা আর বিতর্কের বিষয় নয়। বিজ্ঞান যে আমাদের জীবনে বিরাট আশীর্বাদ, তা তর্ক করে প্রমাণ করতে হয় না।

কিন্তু অবিমিশ্র সুখ বলে যেমন কিছু নেই, তেমনি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন নির্ভেজাল আশীর্বাদও কেবল কল্পনায়ই বিরাজ করে। এর একটু-আধটু ক্ষতিকর দিক যে থাকবে না, সেই গ্যারান্টি বোধ হয় কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল পেতে পেতে মানবসভ্যতা এখন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এর নানাবিধ কুফলও হরহামেশাই ভোগ করছে মানুষ। পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ ঘটিয়ে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী ও আবিষ্কার। এসব আবিষ্কারের ফলে জীবন আগের চেয়ে অনেক সহজ, সুন্দর ও গতিময় হয়েছে ও হচ্ছে সন্দেহ নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে এসবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে খেসারতও দিতে হচ্ছে বিশাল রকমের।

দুই.

সম্প্রতি এমনই একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। পৃথিবীর সব দেশই এখন কমবেশি উন্নতি লাভ করেছে আইসিটি বা ইনফরমেশন কম্যুনিকেশন টেকনোলজিতে। এর কল্যাণে সারা বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বাংলাদেশের অজপাড়া-গাঁর অশিক্ষিত পল্লীবধূও আজ মুহূর্তে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে প্রিয়জনের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারছেন। এটা এমন এক প্রযুক্তি, যা শিখতে খুব একটা বিদ্বান হতে হয় না।

আর সেই সুযোগটা নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু মানুষ মেতে উঠেছে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের মরণখেলায়। যে প্রযুক্তি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম উন্নয়নের সব ক্ষেত্রে, সেটাই এদের হাতে পড়ে হয়ে গেছে একটি মারণাস্ত্র। এরা এর অপপ্রয়োগ করে ধ্বংস করছে দেশের পরীক্ষাব্যবস্থা। এখন পত্রপত্রিকা খুললেই দেখা যায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ভয়াবহ সব ঘটনা। আর তা শুধু পাবলিক পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষা বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাই নয়, এখন তার ডালপালা বিস্তৃত হতে হতে প্রাইমারি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার মত অতি সাধারণ পরীক্ষা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। পত্রিকায় পড়লাম, বরগুনা জেলার বরগুনা সদর ও বেতাগী উপজেলায় এমন কাণ্ড ঘটেছে। আর রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় প্রাইমারি পরীক্ষাকেন্দ্রের বিকেলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সকালেই পৌঁছে যায় পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের হাতে। নাটোরেও ঘটেছে অনুরূপ ঘটনা। ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর সংশিষ্ট এলাকার শত শত স্কুলের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে। ভাবা যায়, পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হলে এরূপ হতে পারে। এখন পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি মানে আদাজল খেয়ে দিনরাত পড়াশোনা নয়, প্রস্তুতি এখন ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া। আর সেই ইঁদুর দৌড়ে পরীক্ষার্থী ও তার অভিভাবক উভয়েই শরিক হচ্ছেন। এভাবে লেখাপড়া শিকেয় উঠছে, আর কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ না করেই দুর্নীতি-জালিয়াতির মাধ্যমে রেজাল্ট ভাল করার ধুম পড়ে যাচ্ছে।

পরীক্ষায় দুর্নীতি কমবেশি সব কালেই ছিল। তবে আগে ছিল তা বই দেখে লেখা, বইয়ের কাটা পাতা দেখে লেখা, ছোট কাগজের টুকরোয় লিখে নিয়ে আসা উত্তর কপি করা কিংবা অন্য কোনো সহপরীক্ষার্থীর খাতা দেখে লেখা। তখন নকলের জগতে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দও প্রচলিত ছিল। যেমন : যে ছোট্ট চিরকুটে অতি ক্ষুদ্র মিহিদানা অক্ষরে যত্ন সহকারে উত্তর লিখে আনা হতো, তার একটা বহুল প্রচলিত নাম ছিল 'চোথা'। আবার অন্যের উত্তরপত্র, বই বা বইয়ের ছেঁড়া অংশ দেখে লেখার কাজকে বলা হতো 'টুকলিফাই'। ব্যাপক হারে পরীক্ষার হলে নকল করাকে বলা হতো 'গণটোকাটুকি'। এখন প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে পুরনো সব পদ্ধতি বাসি হয়ে গেছে। এখন মুঠোফোন একাই এক শ। প্রশ্নপত্রের ছবি তোলা, ফোনে উত্তর বলে দেওয়া, অথবা মেসেজ আকারে তা জানিয়ে দেওয়া ইত্যাদি তাবৎ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম মুঠোফোন নামক এই বিস্ময়যন্ত্র। আর এই যন্ত্রটি বা অস্ত্রটির পেছনের 'ম্যান বিহাইন্ড দ্য গান'-রা হচ্ছে আসল

বীরপুরুষ। তারা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত দুর্লভ একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশে, যার ফলে সারা বছর, এমনকি পরীক্ষার আগের রাত্রেও, বইয়ের ধারে-কাছে না গিয়ে পরীক্ষায় ফাটাফাটি রেজাল্ট করছে শিক্ষার্থীরা।

'পরীক্ষার আগের রাত্রে' কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আগে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা বা মাধ্যমিক পর্যায়ের শেষ পরীক্ষায় (ম্যাট্রিক) কখনো কখনো একটা রচনা লিখতে দেওয়া হতো। এর শিরোনাম ছিল : পরীক্ষার পূর্বরাত্রি। একজন পরীক্ষার্থীর জন্য সেই রাত্রিটি যে কী বিভীষিকাময় ছিল, তারই বর্ণনা থাকত ওই রচনায়। এটা মুখস্থ করছে, ওটাতে চোখ বুলাচ্ছে, এই অঙ্কটা কষে দেখছে, তো ওই জ্যামিতির ছবি আঁকছে পরীক্ষার্থীটি নিমগ্ন সাধনায়। সমস্ত বাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই ঘুমে অচেতন, শুধু জেগে আছে পরীক্ষার্থী ছেলেটি বা মেয়েটি। আর জেগে আছেন তার স্নেহময়ী মা। তিনি ক্ষণে ক্ষণে পরীক্ষার্থী সন্তানকে তাড়া দিচ্ছেন শুতে যেতে। 'সারারাত জেগে থাকলে কাল পরীক্ষার হলে বসে লিখবে কী করে? যাও, এখন ঘুমিয়ে পড়ো- এভাবে তাড়া দিতেন, আর সন্তানের চাহিদামতো মাঝে মাঝে চা বানিয়ে দিতেন। কখনো এক গাস দুধ নিয়ে এসে পীড়াপীড়ি করতেন ওটা খেয়ে নিতে। আর এখন? এখন ছেলেটি বা মেয়েটি ব্যস্ত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র জোগাড়ে। সে রাত জেগে সারাক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুঠোফোনে। ফেসবুক-ইন্টারনেট ইত্যাদি ঘাঁটছে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে : কী রে, জানা গেল কিছু? কোচিং ক্লাসের কোনো কোনো শিক্ষককেও ফোনে ধাওয়া করছে সারারাত। তার বাবা-মাও যথাসাধ্য দৌড়ঝাঁপ করছেন প্রশ্নপত্র নামক সোনার হরিণ ধরতে। তারপর একসময় 'ইউরেকা' বলে চিৎকার দিয়ে উঠছে পরীক্ষার্থীটি। শাওয়াল মাসের চাঁদের মত উদয় হয়েছে প্রশ্নপত্র। কখনো তা শেষ মুহূর্তে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা-এক ঘণ্টা আগে। মূল্য কত? দশ-বিশ হাজার টাকা। ওটা কিছু না। পরীক্ষায় ভালো ফল করে 'মানুষ' হওয়াটাই বড় কথা! তারপর শুরু হলো দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি। স্যারদের কাছ থেকে অতি দ্রুত উত্তর জেনে নিয়ে সন্তর্পণে সেগুলোসহ পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ এবং উত্তরপত্রে প্রতিস্থাপন। সবখানে একটা দারুন 'টিম ওয়ার্ক' লক্ষণীয়। এতে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই হাতে হাত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় নিয়োজিত। সবার উদ্দেশ্যই মহৎ : ছেলে বা মেয়েটিকে ভাল ফল পাইয়ে দিয়ে দেশের একজন সুনাগরিক হতে সাহায্য করা!

মোটামুটি একই চিত্র এখন বাংলাদেশের অন্য সব পরীক্ষার বেলায়ও। তা সে বিসিএস পরীক্ষাই হোক আর কোনো সরকারি-আধা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে লোক নিয়োগের পরীক্ষাই হোক। মেধা যাচাইয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে এই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে। সেই সঙ্গে তদবির, দলবাজি, ঘুষ বাণিজ্য তো আছেই। তা হলে একজন সত্যিকারের যোগ্য প্রার্থী, যে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের পেছনে না ছুটে নিজের সব শক্তি, সব মেধা নিয়োজিত করল নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টায়, যে কোনো দল বা গোষ্ঠীর লেজুড়বৃত্তি করল না, যার কোনো মামা-চাচাও নেই, যোগ্যতা-দক্ষতা-মেধা থাকা সত্ত্বেও তার কী হবে? দিন শেষে একরাশ হতাশার অনলে পুড়ে অদৃষ্টকে দোষারোপ করা ছাড়া তার আর কীই বা করার আছে।

তিন.

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য কর্তৃপক্ষ কেবল শার্লক হোমস-কীরিটি রায়-স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড প্রভৃতির দ্বারস্থ হতে বাকি রেখেছেন। এ ছাড়া সমুদ্র মন্থন করতে কসুর করেননি। কখনো সন্দেহের অঙ্গলি ছাপাখানার মুনি-ঋষি (ভূত নয়), কখনো পরম পূজনীয় গুরুমহাশয়দের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেই সন্দেহের তালিকায় আমলা-কামলাদের নামও থাকছে। অতি উচ্চে মগডাল পর্যায়ে মিটিং-চিটিং হচ্ছে, কমিটি গঠিত হচ্ছে, দিস্তা দিস্তা রিপোর্ট জমা হচ্ছে, কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ছে না। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী, যিনি এক অর্থে দেশের শিক্ষকদের অভিভাবক, তিনি বলছেন শিক্ষকরা জড়িত, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বলছে কর্মকর্তারা করছেন এই অপকর্ম, আর শিক্ষার্থীরা তো আছেই। প্রশ্ন হলো, এতই যখন আপনারা নিশ্চিত, তাহলে অপরাধীচক্রটি ধরা পড়ছে না কেন? অপরাধ তদন্তে মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় : অপরাধীকে আমরা আয়নার ভেতর দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ধরতে পারছি না। তাই তো, আয়নায় যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়, তা যতই হুবহু হোক না কেন, তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সে রক্ত-মাংসের কায়া নয়, সে কায়াহীন ছায়া। তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁসে যারা জড়িত, তারাও কি তবে ছায়ামানব? নাকি কোনো অশুভ শক্তির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তারা থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে?

বাংলাদেশে এখন উন্নতমানের তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক দুর্ধর্ষ খুনের মামলার অপরাধীকেও ধরা সম্ভব হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে যেখানে কোনো নাম-নিশানা বা বিন্দুমাত্র 'ক্লু' রেখে যায় না অপরাধী, সেখানেও পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা বিভাগ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অপরাধীকে পাকড়াও করছে, রহস্যের কূল-কিনারা করছে। (আবার সাগর-রুনি, তনু-মিতু-ত্বকী হত্যার মত আপাতদৃষ্টিতে সহজ-সরল মামলার কূল-কিনারা না হওয়াটাও রহস্যজনক। এতে জনমনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়।) প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে তদন্তকারী সংস্থাগুলো আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করলে, সংশ্লিষ্ট সব মহল সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়ালে, এই অসাধু চক্রটিকে ধরা অসম্ভব নয় বলে আমরা মনে করি। পত্রিকান্তরে দেখলাম (২০.১২.১৭), সম্প্রতি এক অসাধু সহকারী কর কমিশনারকে সাঙ্গপাঙ্গসহ র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে। জেনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা আরো দৃঢ় হয়েছে। তবে এরা যেভাবে ত্বরিত জামিন পেয়ে যায়, তা দেখে বিস্মিত হই বই কি।

এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতা। আমার সন্তানকে যে করে হোক জিপিএ-৫ পেতে হবে কিংবা বিসিএস-এর চাকরি না পেলে জীবন বৃথা, এরূপ মানসিকতা পরিহার করতে হবে। ছেলে বা মেয়ে জিপিএ-৫ পেল কি পেল না সেটা বড় কথা নয়, সে সত্যিকারের মানুষ হলো কি না, যে জ্ঞানার্জনের জন্য তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল, তা কতটুকু অর্জিত হলো, সেটাই মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত। সন্তানের জন্য প্রশ্নপত্র জোগাড়ের ধান্দায় না থেকে ছেলেটি বা মেয়েটি লেখাপড়া করছে কি না, তার চারিত্রিক বিকাশ ঘটছে কি না, সে কুসংসর্গে পড়ে বিপথে পা বাড়াচ্ছে কি না, সেসব ব্যাপারে মা-বাবার সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিত। সন্তান প্রকৃত অর্থে মানুষ হলে সে হবে পরিবার ও

দেশের সম্পদ। আর প্রশ্নপত্র হস্তগত করে জিপিএ-৫ পেলে সে হবে পরিবার, দেশ ও সমাজের জন্য এক বড় দায়। এই উপলব্ধিটা থাকতে হবে সব অভিভাবকের।

চার.

সেই সঙ্গে 'আগে এসএসসি-তে পাসের হার ছিল শতকরা ৫০, আর দেশবাসী দেখুন, এখন পাসের হার শতকরা ৯০, এটা আমাদের বিরাট অর্জন- এ ধরনের মানসিকতা নিজের সঙ্গে নিজের প্রবঞ্চনার শামিল। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এসএসসি-এইচএসসি-তে জিপিএ-৫-এর ছড়াছড়ির পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় শতকরা ১০ জনও টেকে না, তার গলদ কোথায় তা চিহ্নিত করতে না পারলে, তা জাতির জন্য মহা দুর্যোগ ডেকে আনবে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে মহামারী শুরু হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে কোনো সমাপনী বা নির্বাচনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন থাকবে বলে মনে হয় না। হয়ত লটারির মাধ্যমে পাস-ফেল, জিপিএ-৫, এ প্লাস, এ মাইনাস, চাকরি-বাকরি ইত্যাদি সব কিছু নির্ধারিত হবে এবং আমরা হয়ে যাব একটি লটারিনির্ভর জাতি!

মাঝে মাঝে খবর বেরোয় ফাঁসকারী চক্রের লোকজন ধরা পড়েছে। যেমনটি ঘটেছে উপরোক্ত সরকারি কর্মকর্তার বেলায়। তারপর আর কিছু শোনা যায় না। এসব ক্ষেত্রে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। তবে বিষয়টির গভীরে যাওয়ার জন্য আরো বেশি করে কর্তৃপক্ষীয় উদ্যোগের প্রয়োজন। শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাইকে নিয়ে বৈঠক করে একটি সম্মিলিত প্রয়াস নিলে এবং সেই সঙ্গে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তৎপরতা আরো বাড়ালে সাফল্য আসতে বাধ্য।

মোট কথা, যেনতেন প্রকারেণ তথাকথিত ভালো ফল পাওয়া ঝুড়ি ঝুড়ি মাকাল ফল দেশের কোনো কাজে আসবে না, বরং দেশকে ডোবাবে এই বোধটা সবার ভেতর থাকা দরকার। আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারটা যে অচিরেই জাতির গলায় ফাঁস হয়ে আটকে গিয়ে জাতিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবে, এটা মেনে নিয়ে বিষয়টি এখনই সর্বোচ্চ গুরুত্বসহকারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। তা না হলে পরে পস্তাবারও সময় পাওয়া যাবে না।

লেখক : সাবেক সচিব, কবি

কালের কণ্ঠ, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৭

> যারা প্রশ্ন ফাঁস করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারছেন না। বিরোধী দলের কোনো নেতাকর্মী সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে কোনো স্ট্যাটাস দিলে তার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা হচ্ছে। টেলিফোনে কললিস্ট দেখে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'অসামান্য দক্ষতা' দেখাতে পারছে, কিন্তু প্রশ্নফাঁসকারীদের টিকিটি পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না।

প্রশ্নফাঁস : চলিতেছে সার্কাস

আলফাজ আনাম

'এ পরীক্ষা নিরাপদ রাখতে মানুষের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, এবার তাই করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস করলে কেউ রেহাই পাবে না। কী হবে আমি নিজেও বলতে পারি না। তবে চরম ব্যবস্থা নেয়া হবে।' – শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ

এসএসসি ও সমমানের ২০ লাখেরও বেশি শিক্ষার্থীর পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শেষ করে শিক্ষার্থীরা জানতে পারছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই অনেকের হাতে প্রশ্ন চলে গেছে। পরীক্ষার আগে এখন ফেসবুকের মেসেঞ্জার, ভাইবার ও ইমোতে প্রশ্ন 'ঘোরাফেরা' করে। মাত্র ৩০০ টাকা কিংবা ১৫০ টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন পাওয়া যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো প্রশ্ন বিক্রেতা প্রথম পরীক্ষার প্রশ্ন ফ্রি দিয়ে বলেছেন, টাকা দিলে পরের পরীক্ষার প্রশ্ন দেয়া হবে।

এভাবে প্রশ্নফাঁস যে এবার প্রথম হচ্ছে তা নয়। এসএসসি, এইচএসসি এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষার প্রশ্ন পর্যন্ত এর আগে ফাঁস হয়েছে। শুরুতে মন্ত্রীর যে কঠোর হুঁশিয়ারি আমরা তুলে ধরেছি, সেটি এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে তিনি দিয়েছিলেন। মন্ত্রীর বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচারের সাথে প্রশ্নফাঁস হওয়ার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি হুবহু তুলে ধরা হয়েছে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন। প্রশ্নফাঁসের এ খবর প্রথমে সরকারের কর্মকর্তারা অস্বীকার করেছেন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার ডয়েচে ভেলেকে বলেন, 'আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ বা নমুনা পাইনি। আমাদের পরীক্ষার্থীরা সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে পরীক্ষার হলে ঢুকে গেছে। তারাও কোনো প্রশ্নপত্র

দেখেনি। নিজেরাও অভিযোগ পাওয়ার পর অনুসন্ধান করে দেখেছি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো ঘটনা ঘটেনি।' কিন্তু এ অবস্থানের ওপর খোদ শিক্ষামন্ত্রী আর অনড় থাকতে পারেননি। কারণ, পরের পরীক্ষাগুলোর প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে।

এরপর মন্ত্রী প্রশ্নফাঁসের বিষয়টি অনেকটা কবুল করে জরুরি বৈঠকে বসে কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি পরীক্ষার আগে বলেছিলেন, প্রশ্ন ফাঁস হলে নতুন করে পরীক্ষা নেয়া হবে। পরবর্তী সময়ে জরুরি বৈঠক করে তিনি জানান, চলমান এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কি না, তা যাচাই-বাছাই করতে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সাথে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের ধরিয়ে দিতে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত কিংবা যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ায় তাদের ধরিয়ে দিতে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

এখানে উদ্বেগের বিষয় হলো, যারা গুজব ছড়াবে তাদের ধরিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্নফাঁসের খবর প্রকাশ কিংবা ফাঁস হওয়া প্রশ্ন প্রকাশ করার কারণে কাউকে আবার হেনস্তা হতে হয় কি না তা দেখার বিষয়। এমনকি ভবিষ্যৎ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩২ ধারাও তাদের ওপর প্রয়োগ করা হতে পারে। বলা হয়েছে, পুরো পরীক্ষার সময় এ কমিটি বিশেষ তদারকি করবে। একই সাথে প্রশ্নপত্র আদৌ ফাঁস হয়েছে কি না, এ কমিটি প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করে পরীক্ষা বাতিলের বিষয়ে সুপারিশ করবে।

শিক্ষামন্ত্রী আগে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন– 'পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হলে আবার পরীক্ষা নেয়া হবে', তা এখন এই কমিটির সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আবার কমিটি যদি রিপোর্ট দেয়– প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, তাহলে তো কোনো কথাই চলবে না; বরং প্রশ্নফাঁসের গুজব ছড়ানোর জন্য হয়তো গণমাধ্যমকেই উল্টো দায়ী করা হবে।

মন্ত্রী বলেছেন, এবার প্রশ্নফাঁস রোধে অনেক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আধা ঘণ্টা আগে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ডিজিটাল চোরেরা প্রশ্নফাঁসরোধী এসব অ্যানালগ ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে যথাসময়ে প্রশ্নপত্র নিয়ে ভার্চুয়াল জগতে হাজির হয়েছে।

মন্ত্রী-এমপিদের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। ঘুষ, দুর্নীতি বা অনিয়মের কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করা কিংবা দুর্নীতির কোনো তথ্যের ভিডিও ধারণকে গুপ্তচরবৃত্তির মতো অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে আইন প্রণয়নে সম্মতি দিয়েছেন মন্ত্রীরা। কিন্তু যারা প্রশ্ন ফাঁস করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারছেন না। বিরোধী দলের কোনো নেতাকর্মী সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে ফেসবুকে কোনো স্ট্যাটাস দিলে তার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা হচ্ছে। টেলিফোনে কললিস্ট দেখে রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'অসামান্য দক্ষতা' দেখাতে পারছে; কিন্তু প্রশ্নফাঁসকারীদের টিকিটি পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না।

দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অপরাধ দমনে, উগ্রপন্থীদের দমনে এত সাফল্য দেখাচ্ছে; অথচ প্রশ্নফাঁস করার সাথে একটি চক্রকে কেন ধরতে পারছে না তা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ হতে পারে, সর্ষের ভেতর ভূত রয়েছে। বছরের পর বছর পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হওয়ার দায় এককভাবে শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। যারা প্রশ্নফাঁসের সাথে জড়িত, তারা ক্ষমতা বলয়ের খুব কাছাকাছি যে অবস্থান করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন মন্ত্রী 'চরম ব্যবস্থা' নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, অথচ মাসখানেক আগে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'প্রশ্নফাঁস নতুন কিছু নয়। একষট্টি সালেও প্রশ্নফাঁস হতো।' প্রশ্নফাঁস যেন সার্কাসের মতো একটি মজার বিনোদনমূলক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ভয়াবহ পরিণতির দিকটি কোনোভাবেই বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না। প্রশ্নফাঁসের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎকেই অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যাবে। তারা মনে করবে– লেখাপড়া করে লাভ কী? পরীক্ষার আগেই তো প্রশ্ন পাওয়া যায়। তা দিয়ে পরীক্ষা দিলেই তো ভালো ফল মিলবে।' প্রতিটি পরীক্ষায় এভাবে প্রশ্নফাঁসের কারণে অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ ও হতাশা বাড়ছে।

আসলে প্রশ্নফাঁসের সাথে বড় ধরনের আর্থিক সংযোগ রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যারা প্রশ্নফাঁস করছে, তারা বলে দিচ্ছে প্রশ্ন পাওয়ার বিনিময়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকেরা কিভাবে টাকা পাঠাবেন। এই দুর্নীতির সাথে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়গুলোর একটি হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী নিজে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের এর আগে 'সহনীয়' মাত্রায় ঘুষ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছিলেন– শুধু কর্মকর্তারাই ঘুষ খান না, মন্ত্রীরাও দুর্নীতি করেন। মন্ত্রীরা চোর, আমিও চোর।

মন্ত্রী নিজে যেখানে ঘুষ-দুর্নীতি করার এমন স্বীকৃতি দিতে পারেন, সেই মন্ত্রণালয়ে প্রশ্নফাঁসের বিনিময়ে টাকা আদায় করা মামুলি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মাত্র কয়েক দিন আগে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ঘুষের টাকাসহ গ্রেফতার হয়েছেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘুষ, দুর্নীতি ও প্রশ্নফাঁসের মতো বড় ধরনের কেলেঙ্কারির পরও শিক্ষামন্ত্রীকে 'সফল ও ক্লিন' ইমেজের মন্ত্রী হিসেবে গণমাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে শীর্ষ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টতার কারণে গণমাধ্যমের বাম কর্মীরা তাকে একজন 'সফল ব্যক্তি' হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছেন। সরকারের আর কোনো মন্ত্রী তার মতো প্রচার পাননি। তার কথিত সাফল্যের গল্পের সাথে প্রশ্নফাঁস, ঘুষ আর চুরির কাহিনী শুনতে শুনতে মানুষ এখন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। দেশে যখন তার ইমেজ আর রক্ষা করা যাচ্ছে না, তখন ভারতের একটি সংস্থা তার মর্যাদা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত নভেম্বরে শিক্ষামন্ত্রীকে মুম্বাই ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড-২০১৭ প্রদান করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এ অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্ব

ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ব্যক্তিগত ক্যাটাগরিতে তিনি এই পুরস্কার পেলেন। ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেসের অ্যাওয়ার্ডস ও অ্যাকাডেমিক কমিটির চেয়ারম্যান শিক্ষামন্ত্রীকে পাঠানো পত্রে বলেছেন, 'শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার নেতৃত্ব ও অবদান সুপরিচিত। এ ক্ষেত্রে আপনি গুরুত্বপূর্ণ ও আইকনিক ব্যক্তি।' নুরুল ইসলাম নাহিদকে চিন্তাবিদ, কর্মী ও পরিবর্তনে বিশ্বাসী একজন রোলমডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। (প্রথম আলো, ১৯ জুলাই ২০১৭)।

বাংলাদেশে প্রশ্নফাঁস ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে সাফল্য দেখিয়েছে, তাতে দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে অধঃপতনের কারণে এ দেশের বহু শিক্ষার্থী এখন ভারতে লেখাপড়ার জন্য যাচ্ছে। ভারতের এ প্রতিষ্ঠানটি হয়তো সে কারণে কৃতজ্ঞতা থেকে মন্ত্রীকে পুরস্কৃত করেছে। পুঁজিবাদী এই দুনিয়ায় বিনিময় ছাড়া কিছুই হয় না। আর সত্যিই যদি ভারতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের শিক্ষামন্ত্রীকে আইকনিক ব্যক্তি হিসেবে মনে করে থাকেন, তাহলে বলতে হবে, প্রশ্নফাঁসের মতো দক্ষতার জন্য হয়তো আমরা এখন পুরস্কার পাচ্ছি।

এর মধ্যে জাতীয় সংসদে ক্ষমতাসীন বিরোধী দলের এমপি জিয়াউদ্দিন বাবলু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী যদি পদত্যাগ না করেন তা হলে তাকে বরখাস্ত করা হোক। ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া জিয়াউদ্দিন বাবলুর দাবি প্রসঙ্গে বলেন, নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি শুনেছেন। তিনি তার বিবেক বিবেচনায় জাতির স্বার্থে যতটুকু করার প্রয়োজন অবশ্যই তিনি করবেন। এখন দেখার বিষয় শিক্ষা খাতে নৈরাজ্য দূর করতে প্রধানমন্ত্রীর বিবেক জাগ্রত হয় কিনা।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পাতানো নির্বাচন ও ভোট জালিয়াতি

> আওয়ামী লীগ ৫ই জানুয়ারি নির্বাচন হাইজ্যাক করেছে, শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনগণের ভোটের অধিকার অস্বীকার করেছে এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। এ নির্বাচনে তথাকথিত বিজয় ছিল পূর্বনির্ধারিত। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে- ৩০০টির মধ্যে ১৫৩ আসনে প্রার্থী জয়ী হওয়ার জন্য একটি ভোটেরও প্রয়োজন হয়নি। আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা যদি আমরা বিশ্বাস করি তবে গণতন্ত্র হচ্ছে, জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। তাহলে ৫ই জানুয়ারি তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার জনগণের সরকার নয়, জনগণের দ্বারা গঠিতও নয়।

পাতানো নির্বাচন এবং একব্যক্তিক রাষ্ট্রের প্রশ্ন

মাহফুজ আনাম

১৯৪৯ সালে জন্মের পর থেকে আওয়ামী লীগ তার সব কর্মকাণ্ডে জনগণের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেছে। অথচ সেই দলটি নিষ্ঠুর, নির্দয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী সদ্য হয়ে যাওয়া নির্বাচন হাইজ্যাক করেছে এবং শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনগণের ভোটের অধিকারকে অস্বীকার করেছে। এ নির্বাচনে তথাকথিত বিজয় ছিল পূর্বনির্ধারিত। কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে- ৩০০টির মধ্যে ১৫৩ আসনে প্রার্থী জয়ী হওয়ার জন্য একটি ভোটেরও প্রয়োজন হয়নি। এটা যদি পূর্বনির্ধারিত না হয় তাহলে কি? এসব এ নির্বাচনকে পাতানো এবং ফলাফলকে বল প্রয়োগের বিজয়ের খেতাব এনে দিয়েছে। এরপর নতুন সরকার গঠনের বিষয়টি আসে, যা যে কোন নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্যে। এ সরকারও গঠন হয়েছে ভোটারদের কোন ধরনের অংশগ্রহণ ছাড়া।

আব্রাহাম লিঙ্কনের সংজ্ঞা যদি আমরা বিশ্বাস করি তবে গণতন্ত্র হচ্ছে, জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। তাহলে ৫ জানুয়ারি তথাকথিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার জনগণের সরকার নয়, জনগণের দ্বারা গঠিতও নয়। এ সরকার জনগণের জন্য কিনা তাও কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারবে।

শেখ হাসিনা যাই করুন না কেন, ৫ই জানুয়ারি নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেননি। যদিও তিনি সব সময় দাবি করে থাকেন গণতন্ত্রের জন্য তিনি সংগ্রাম করছেন। সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার নামে তিনি এমন একটি নির্বাচনের আয়োজন করেছেন, অফিসিয়াল রেকর্ড অনুযায়ী যে নির্বাচনে ১৪৭ আসনে ভোট পড়েছে ৩৯ শতাংশ। যা গত নির্বাচনে ৩০০ আসনে পড়া ৮৭ শতাংশ ভোটের তুলনায় অনেক কম। এবারের নির্বাচনে ভোট পড়ার যে হারের কথা বলা হয়েছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ভোটের দিন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় যে চিত্র দেখা গেছে তাতে ভোটের হার কিছুতেই ১৫ থেকে ২০ ভাগের বেশি হতে পারে না।

৫ জানুয়ারি নির্বাচনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে জনগণের বিশ্বাস ধ্বংস হয়ে যাওয়া। গত দুই যুগ ধরে তাদের যে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, প্রতি ৫ বছর পর পর তারা কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের মত প্রকাশ করতে পারবেন। এখন এ বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। এটাও প্রমাণ হয়েছে, আমাদের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের অধীনে কোন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তা আওয়ামী লীগ হোক আর বিএনপি-ই হোক।

এখন আমরা একটি মৌলিক সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি, ৫ জানুয়ারি নির্বাচন কি এক ব্যক্তিক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়নি। সমালোচক হিসেবে নয়, বরং গণতন্ত্রের বন্ধু হিসেবে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে তার হাতে থাকা অসীম ক্ষমতার ব্যাপারে সতর্ক করছি। লর্ড অ্যাকটিন এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন, ক্ষমতা দুর্নীতির জন্ম দেয় এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ দুর্নীতির জন্ম দেয়।

আধুনিক রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ- নির্বাহী বিভাগ, সংসদ এবং বিচার বিভাগ। আজকের দিনে শেখ হাসিনা প্রশ্নাতীতভাবে এবং কার্যকরভাবে দু'টি স্তম্ভ নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধারণভাবে রীতি অনুযায়ীই আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। আইন প্রণয়নকারী বিভাগ-সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর বিরাট প্রভাব রয়েছে। যদিও সর্বশেষ নির্বাচনের পর নতুন অগ্রগতিও হয়েছে। এমনকি এখন বিরোধী দলও প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিরোধী দলের একটি অংশ মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছে, আরেকটি অংশ রয়েছে বিরোধী দলে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এবারই প্রথম ঘটেছে। আমরা সবাই জানি, কিভাবে বিরোধীদলীয় নেতা তৈরি করা হয়েছে। এবং তথাকথিত বিরোধীদল কিভাবে সরকারের মন্ত্রিসভায় আরও স্থান পাওয়ার জন্য দরকষাকষি করছে। এই পরিস্থিতিতে সংসদের ওপরও প্রধানমন্ত্রীর পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাকি থাকে বিচার বিভাগ। ঐতিহ্যগতভাবেই বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব থেকে থাকে। উচ্চ আদালতের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায়, বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাবের কথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

আমরা এখন এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে আছি যেখানে সরকারের বিশেষ করে

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ক্ষেত্রে কোন ধরনের ভারসাম্য নেই। সারা দুনিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলোর মধ্যে ক্ষমতার বিন্যাসের ওপরই সুশাসন নির্ভর করে। রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভের হাতে বেশি ক্ষমতা চলে গেলে তা সরকার ব্যবস্থার জন্য বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। সরকার ব্যবস্থায় ভারসাম্য নীতির অভাব আরও অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে।

সাধারণ পরিস্থিতিতে কোন দলের সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ ভবিষ্যতের জন্য বিপর্যয়কর হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভিশাপের ইতিহাস রয়েছে। তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নিয়ন্ত্রণাধীন বিরোধী দল, ভারসাম্যহীন ক্ষমতার অধিকারী নেতার আবির্ভাব এবং এমন কোন প্রতিষ্ঠান না থাকা যা তাকে দায়বদ্ধ করতে পারে, এ অবস্থায় লর্ড অ্যাকটিনের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হওয়ার বড় ঝুঁকি রয়েছে। এটা রেকর্ডে থাক যে, সর্বপ্রথম সতর্কঘণ্টা আমরাই বাজিয়েছিলাম।

ঢাকা ডাইজেস্ট, ১৯ জানুয়ারি ২০১৪

> গণঅভ্যুত্থান সব সময়ই রাষ্ট্রকে নতুনভাবে গড়বার ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি করে দেয়। সঠিকভাবে নেতৃত্ব পেলে একটি জনগোষ্ঠি এধরনের বৈপ্লবিক মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে কয়েকশ বছরের উল্লম্ফন সম্পন্ন করতে পারে।

বেঁচে থাকো বাংলাদেশ বেঁচে থাকো, প্লিজ

ফরহাদ মজহার

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংসদে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার কথা শুনছিলাম। 'যার পর নাই ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন'-এর মধ্য দিয়ে তিনি 'প্রধানমন্ত্রী', তাঁর ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তিনি তা আমলে নিচ্ছেন না। যার কুফল বাংলাদেশকে ভোগ করতে হচ্ছে।

'যার পর নাই ত্রুটি পূর্ণ নির্বাচন (Extremely flawed election) আমার ভাষ্য নয়। বিদেশিদের মূল্যায়ন। যুক্তিসঙ্গত কারণেই 'যার পর নাই ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন'-এর মধ্য দিয়ে গঠিত জাতীয় সংসদর আন্তর্জাতিক মহলে আদৌ বৈধ সংসদ কি না সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে অবৈধ সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, এক শ্রেণির গণমাধ্যমের নির্বিচার নির্লজ্জ সমর্থন এবং দেশের ভেতরে শ্রেণির শক্তির ভারসাম্যের কারণে। সেই ভারসাম্য চুল পরিমাণ সরে গেলে সরকারের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব।

সে যাই হোক আওয়ামী লীগ নেত্রীকে গতকাল (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে সংসদে যার পর নাই ক্লান্ত মনে হচ্ছিলো। তিনি রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসেছেন, তাঁর পিতা সারাজীবন জেল জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। রাজনৈতিক নেতাদের দমন-পীড়নের ফল কি দাঁড়ায় এটা তো তাঁর নিজের জীবন থেকেই জানার কথা। ভাবছিলাম কী করে তিনি

খালেদা জিয়াকে আইন বহির্ভূতভাবে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারছেন? কিভাবে বাংলাদেশের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের চেয়ারপারসনের বিদ্যুৎ লাইন তিনি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কেটে দেওয়া সম্ভব হোল? মোবাইল, ইন্টারনেট ডিশলাইনও। এই সবের জবাবদিহিতা তাঁকে কি করতে হবে না? চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়।

খালেদা জিয়া নির্বাচন চাইছেন। নির্বাচন দেওয়া না দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর চাওয়া কিংবা কারো দয়া প্রদর্শনের ব্যাপার না। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি বৈধ সরকারই জনগণকে শাসন করবার অধিকার রাখে। কিন্তু ভোটারবিহীন একটি তামাশার নির্বাচনের জোরে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আছেন, থাকতে পারছেন। তাঁর হিম্মতের প্রশংসা না করে পারি না। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বল প্রদর্শনের ফল কি জানে না, তাঁকে আসলেই গতকাল বুধবারে খুবই ক্লান্ত লাগছিলো।

জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য তাজুল ইসলামের একটি সম্পূরক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি। বিরোধীদলের নেত্রীর প্রতি তাঁর শ্লেষও কটাক্ষে জাতীয় সংসদ দ্রুতই তার মর্যাদার ওজন হারাচ্ছিল। হঠাৎ তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জরুরি অবস্থা জারির কথা তুললেন। একটি সম্পূরক প্রশ্ন তুলতে গিয়ে বিরোধীদলীয় চিফহুইপ বলেছিলেন, বর্তমানে বিভিন্ন টেলিভিশনে টক-শোয় গিয়ে অনেকে উস্কানি দেয়। তাদের উস্কানিতে বেশি বেশি উৎসাহিত হয়ে সন্ত্রাসীরা আরও বেশি পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই প্রধানমন্ত্রী এই উস্কানিদাতাদের উস্কানি বন্ধ করতে টক-শো'র বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবেন কি না। চিফহুইপের কথা থেকেই বোঝা যায় সংসদে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সদাই বিষফণা তুলে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নিজেও আনন্দের সঙ্গে শামিল হন। এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে টক-শোয় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি তিনি ইঙ্গিত করে বলেন,

"যারা টক-শো করেন, তাঁদের বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া কে দেবেন? তাঁদের টার্গেট তো আমি। কিছু লোক আছেন, গণতান্ত্রিক পন্থা তাঁদের ভালো লাগে না। অসাংবিধানিক পন্থা এলে তাঁরা ভালো থাকেন, তাঁদের গুরুত্ব বাড়তো। তাই তাঁরা ব্যস্ত থাকেন অসাংবিধানিক পন্থা আনা যায় কি না। ওই স্বপ্ন দেখে লাভ হবে না। আমরা দেশকে আর অসাংবিধানিক পন্থায় ঠেলে দেবো না। জনগণ এমন চায় না। কেউ এমন করতে চাইলে জনগণ রুখে দেবে। সংবিধানের অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের (সর্বোচ্চ শাস্তি) বিধান রয়েছে"।

তাঁর বক্তব্যে বেশ থম খেয়ে বসে আছি। তা হলে কি জরুরি অবস্থা আসছে? তিনি আগাম এসব নিয়ে কথা বলছেন কেন? (দেখুন, 'জরুরি অবস্থা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি', প্রথম আলো, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

মন্তব্যটি টক-শোর অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে শুধু বলেছেন এমন মনে হয়নি। বরং টক-শোতে আসুক বা না আসুক সাধারণভাবে বাংলাদেশে 'সুশীলসমাজ' নামে যারা পরিচিত তাদের সম্পর্কেই মন্তব্যটি করা। অসাংবিধানিক পন্থা এলে সুশীলগণ ভাল থাকেন, তাঁদের

গুরুত্ব বাড়াতে কথাটা মিথ্যা না। সমাজে ক্ষমতার লোভ শুধু রাজনীবিদদের এমন ভাবা ঠিক না। সুশীলদের ক্ষমতা আস্বাদনের সাধ হয়। কিন্তু তারা রাজনীতিবিদদের মতো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেটা আস্বাদন করতে চায় না। সেই ক্ষেত্রে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও ঝুঁকি থেকে যায়। সুশীলগণ সেটা ফাও ভোগ করতে চান। সেটা সম্ভব হয় অসাংবিধানিকভাবে কোন শক্তি ক্ষমতায় এলে। অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতায় আসার অর্থ এমন সব শক্তির ক্ষমতারোহন যারা সংবিধান অনুযায়ী নয়, সংবিধান বহির্ভূতভাবে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসে তারা সামাজিক ভিত্তি খোঁজে। সুশীলগণ তাদের সেই ভিত্তি দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তিন মাসের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ব্যবস্থা যুক্ত হবার পর, সুশীলদের ক্ষমতার আস্বাদন সাংবিধানিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। খুব আরাম হয়েছে তাদের।

সে যাই হোক অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সরল ও সিধা দুটো অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, সামরিক শাসন বা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল। রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর ভীতশ্রদ্ধ মানুষ এই সময় সেনাবাহিনীর ভূমিকা প্রত্যাশা করছে বলে অনেকেই বলা বলি করছে। শেখ হাসিনাও সেটা মনে করছেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে। যার কারণে টকশোওয়ালাদের ওপর তাঁর গোস্বা তিনি লুকাননি।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থান অসাংবিধানিক অর্থাৎ গণঅভ্যুত্থান সংবিধান মেনে ঘটে না কিংবা ঘটানো হয় না। জনগণ সংবিধান বগলে নিয়ে উকিল ব্যারিস্টারদের ব্যাখ্যাটিকা ভাষ্য শুনে অভ্যুত্থান করে না। গণঅভ্যুত্থান সব সময়ই অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই রকম সম্ভাবনা তৈরি হবার পরও 'সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা'র নামে নস্যাৎ করে দিলে তার কুফল হয় ভয়াবহ। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে গণভ্যুত্থান কেন নস্যাৎ করে দেবার জন্যই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার হুজুগ তৈরি করা হয়েছিলো। সংবিধানের কোন গণতান্ত্রিক সংস্কার বা রূপান্তর না ঘটিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার উৎপত্তিও ত্রয়োদশ সংশোধনী সংবিধানে সংযুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই সময় জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা নস্যাত করে দেওয়া। এটা ছিল জনগণের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। যার কুফল হানাহানি, রক্তপাত, লগি বৈঠা আর পেট্রোল বোমাসহ এখন চরম ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে রূপ নিয়েছে।

গণঅভ্যুত্থান অসাংবিধানিক। আলবৎ কিন্তু গণতন্ত্রের সবচেয়ে বিকশিত রূপ। এর কারণ হচ্ছে জনগণের ইচ্ছার সংকল্পের চরম মাত্রার পরম যৌথবদ্ধতাই গণঅভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহণ করে। গণতন্ত্রের এর চেয়ে উন্নত অভিপ্রকাশ আর কী হতে পারে ? গণঅভ্যুত্থান সব সময়ই রাষ্ট্রকে নতুনভাবে গড়বার ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি করে দেয়। সঠিকভাবে নেতৃত্ব পেলে একটি জনগোষ্ঠি এধরনের বৈপ্লবিক মুহূর্ত কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে কয়েকশ বছরের উল্লম্ফন সম্পন্ন করতে পারে।

দুই.

তবে শেখ হাসিনা অসাংবিধানিক পন্থা বলতে গণঅভ্যুত্থান বোঝাননি, তিনি বুঝিয়েছেন বিশুদ্ধ সামরিক অভ্যুত্থান, কিংবা চাপের মুখে জারি করা 'জরুরি অবস্থা'। তিনি সরকারে থাকেন বা না থাকেন ক্ষমতা তখন তাঁর হাতে নয়, হস্তান্তরিত হবে সেনাবাহিনীর কাছে। বলা বাহুল্য তিনি কোনভাবেই এমন চাইতে পারেন না। এ বিষয়ে কোন কিছু মুখে আনাও এখন তার রাজনৈতিক পরাজয়। বিপজ্জনকও বটে। তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবার লক্ষণ। ক্ষমতার শিথিলতা সমাজে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে তা অনুমান করা কঠিন। হিংসা আর প্রতিহিংসার রাজনীতি সমাজকে কতোটুকু উত্তপ্ত করে রেখেছে তার মাত্রা বিপদসীমা বহু আগেই অতিক্রম করে গিয়েছে সেটা বুঝতে পারা কঠিন নয়। সে কারণেই ভাবছিলাম, কেন তিনি হঠাৎ অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা বদলের কথা বলছেন!

কিন্তু অসাংবিধানিক সরকার এলে সুশীলদের লাভ তার এই থিসিসটার একটা ব্যাখ্যা দরকার। অসাংবিধানিক সরকার এলে টকশো ওয়ালারাসহ সুশীলদের লাভের বক্তব্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার ধারণার সঙ্গের জড়িত। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে 'সাংবিধানিক' বলা যাবে না। কিন্তু এ ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে যারাই শাসন করবেন তাঁদের অবশ্যই নির্বাচিত হতে হবে। দৃশ্যমান বৈধ সম্মতি ছাড়া নাগরিকদের শাসন করবার অধিকার কারুরই নাই। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক শাসন ব্যবস্থা এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে তিন মাস নাগরিকদের অনির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন মেনে নিতে হবে। কেন? কারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক চেতনা এতোই পশ্চাতপদ যে শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ম মেনে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করতে পারে না। প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচনের সময় এলে হানাহানি, রক্তপাত ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে তারা রাষ্ট্রকে ঠেলে দেয়। এই পরিস্থিতিতে সমাজের শক্তিশালী শ্রেণির শক্তি স্থির করেছে এই সময় কোন রাজনৈতিক দল নয়, ক্ষমতায় থাকবে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ কিন্তু বিবাদে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে গ্রহণযোগ্য অরাজনৈতিক কিছু ব্যক্তি যারা সমাজে 'সুশীল' নামে পরিচিত। ক্ষমতা হস্তান্তরের এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুশীলদের জন্য প্রতি পাঁচ বছর পর পর ক্ষমতা ভোগের এক চমৎকার সুব্যবস্থাও বটে। যে সমাজে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা অবিকশিত, নাগরিক বোধ ও দায়িত্ব জ্ঞানের প্রকট অভাব, সেই সমাজে ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রকার অগণতান্ত্রিক চিন্তার আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলাদেশে এই ধরণের একটি ধারণার জন্ম ও তার বাস্তবায়ন সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক চেতনার মাত্রাও নির্দেশ করে।

গণতন্ত্র বিরোধী হলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অসাংবিধানিক নয়। এই দিকটি বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের যে কোন নীতি, রীতি বা আইন ঘোর অগণতান্ত্রিক অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদর্শে বিরোধী হতে পারে, কিন্তু তার সাংবিধানিক বা আইন সম্মত হতে বাধা নাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা অসাংবিধানিক নয় কারণ এই রীতি

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদে বিধিবদ্ধভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ধারণাটি অগণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে না এবং থাকা উচিত না যেখানে নাগরিকদের তিন মাস অনির্বাচিত ব্যক্তিদের শাসন মেনে নিতে হয়। শাসন ব্যবস্থা হিসাবেও এটা বিপজ্জনক। গণতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় গঠিত সরকারের ক্ষমতা সীমিত রাখতে হয়েছে। তারা কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত দিতে পারে না, এই সরকারের প্রধান কাজ নির্বাচন করা। কয়েকবার এই ব্যবস্থা কাজ করল, কিন্তু ইয়াজুদ্দিন আহমদের সময় দেখা গেল নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত আর সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে আর ফারাক করা যাচ্ছে না। তদুপরি ইয়াজ উদ্দীন নিজেকে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করলেন। জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলো। খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা দুর্নীতিসহ আরও নানান অপরাধের দায়ে গ্রেফতার হলেন। সেই পর্ব নানান উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতির সংকট নতুনভাবে শুরু হলো। এক তরফা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার পরিণতি আমরা এখন ভোগ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করেই শেখ হাসিনা ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি ইমার্জেন্সি বা জরুরি অবস্থা ঘোষণাও কঠিন করে দিয়েছেন এবং অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় আসা অসম্ভব করে তুলেছেন। এমনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে সাজিয়েছেন যাতে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে না চাইলে সাংবিধানিকভাবে তাঁকে অপসারণ যার পর নাই কঠিন হয়। জাতীয় সংসদে সেটাই সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন,

"দেশে জরুরি অবস্থা জারি করার মতো পরিস্থিতি এখনো কেউ সৃষ্টি করতে পারেনি। কেউ কেউ ফোন করে বলেন, এই হয়ে যাচ্ছে, ইমার্জেন্সি হয়ে যাচ্ছে। ওই স্বপ্ন দেখে লাভ হবে না। ... 'এক সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হওয়ায় ইয়াজ উদ্দিন সাহেব ইমার্জেন্সি দিতে পেরেছিলেন। এখন ইমার্জেন্সি দিতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির কাছে লিখিত পাঠাতে হবে। তখন রাষ্ট্রপতি ইমার্জেন্সি জারি করতে পারবেন।"

এটা পরিষ্কার শেখ হাসিনা সবাইকে জানিয়ে দিলেন, জরুরি অবস্থা জারির জন্য রাষ্ট্রপতিকে কোন লিখিত সম্মতি তিনি দেবেন না। তা হলে পরিস্থিতি তিনি সামাল দেবেন কিভাবে? আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে তিনি সেটা সামলাবেন। বলছেন,

"ইমার্জেন্সি (জরুরি অবস্থা) লাগবে কেন? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছে। এধরনের সন্ত্রাস কীভাবে দমন করতে হয় আমরা জানি।...আমরা দেশকে আর অসাংবিধানিক পন্থায় ঠেলে দেব না। জনগণ এটা চায় না। কেউ এটা করতে চাইলে জনগণ রুখে দেবে। সংবিধানেও অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের (সর্বোচ্চশাস্তি) বিধান রয়েছে।'

বোঝা যাচ্ছে সংঘাত ও সহিংসতার হাত থেকে নাগরিকদের নিস্তার সহজে ঘটছে না। কেউ যদি অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে চায় তাদেরকে প্রধানমন্ত্রী সাবধান করে দিলেন। এই ধরনের কাজের শাস্তিমৃত্যুদণ্ড। তিনি ভাবছেন ফাঁসির দড়িতে ঝুলবার ভয়ে কেউ অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখল করার সাহস করবে না।

সেটা হতে পারে। নাও হতে পারে। ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। আইন করে রাজনৈতিক গতি প্রক্রিয়ার পরিণতি যদি ঠেকানো যেত তা হলে আমরা ব্রিটিশ আইন মেনে চিরকাল ইংরেজের গোলামই থেকে যেতাম। কিংবা পাকিস্তানের সংবিধানের ভয়ে একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করতাম না। আইন ও সংবিধান মান্য করা গর্বিত পাকিস্তানী হয়েই থাকতাম।

আফসোস, ইতিহাস থেকে কেউই শিক্ষা গ্রহণ করে না। বাংলাদেশই সম্ভবত দুনিয়ার এক মাত্র দেশ যেখানে আইন জারি করে কিংবা আদালতে রায় দিয়ে ইতিহাসের ভুলত্রুটি শোধরানো হয়। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে অনেকে মনে করে সংবিধান দিয়ে ক্ষমতার রূপান্তর ঠেকান যায়। যে ক্ষমতা সংবিধানের বাইরে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়, সাংবিধানিকভাবে রাজনীতির সেই গতিপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, নির্ধারণ বা নির্ণয় করবে? সংবিধান বা আইন ইতিহাস ও রাজনীতির প্রতিফলন মাত্র, তার নির্ণায়ক নয়। ইতিহাস সংবিধান ও আইনের বাইরে ঘটে, আইন বা সংবিধান সেই ইতিহাসে অংশগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইতিহাসের গতি ও গন্তব্য নির্ধারণ করে দিতে পারে না। মানুষ আইন ও সংবিধানের বাইরে আসতে পারে, কিন্তু সংবিধান মানুষ ছাড়া নিজের ব্যাখ্যা নিজেও দিতে অক্ষম।

বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নির্ধারনের জন্যে এখনই জেগে উঠতে হবে। এখনই সময়। দুনিয়ার কোন রাজা বাদশাহ রাজনীতি ও ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করতে পারেনি। বাংলাদেশেও পারবে না।

বেঁচে থাকো বাংলাদেশ। বেঁচে থাকো, প্লিজ।

সূত্র : আলোকিত বাংলাদেশ

৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

“
২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ৩০০ আসনের ১৫৩টিই অনির্বাচিত। বাকি ১৪৭ আসনেও কোন নির্বাচন হয়নি। ৪-৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশন নিজেই স্বীকার করেছে, ৫০ কেন্দ্রে কোন ভোট পড়েনি।
”

একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নেত্রীর জন্য বড় বেশি প্রয়োজন

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম

বিয়ের বহুদিন পর কোন দম্পতি সন্তান সম্ভবা হলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন সন্তানের আশায় যেমন আকুল থাকে, বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ তার চাইতেও অধির আগ্রহে একটি নিরপেক্ষ প্রভাবমুক্ত ভাল নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজ বা দেশে সবসময়ই নানা ধরনের নির্বাচন একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের কাছে জাতীয় নির্বাচন তেমন নয়, অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। কী নাই আমাদের? বলতে গেলে সবই আছে। ভাগ্যবান উচ্চবিত্তের জীবনযাত্রা ধনী দেশের অনেক মানুষের চাইতেও উন্নত। লুটেপুটে যারা বিত্তের পাহাড় গড়েছে তাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, খরচপত্র অনেক ধনী দেশের মানুষকেও হার মানায়। রাস্তাঘাট, দালানকোঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য কী নেই? বলতে গেলে সবই আছে। তারপরও মানুষের মধ্যে শান্তি, স্বস্তি নেই। দেশের মালিক জনগণ, সিএস-আরএস তাদের নামে। মালিকানা আছে, কিন্তু দখল নেই। কেউ কারও কথা মানে না, শোনে না, শুনতে চায় না। আস্তে আস্তে সমাজ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এমন দুর্বল সমাজ ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। মানুষ যখন মূল্যহীন হয়, অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তখন যেকোন অঘটন ঘটতে বা ঘটাতে পারে।

সমাজের শক্ত নেতৃত্ব কর্তৃত্ব একটা দেশের জন্য সব থেকে বড় রক্ষাকবচ। সামাজিক গাঁথুনি ঠিক থাকলে অন্যসব দুর্বলতা সহজেই মোকাবেলা করা যায়। কিন্তু সমাজ ভেঙে গেলে ন্যায়-অন্যায়, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে গেলে যে কোন সময় ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কোন বিস্ফোরণই তেমন একটা সৃষ্টি করে না, বরং ধ্বংসই করে বেশি। আমরাও ঠিক তেমনি একটা ভয়াবহ অনিশ্চয়তা বা ধ্বংসের দিকে অসহায়ের মতো এগিয়ে চলেছি।

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ যে দেশের মালিক সে ভাবনা থেকে তারা অনেক দূরে সরে গেছে। অমন নির্বাচনী প্রহসন উপেক্ষা কারো চিন্তায়ও ছিল না। পাকিস্তান কত নির্বাচনী প্রহসন করেছে। কিন্তু তারাও ভোট ও ভোটার ছাড়া অমন ন্যাক্কারজনক নির্বাচনী প্রহসন করেনি। '৭০ এর নির্বাচনে ইয়াহিয়া কত শর্ত দিয়েছিল, তার এলএফও মানে লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কে আমাদের হাত-পা বাঁধা ছিল। তারপরও ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে হয়েছে, ব্যালট পেপারে সিল দিতে হয়েছে। বিনা ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করেনি বা করতে পারেনি। কিন্তু ২০১৪ সালে সারাদেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ৩০০ আসনের ১৫৩টিই অনির্বাচিত। বাকি ১৪৭ আসনেও কোন নির্বাচন হয়নি। ৪-৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশন নিজেই স্বীকার করেছে, ৫০ কেন্দ্রে কোন ভোট পড়েনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন বলছেন, অংশগ্রহণ ছাড়া আর অমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচন তিনি চান না। তার মানে ২০১৪ সালের নির্বাচন ঠিক ছিল না তার কথাতেই প্রমাণ হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের নির্দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সংসদ এবং সরকার পরিচালিত হবে। সংবিধানের ৬৫ পরিচ্ছেদের (২) অনুচ্ছেদ "একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।" এই সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনির্বাচিত। সেই অর্থে আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর, সংবিধানসম্মত না। কিন্তু তবু সংসদ আছে, সরকার আছে- এটাই বাস্তব। যখন যার নিয়ন্ত্রণে দেশ বা সমাজ থাকে, তখন সেই সব। যেমনটা এখন চলছে।

২০১৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়ে নানা সমস্যার কারণে এক সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করে নির্বাচিত বা যে সরকার থাকবেন সেই সরকারের অধীনে পরবর্তী নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন কেউ মেনে নেয়নি, তবু নির্বাচনী প্রহসন হয়েছে। বিরোধী দল জনগণকে তেমন উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। বিরোধী দল বলতে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। এখন যে যাই বলুন করুন, বিএনপি মূল বিরোধী দল। স্বীকার করুন আর না করুন তাদের হাসি-কান্না সব দলের হাসি-কান্না। কিন্তু কেন যেন তারা কখনো প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা পালনে সফল হননি। ২০১৪ সালে বিরোধী দল বা বিএনপির ভোট বর্জন আমার চোখে পৃথিবীর ইতিহাসে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে সবচাইতে সফল প্রতিবাদ, নেতৃত্বের

সফলতা। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভোট বর্জন করায় কেউ তাতে অংশ নেয়নি। সরকার তার জোট নিয়ে ভোট করেছে। অন্য কাউকে পায়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন বিনা অংশগ্রহণে আর কখনো কোন নির্বাচন হয়েছে কিনা সন্দেহ। ৩০০ আসনের ১৫৩ জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ গঠনের আগেই সে তার গ্রহণযোগ্যতা, সাংবিধানিক বৈধতা হারিয়েছে। তারপর যে অর্ধেক আসনে প্রহসন হয়েছে সেখানেও ভোটাররা অংশ নেয়নি। এত বড় সফলতা বিরোধী দল বা বিরোধী দলনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোন কাজে লাগাতে পারেননি। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত বড় দুর্বলতা বা ব্যর্থতা সফলতায় রূপ দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে সফল নেতা কাকে বলবো? জননেত্রী শেখ হাসিনাকে, না খালেদা জিয়াকে? সরকারী দল থেকেও শেষ পর্যন্ত বলা হয়েছিল, এ নির্বাচন শুধু সংবিধান রক্ষার নির্বাচন। সামনে সময় সুযোগ দেখে সবাই মিলেমিশে জাতীয় নির্বাচন করবো। সেটাও আদায় করতে পারেনি বিরোধী দল বিএনপি। আন্দোলন বিমুখ বিরোধী দল যদি কিছু আদায় করতে না পারে সরকার তাকে কোন কিছু হাতে তুলে দেবে? তা কি কেউ কোন দিন দেয়? সরকার হারামকে প্রায় হালাল করে ফেলেছে। অথচ বিএনপি হালালকে হালাল করতে পারলো না। নির্বাচনের আগে সর্বদলীয় সরকার করা হলো। সংবিধানে যার কোন অনুমোদন বা স্বীকৃতি নেই। বিএনপিকেও মন্ত্রিত্ব দিতে চেয়েছিল। অংশ নিলে তাদেরকেও আসন ভাগ করে দেয়ার কথা ছিল। মনে হয় এ যেন কোরবানীর গোশত ইচ্ছে করলেই ভাগ দেয়া যায়। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় কে বসবে সেটা নির্ধারণ করবেন দেশের মালিক জনগণ। মানুষের চাইতে দলীয় শক্তি বেশি হলে যা হয় আমাদের দেশে তাই হয়েছে। ভোটাররা কাকে কোন আসন দিবে সেটা নয়, জননেত্রী হাসিনা বা বেগম খালেদা জিয়া কাকে ক'টা আসন দিবেন সেটাই এখন বড় বিবেচ্য। এটা মোটেই শুভ নয়, ঠিক নয়। অনেকেই ভাবছে, ২০১৪ সালে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে ভুল করেছে। যারা অংশগ্রহণ করেনি, তারাও কেউ কেউ অমনটা ভাবছে। তাই হয়তো সামনের নির্বাচনে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। দলীয় সংগঠন এবং জনগণের সমর্থন না থাকলে সে হুমড়িতে কতটা কী হবে তা তারাই জানেন। তবে অবিশ্বাসের কালো ছায়ায় দেশ ঢেকে আছে। আমাদের খুব বেশি কিছু অভাব মনে হয় না– যতটা আস্থার অভাব। তাই সবার আগে রাজনীতির উপর মানুষের আস্থা কী করে আসবে সেটা দেখতে হবে। দারোগা-পুলিশ, আমলা-ফইলা থাকায় সরকারী দল মারাত্মক দাপটে আছে। কিন্তু তারা কি কখনো পিছু ফিরে দেখে তাদের সম্মান কতটা? আগে সাধারণ পিয়ন-চাপরাশিদের যে সম্মান ছিল, তার থেকেও এখন অনেকের সম্মান কম- এসব কেউ কখনো কি ভেবে দেখেন? কেউ ভাবেন না। রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। রাজনীতি এখন ব্যবসায়ীদের হাতে। রাজনীতি এখন আর কোন সেবা নয়, রাজনীতি এখন ব্যবসা। সেখান থেকে জনতার রাজনীতি, জনতার দেশ কি করে জনতার হাতে ফিরে আসবে সেটা ভাবতে হবে।

সামনে একটি সুন্দর গ্রহণযোগ্য সাধারণ নির্বাচন না হলে সেটা হবে দেশের জন্য মারাত্মক অমঙ্গল। তাই জাতিগতভাবে সামনের নির্বাচন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় বিরোধীদের চাইতে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু সবার গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন সরকারী দলের জন্য বেশি জরুরি। যে যাই বলুন, আওয়ামী লীগ বর্তমানে যেভাবে আছে

একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে ভাবিকালে নিজেকে প্রমাণ করতে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন বিএনপির চাইতে আওয়ামী লীগের বেশি প্রয়োজন। আবার সিল মেরে ক্ষমতায় গিয়ে আরো ২-৪ বছর নিশ্চয়ই থাকা যেতে পারে। কিন্তু সেটা কোন কাজ হবে না। কলঙ্ক হবে আয়ুব-ইয়াহিয়ার চাইতেও বেশি। এক্ষেত্রে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিপদ সব থেকে বেশি। একে তো তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, দেশের জন্য গণতন্ত্রের জন্যে বঙ্গবন্ধু তার জীবন দিয়েছেন। আমরা মুখে যতই বলি, আমাদের কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, দেশের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ- এসব কোনটাই পুরোপুরি সত্য নয়, আংশিক সত্য। আসল কথা সাধারণ মানুষ নেত্রী বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কী ভাবে। নিশ্চয়ই রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দক্ষতায় জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন সবার উপরে। ১০০ বছর পর তিনি কি এমনটা থাকবেন? কত সম্রাট কত শাসক এসেছে, গেছে। জীবিতকালে যারা শুধুই জয় নিনাদ শোনেন তারাও- না তাদের জীবন অবসানে কত অপবাদী হয়ে আছেন। আমি নেত্রীর ক্ষেত্রে তেমন চাই না। আমি সবার জন্য শুভ চাই।

ইনকিলাব, ৭ জুন, ২০১৭

> কমিশনকে তো খেলার মাঠের রেফারির মতো সব দলের স্বার্থ সমানভাবে দেখতে হবে। ইসি কি জানে না সরকারি দল এক-দেড় বছর থেকে জনগণের করের টাকায় সরকারি প্রটোকল ব্যবহার করে বড় বড় সমাবেশে নৌকায় ভোট চাইছে? সবরকম নির্বাচনী প্রচারণা করছে? আর অন্যদিকে বড় বিরোধী দল হামলা মামলায় পর্যুদস্ত হয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের নেতাকর্মীদের নামে গায়েবি মামলা দিয়ে তাদের আসামি করা হয়েছে। তাদের পাইকারি হারে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের ফাইনাল পরীক্ষা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশে যতগুলো দুর্বল নির্বাচন কমিশন কাজ করেছে, তার মধ্যে একটি হল বর্তমান কমিশন। এ কমিশনের গঠনপ্রক্রিয়া থেকে শুরু করে পৌনে দু'বছরের কাজকর্ম ও বক্তব্য-বিবৃতি বিশ্লেষণ করে এমনটি বলা যায়। কাগজে-কলমে স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও কাজকর্মের মধ্য দিয়ে কমিশন এর স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। সে কারণে কমিশনের ওপর সরকারি দল ব্যতীত অন্যান্য দল ও জনগণের আস্থা গড়ে ওঠেনি। এ কারণে বিএনপিসহ নবগঠিত ঐক্যফ্রন্ট এর ৭ দফা দাবিতে কমিশনের পুনর্গঠন দাবি করেছিল। সাংবিধানিক পদ হওয়ায় সরকার না চাইলে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা কঠিন। কেন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা নেই? এর কারণ হল কমিশন দায়িত্বে আসার পর নিরপেক্ষ রেফারির ভূমিকা পালন করতে পারেনি। একাদশ সংসদ নির্বাচন আয়োজনেও কমিশন দলীয় সরকারের অঘোষিত ডিকটেশন অনুযায়ী কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

দায়িত্বে আসার পর থেকে এ কমিশনের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা হয়েছে। সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করছি না। তবে কমিশনের উচিত একাদশ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মূল পরীক্ষায় পাস করতে চেষ্টা করা। উল্লেখ্য, এর আগে অনুষ্ঠিত চার রকম স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কমিশন এর নিরপেক্ষতা যেমন প্রমাণ করতে পারেনি, তেমনি দৃশ্যমানভাবে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও ভোট কারচুপিকারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থাও করতে পারেনি।

তবে প্রতিটি নির্বাচনের পর সিইসি বলেছেন, 'কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত নির্বাচন ভালো হয়েছে।' কিন্তু বাস্তবতা দেখে জনগণ কমিশনের মুখস্ত বক্তব্য বিশ্বাস করেননি। অতীতের উল্লিখিত নির্বাচনগুলোতে যেসব ক্যাডার ও সন্ত্রাসীরা দুর্নীতি করে শাস্তির পরিবর্তে সরকারি প্রশ্রয় পেয়েছে, তারা সংসদ নির্বাচনে আবারও সন্ত্রাস করবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে নির্বাচন দলনিরপেক্ষ সরকারের অধীনে হলে সন্ত্রাসকারীরা কিছুটা ভয় পেত।

কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন হওয়ায় এরা যেহেতু আগে এই সরকারের অধীনেই নির্বাচনে সন্ত্রাস করে ক্ষমতাসীন দলের প্রশ্রয় পেয়েছে, কাজেই এখন একই সরকারের অধীনে নির্বাচনে সন্ত্রাস করতে ভয় পাবে না। নির্বাচন কমিশন এদের সন্ত্রাস করা থেকে বিরত রাখতে পারবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

কমিশন এর মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা নিয়ে সরকারি সুরে গান ধরেছে। প্রথমেই কমিশন তফসিল ঘোষণায় তাড়াহুড়ো করে ভুল করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জোট ও দলের সঙ্গে ১ নভেম্বর থেকে যে সংলাপ করেছিলেন, সে প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগেই কমিশনের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দরকার ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী সংলাপ শেষ করে যে প্রেস ব্রিফিং দিতে চেয়েছিলেন, কমিশনের উচিত ছিল সে পর্যন্ত অন্তত অপেক্ষা করা। কিন্তু কমিশন তা করেনি। আবার সরকারি দলের গ্রীণ সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই কমিশন ঘোষিত সিডিউল এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ জেগেছে যে কমিশন হয়তো অঘোষিত সরকারি ডিকটেশন অনুযায়ী কাজ করছে।

সরকারের ঘনিষ্ঠভাজন যুক্তফ্রন্ট ৭ দিন নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বলার পরপরই কমিশন ঠিক ৭ দিনই নির্বাচন পিছিয়েছে, যদিও নির্বাচনের অন্যতম স্টেকহোল্ডার ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে এক মাস নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি ছিল।

কমিশনকে তো খেলার মাঠের রেফারির মতো সব দলের স্বার্থ সমানভাবে দেখতে হবে। ইসি কি জানে না সরকারি দল এক-দেড় বছর থেকে জনগণের করের টাকায় সরকারি প্রটোকল ব্যবহার করে বড় বড় সমাবেশে নৌকায় ভোট চাইছে? সব রকম নির্বাচনী প্রচারণা করছে? আর অন্যদিকে বড় বিরোধী দল হামলা মামলায় পর্যুদস্ত হয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তাদের নেতাকর্মীদের নামে গায়েবি মামলা দিয়ে তাদের আসামি করা হয়েছে। তাদের পাইকারি হারে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

গণভবনে ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সংলাপকালে আর মামলা করা হবে না এবং ঐক্যফ্রন্টকে সভা-সমাবেশ করতে দেয়া হবে মর্মে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেও সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। কারণ, পরে ঐক্যফ্রন্টের রাজশাহী ও ঢাকার সমাবেশে বাধা দেয়া হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে। যানবাহন আটকে দেয়া হয়েছে। গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গণভবনে দ্বিতীয় দফা সংলাপকালে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলার একটি আংশিক তালিকা হস্তান্তর করা হলেও মামলা ও গ্রেফতার বন্ধ হয়নি।

পরে ১৩ তারিখ অপরাহ্নে বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ১০০২টি গায়েবি মামলার একটি অসমাপ্ত তালিকা হস্তান্তর করা হয়। কাজেই বিএনপির প্রতি যে নিপীড়ন করা হচ্ছে সে বিষয়টি সবাই বুঝতে পেরেছেন। এ কারণে ইনক্লুসিভ নির্বাচন করার স্বার্থে সব দল যাতে মনোনয়নপত্র জমাদান ও অনান্য নির্বাচনী প্রস্তুতি গ্রহণে সমান সুযোগ পায় সে বিষয়টি তো কমিশনকে দেখতে হবে। কারণ, কমিশন কেবল সরকারি দল বা জোটের নয়, তাকে সব দলের সুযোগের সমতা সুনিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু কমিশন তা করতে পারছে কই?

সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা জাঁকজমকপূর্ণভাবে মিছিলসহকারে নির্বাচনী আচরণবিধি ভেঙে শোডাউন করে মনোনয়নপত্র জমাদানকালে পুলিশ বাহিনী তাদের বাধা দেয়নি। তবে সেই পুলিশই বিএনপি অফিসে মনোনয়নপত্র গ্রহণকালে নেতাকর্মীদের ঢল নামলে চুপ থাকেনি। ১৩ নভেম্বর সরকারি দলের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমাদান শেষ হলে ইসি পুলিশ মহাপরিদর্শক বরাবর চিঠি পাঠিয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমাদানকালে শোডাউন করাকে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন আখ্যায়িত করে এসব বন্ধের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

কমিশন সরকারদলীয় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে এমন নির্দেশনা দিলে জনগণ ইসিকে সরকারি দলের আজ্ঞাবহ মনে করতেন না। বিএনপির মনোনয়নপত্র গ্রহণকালে ১৪ তারিখে পুলিশ কার নির্দেশে দলটির নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ এবং রাবার বুলেট ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে সে বিষয়টি সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। এটাই কি ১৪ তারিখে আগারগাঁওয়ে সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের উদ্দেশে তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সিইসি মহোদয়ের বক্তব্যের প্রতিফলন?

ডিএমপি মতিঝিল বিভাগের উপ-কমিশনার আনোয়ার হোসেন বলেন, 'যানবাহন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য পুলিশ বিএনপির নেতাকর্মীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা শান্ত পরিস্থিতিকে অশান্ত করার জন্য পুলিশের ওপর হামলা করে।'

আওয়ামী লীগ অফিসে ৩-৪ দিনব্যাপী মনোনয়নপত্র সংগ্রহকালে যান চলাচল বন্ধ থাকাকালে পুলিশ সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়নি। পুলিশ তো হুকুম তামিলকারী। কাজেই পুলিশকে নির্দেশনা প্রদানকারী ইসি এবং ইসিকে এ নির্দেশ দিতে কেউ প্রভাবিত করে থাকলে তারাই মূলত এ জন্য দায়ী।

সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা মিছিলসহকারে মনোনয়নপত্র নিতে পারলেন; আর বিএনপি নেতাকর্মীদের মনোনয়নপত্র নেয়ার ক্ষেত্রে করা হল পুলিশি আক্রমণ? ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ড. কামাল হোসেন এ ঘটনাকে 'সরকারি বাহিনীর উৎসাহী কাজ' বলে আখ্যায়িত করেন। এসব গাড়ি ভাংচুরকারীদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় না আনলে এমন ঘটনা আবারও ঘটবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, পুলিশের গাড়ি ভাংচুরকারীদের ভিডিও ফুটেজ দেখে বিচার করা হবে। কিন্তু এ আশ্বাসে কি জনগণ বিশ্বাস রাখতে পারবেন? কারণ, এর আগে ২০১৩ সালে হেফাজতের শাপলা চত্বরে সমাবেশকালে যারা বায়তুল মোকাররমে পবিত্র

কোরআন শরিফ পুড়িয়েছিল, তাদের ভিডিও ফুটেজ দেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওই সময় বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ অবধি সে বিচার হয়নি এবং এ সরকার আমলে হয়তো হবে না।

ঐক্যফ্রন্ট নেতারা ১৪ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করে নির্বাচনের তারিখ তিন সপ্তাহ পেছানোর দাবি জানিয়েছেন। তারা নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী নিয়োগের দাবির সঙ্গে নির্বাচনের আগে জনপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের রদবদল দাবি করেছেন।

তাছাড়া কমিশনকে তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত গায়েবি মামলা সম্পর্কে অবহিত করে আর যেন কাউকে গ্রেফতার বা হয়রানি না করা হয় সে দাবি করেছেন। নির্বাচন চলাকালে গণমাধ্যমকর্মীদের সরাসরি সম্প্রচার করতে না দেয়ার ইসির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ঐক্যফ্রন্ট নেতাগণ। কমিশন সদস্যগণ মনোযোগ দিয়ে ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের দাবিগুলো শুনেছেন এবং এসব ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানিয়েছেন।

তবে ইসি সিদ্ধান্ত দেয়ার আগেই আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান এইচটি ইমাম বলেছেন, নির্বাচন একদিনের বা এক ঘণ্টার জন্যও পেছানো যাবে না। দেখা যাক স্বাধীন ইসি কাদের কথা শোনেন।

ইসির সঙ্গে বৈঠক করার আগে ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের হোমওয়ার্ক ভালো হয়নি। কারণ, গায়েবি মামলা সম্পর্কে ইসিকে অবহিত করলে তারা ওই মামলার তালিকা চেয়েছেন। ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের জানা উচিত ছিল, এটা চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেহেতু এ রকম ১০০২ মামলার একটি তালিকা তারা মাত্র একদিন আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দিয়েছেন, কাজেই তার একটি প্রিন্টআউট তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তাহলে তারা এ বৈঠকেই তালিকাটি ইসিকে দিতে পারতেন।

আর ইভিএমের বিষয়টি কেন তারা তাদের আলোচনায় আনেননি তাও জনগণের কাছে বোধগম্য নয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল যেখানে ইভিএমে ভোটদান নিরাপদ মনে করেন না, সেখানে আলোচ্য বৈঠকে ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের জোরালো বিরোধিতা করা উচিত ছিল।

বলা উচিত ছিল, ইভিএম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার শখ থাকলে ইসির তা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে করা উচিত; জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নয়। কারণ, এতে ডিজিটাল কারচুপির আশঙ্কা রয়েছে। প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দেশগুলো যখন ইভিএম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তখন স্বল্পশিক্ষিত ভোটারের বাংলাদেশের নির্বাচনে এ হাইটেক প্রযুক্তির মেশিন ব্যবহার করা ঝুঁকিপূর্ণ।

রংপুরে এক কর্মশালায় যোগদান শেষে নির্বাচন কমিশনার রফিকুল ইসলাম ইভিএমের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি জানান, সংসদ নির্বাচনে স্বল্পপরিসরে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে

ইভিএমে ভোট গ্রহণ করা হবে। 'ভারতের জনগণকে ইভিএম বিশ্বাস করাতে ১৫ বছর লেগেছে' উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমরা খুব স্বল্পসময়ে ভোটারদের বোঝাতে পারব এটি একটি স্বচ্ছ ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া।'

তিনি আরও বলেন, 'ইভিএম ব্যবহার করলে আমাদের নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যয় কমে আসবে।' জনাব ইসলামের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ভোট কোন প্রক্রিয়ায় হবে তা ঠিক করবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলো। যেখানে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ইভিএম চায় না, চায় না ঐক্যফ্রন্ট, সরকারের শরিক জাপাসহ আরও অনেক দল, এমনকি ইভিএমের প্রধান ও প্রথম সূচনাকারী সাবেক সিইসি এটিএম শামসুল হুদা, সেখানে ইভিএম ব্যবহারে ইসির এত আগ্রহ কেন? ভারতের যে উদাহরণ জনাব ইসলাম দিয়েছেন, তা সঠিক নয়। দেশটির অন্যতম বড় দল কংগ্রেসসহ অধিকাংশ দল ইভিএম চায় না।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এ বছর মার্চ মাসে বলেছেন, তারা ইভিএমের পরিবর্তে কাগজের ব্যালটে ভোট চান। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানী, বহুজন সমাজ পার্টি নেত্রী মায়াবতী, সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ সিংহ যাদবসহ অনেক নেতা ইভিএমের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন এবং আছেন।

দুই লাখ টাকা করে প্রতিটি ইভিএম ক্রয় করে জনাব ইসলাম বলছেন ইভিএম ব্যবহারে অর্থের সাশ্রয় হবে। তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে একজন ভোটার হিসেবে বলতে চাই, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কাজ অর্থ সাশ্রয় করা নয়। কমিশনের কাজ হল নির্বাচনে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা। সে জন্য যত টাকা লাগে খরচ করুন। নাগরিক সমাজ তাতে আপত্তি করবে না। দয়া করে অর্থ সাশ্রয়ের জন্য ডিজিটাল কারচুপির ঝুঁকি নেবেন না।

ইসি এখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। এটাই ইসির ফাইনাল পরীক্ষা। রেফারির ভূমিকা পালন করে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করার এ পরীক্ষার প্রথম সেমিস্টারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমাদানের আয়োজনে বিএনপির সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করে ইসি ফেল করেছে।

এ পরীক্ষার সামনের সেমিস্টারগুলোয় ইসি অত্যন্ত সতর্ক, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও পেশাদার ভূমিকা পালন করতে পারলেই কেবল নির্বাচন সুষ্ঠু হতে পারে। আর সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের এ ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করলে দেশপ্রেমিক ভোটাররা এ ইসিকে একটি ব্যর্থ ও কালিমালিপ্ত ইসি হিসেবে বিবেচনা করবে।

লেখক : অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যুগান্তর, ১৭ নভেম্বর ২০১৮

> পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনমত যাচাই ছাড়া কোনো আইন প্রণীত হয় না। এ কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় জনমত এর সপক্ষে ছিল এবং বাতিলের সময় জনমত এটির বিপক্ষে ছিল। জনমত যাচাই ছাড়া কোনো আইন প্রণয়ন প্রত্যাশিত নয়। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবক্তা হলেও জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে স্বীয় স্বার্থ রক্ষার মানসে তারা এ ব্যবস্থাটির বিলোপসাধন করেছে। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সহায়ক হবে না

নির্বাচন ভাবনা ও জনপ্রত্যাশা

ইকতেদার আহমেদ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের একমাত্র মাধ্যম হলো নির্বাচন। সে নির্বাচনটি অবশ্যই অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হতে হয়। একটি দেশে সরকারের প্রকার ভেদে কখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তা দেশটির সংবিধান দিয়ে নির্ধারিত। আমাদের বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় পদ্ধতির উভয় ধরনের সরকার ব্যবস্থায় শাসিত হয়েছে। '৭২-এর সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, যা নানা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনী প্রণয়ন অবধি বলবৎ ছিল। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা আজও অব্যাহত আছে।

সংবিধানের বর্তমান বিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ আপনাআপনি ভেঙে যায়, যদিও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি মেয়াদ পূর্তির আগেও সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। '৭২-এর সংবিধানে সংসদের সাধারণ নির্বাচন বিষয়ে যে বিধান ছিল তাতে বলা ছিল- মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০

দিনের মধ্যে এবং মেয়াদ অবসান ছাড়া অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ বিধানটি কার্যকর থাকাকালীন প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ– এ ছয়টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এ ছয়টি সংসদের কোনোটিই মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারায় সংসদ ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখা দেয়নি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অভ্যুদয়ের পর আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি- এ তিনটি দলের রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ ঘটে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এ দু'টি দল ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় পদ্ধতি উভয় ধরনের সরকার ব্যবস্থায় শাসিত হয়; অপর দিকে জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় পূর্বাপর রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সাল পরবর্তী দেশের বড় দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ক্ষমতার বাইরে থাকাবস্থায় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে যে বিরোধ, তা হলো একটি সরকারের মেয়াদ অবসানের পর কোন ধরনের সরকারের অধীন সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সমভিব্যাহারে পঞ্চম সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনটি আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী একযোগে বর্জন করায় এটি দশম সংসদ নির্বাচনের মতো একতরফা ছিল।

ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনটি যে মাত্রায় কলুষতা ও অনিয়মে ভরপুর ছিল, তা দশম সংসদ নির্বাচনের অনুরূপ; তবে এ দুটি নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটি অনুষ্ঠান-পরবর্তী বিরোধীদের দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে সংসদের প্রথম অধিবেশনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার বিধানবিষয়ক সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী প্রবর্তন করে সংসদ অবলুপ্ত করা হয়। অপর দিকে শেষোল্লিখিতটিকে সংবিধানের ধারাবাহিকতায় নিছক নিয়ম রক্ষার নির্বাচন বলা হলেও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসে বিরোধীদের দাবির উপেক্ষায় এ সংসদটি মেয়াদ পূর্ণ করতে চলেছে। প্রথমোল্লিখিত অনুষ্ঠানকালীন আওয়ামী লীগ দেশের প্রধান বিরোধী দল ছিল, অপর দিকে শেষোল্লিখিত অনুষ্ঠানকালীন বিএনপি দেশের প্রধান বিরোধী দল ছিল। তা ছাড়া প্রথমোল্লিখিত বিপরীতে শেষোল্লিখিত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বর্জন করে। জাতীয় পার্টি দশম সংসদে একাধারে সরকারের অংশীদার ও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এ ধরনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের রীতিনীতির সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দশম সংসদের ১৫৪ জন সদস্য বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। সংসদ গঠন বিষয়ে সংবিধানে যে বিধানের উল্লেখ রয়েছে তাতে বলা আছে– একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ সদস্য এবং তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে

নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সদস্য সর্বমোট ৩৫০ সদস্য সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয়, যে সংসদে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত ৩০০টি আসনের অর্ধেকেরও অধিক আসনের ১৫৪ জন সদস্য বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সে সংসদটি যথাযথভাবে সংবিধানের বিধানাবলির আলোকে গঠিত কি না?

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন-পরবর্তী সংসদের সাধারণ নির্বাচন বিষয়ে যে বিধান করা হয়, তাতে বলা ছিল মেয়াদ অবসান বা মেয়াদ অবসান ছাড়া, অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ বিধানটি প্রবর্তন-পরবর্তী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দু'টি নির্বাচনের প্রথমটিতে আওয়ামী লীগ এবং শেষোক্তটিতে বিএনপি বিজয়ী হয়।

অষ্টম সংসদের মেয়াদ অবসানের পর দলীয় রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে যে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল তা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন বিষয়ক সব বিকল্প নিঃশেষিত না করে গঠন করায় এটি সংবিধান অনুসৃত পন্থায় গঠিত হয়েছিল এমন দাবির যৌক্তিকতা আছে কী? অতঃপর সেনাসমর্থিত যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল সেটি সংবিধানসম্মত পন্থায় গঠিত হয়নি এবং সে সরকারটিকে অদ্যাবধি সংসদে অনুমোদন দেয়া হয়নি। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বাতিলবিষয়ক আপিল মামলার রায়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার অবতারণায় আদালতের মাধ্যমে ওই সরকারের সময়ের কৃতকার্যকে অযাচিতভাবে বৈধতা দেয়া আইনানুগ হয়েছে কি না, এ প্রশ্নটির নিরসন হওয়া জরুরি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেখানে আদালতে সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী অবৈধ ঘোষিত হয়, সেখানে একই আদালত সংসদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে একটি অসাংবিধানিক সরকারের কার্যকলাপকে বৈধতা দেয়ার প্রয়াস নেয়।

এ দেশে একসময় বিএনপি সরকার আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর দাবির প্রতি সম্মান দেখিয়ে একতরফাভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর তীব্র বিরোধিতার মুখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার বিলোপসাধন করে। এ ব্যবস্থাটি বিলোপে যদিও সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়কে উপলক্ষ হিসেবে দেখা হয়, কিন্তু সে রায়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রধান বিচারপতিসহ সাতজন বিচারক সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চারজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে এবং তিনজন বহালের পক্ষে মতামত দেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের পক্ষে মতামতদানকারী চারজনের মধ্যে একজন অবসর গ্রহণের ১৬ মাস পর রায় দিয়ে তাতে স্বাক্ষর করায় দেওয়ানি কার্যবিধির ভাষ্য অনুযায়ী এটি আইন সম্মত হয়েছে কি না, সে প্রশ্ন ওঠে। আর তাতে দেখা যায়, এটি ৩:৩ একটি বিভক্ত রায়। এমন রায়ের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিচারকের শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক নয় কী।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০টি সংসদ নির্বাচনের মধ্যে ছয়টি ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীন এবং চারটি ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার বহির্ভূত সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় এর অধীন প্রথম ও দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ দুটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় এর অধীন দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দু'টি নির্বাচনে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়। জাতীয় পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় এর অধীন তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ দুটি নির্বাচনেও জাতীয় পার্টি দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ী হয়।

পঞ্চম সংসদ নির্বাচনটি কর্মরত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তম ও অষ্টম সংসদ নির্বাচন সংবিধান অনুসৃত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়। নবম সংসদ নির্বাচন সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত হয়। এ চারটি নির্বাচনের কোনোটিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার বিজয়ী হতে পারেনি। উপরোল্লিখিত ১০টি নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনায় যে চিত্র পাওয়া পায় তাতে এ দেশের জনমানুষের আগাম অনুধাবনের অবকাশের সক্ষমতার প্রকাশ ঘটে।

সংবিধানের বর্তমান ব্যবস্থায় সংসদ বহাল থাকাবস্থায় ক্ষমতাসীন দলীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের অধীন আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় সে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এমন ধারণাপোষণ অমূলক।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান নির্বাহী হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিসভায় কে অন্তর্ভুক্ত হবেন, এটি প্রধানমন্ত্রীর একক ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার অধীন বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায়ও প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি ছিলেন। সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সরকার প্রধান ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়টিও প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা পদে বহাল থাকার কারণে তারা সরকারে বহাল থাকাবস্থায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয় লাভে ব্যর্থ হলে সে ক্ষেত্রে তারা ক্ষমতা হতে সরে দাঁড়াবেন এমন নিশ্চয়তা আছে কি?

সংসদ বহাল থাকাবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে একই আসন থেকে একজন সংসদ সদস্য হিসেবে এবং অপর সবাই প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন। এটি একটি অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ ধরনের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমসুযোগ সংবলিত মাঠ সৃষ্টির জন্য কোনোভাবেই সহায়ক নয়। পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের পূর্বে সংসদ

ভেঙে দেয়ার কারণে এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না।

আমাদের সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার বলে কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। দশম সংসদ নির্বাচনের সময় দেখা গেছে, মন্ত্রিসভার আকার ছোট করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনায় নিয়োজিত ছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এরূপ সরকার নিয়োজিত থাকলেও নির্বাচনকালীন সময়ে সরকারের মন্ত্রী পদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন না এবং নির্বাচনী কাজে সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন না। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এ দু'টির কোনোটিরই অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এটি একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত। সংবিধানে বলা আছে নির্বাচন কমিশনারেরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন। আমাদের দেশে এ যাবৎকাল পর্যন্ত দলীয় সরকার কর্তৃক যতগুলো নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে এর মধ্যে একটি ব্যতীত অপর সবই দলীয় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট ছিল। যে নির্বাচন কমিশনটি দলীয় সরকারের স্বার্থ সংরক্ষণ করেনি সেটি কমিশন হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। সাবেক সচিব আবু সাঈদের নেতৃত্বে এ নির্বাচন কমিশনটি ১৯৯৬ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাবস্থায় নিয়োগ লাভ করে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরও এ কমিশনটি বহাল থাকে।

ক্ষমতাসীন দলীয় সরকার কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ দেয়ার সময় বরাবরই লক্ষ করা গেছে কমিশনে দলের নীতি ও আদর্শ এবং নেতৃত্বের প্রতি আস্থাভাজন ছাড়া অপর কেউ বিবেচনায় স্থান পায় না। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ কার্যটি সমাধা করা হলেও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের বাইরে এ নিয়োগে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটানোর আইনগতভাবে কোনো সুযোগ নেই। বিগত একাদশ ও দ্বাদশ নির্বাচন কমিশন গঠনের সময় বাছাই কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকার্য সমাধা করা হয়েছে দেশবাসীকে এমন ধারণা দেয়ার প্রয়াস নেয়া হলেও তা যে প্রধানমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী হয়েছে দেশের সচেতন জনমানুষ এটি অনুধাবনে সক্ষম।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি সরকার সংসদে এ তিনটি দলের অনুপস্থিতিতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারবিষয়ক বিল পাসের সময় এ দেশের সাধারণ জনমানুষ যে এ ব্যবস্থাটির সপক্ষে ছিল সে সময়কার গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে এর সমর্থন পাওয়া যায়। অনুরূপ ২০১১ সালে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও এর জোটভুক্ত দলগুলোর দাবির উপেক্ষায় সংসদে একতরফাভাবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের সময় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে প্রত্যক্ষ করা গেছে জনমানুষের সমর্থন এ ব্যবস্থাটি বহালের সপক্ষে। পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে জনমত যাচাই ছাড়া কোনো আইন প্রণীত হয় না। এ

কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় জনমত এর স্বপক্ষে ছিল এবং বাতিলের সময় জনমত এটির বিপক্ষে ছিল।

জনমত যাচাই ছাড়া কোনো আইন প্রণয়ন প্রত্যাশিত নয়। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবক্তা হলেও জন-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে স্বীয় স্বার্থ রক্ষার মানসে তারা এ ব্যবস্থাটির বিলোপসাধন করেছে। এ অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের সহায়ক নয়। আর তাই ক্ষমতাসীনদেরই দায়িত্ব এমন সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন, যা সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে মসৃণ পালাবদলের নিশ্চয়তা দেয়।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

নয়া দিগন্ত, ০৫ নভেম্বর ২০১৮

> গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, পররাষ্ট্রনীতি, দেশের উন্নয়ন, ব্যাংকপাড়ার অবস্থা- কোথাও কেউ সুখবর দিতে পারছেন না। সরকারপ্রধান ও ক্ষমতাসীন দলের লোকদের রাজনীতি আছে, তারা যা খুশি বলতে পারেন, মন্তব্য করতে পারেন, প্রতিপক্ষকে শাসাতে পারেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ শোনাতে পারেন। কিন্তু পুরো জাতিকে হতাশায় ঘিরে ধরেছে।

পরিবর্তনের আলামত স্পষ্টতর হচ্ছে

মাসুদ মজুমদার

নির্বাচন কমিশন সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না। যেখানে অবিতর্কিত নির্বাচন কমিশন বা ইসি এবং সিইসি প্রয়োজন, সেখানে বিতর্ক বাড়ছে। যার ফলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি কিংবা নির্বাচন কমিশন এখনো জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারছে না। সরকারের মুখপাত্ররা সিইসি ও নির্বাচন কমিশনকে অবিতর্কিত থাকতে দিতে চান না বলেই মনে হয়। কারণ, সিইসি যা বলেন তা 'সংশোধন' করে দিতে চেষ্টা করেন বর্তমান সরকারের মুখপাত্ররা।

ইভিএম নিয়ে অতি উৎসাহ এবং সেনা মোতায়েন নিয়ে সিইসি যা বলেন; সরকার যেন তার সে বক্তব্যকে সমর্থন করা দায়িত্ব বলে মনে করে। নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ প্রশ্নেও ইসি কতটা দৃঢ়, তা স্পষ্ট হতে পারেনি। কারণ, সরকারি লোকদের চিন্তা-ভাবনা ইসিকে বিশেষ বিবেচনায় নিতে হচ্ছে বলেই জনসাধারণের ধারণা। জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ তথা আরপিও খসড়ার পর্যালোচনা নিয়েও সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে; ঘোষিত রোডম্যাপও অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন করার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণায় এক ধরনের জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সে ক্ষেত্রে ইসি এখনো স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তাই ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, ইসি সম্ভবত নিষ্ঠা নিয়েও

মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারছে না; যেমনটি পারা উচিত ছিল। নির্বাচন কমিশন স্থানীয় প্রশাসনের ওপর কতটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে, সে ব্যাপারেও জনমনে সংশয় রয়েছে। তার বাইরে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ইসির কাজ করার সক্ষমতা নিয়ে আজো জনমনে আস্থা সৃষ্টি হয়নি।

বর্তমান সরকার সারা দেশে বিরাট একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করেছে। এটা অস্বীকার করা যাবে, কিন্তু বাস্তবতা এড়ানো যাবে না। এদের দৌরাত্ম্য নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইসির ভূমিকা এখনো কতটা দৃঢ়, সেটা বোঝা কঠিন। ক্ষমতাসীনেরা নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছেন; অথচ বিরোধী দল ন্যূনতম গণতন্ত্রচর্চার সুযোগও পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে ইসির ভূমিকা এখনো অনেকটা দায়হীন।

আইন নির্বাচন কমিশনকে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষমতা প্রয়োগের সাহস ও সক্ষমতা দেখাতে প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রয়োজন। অতীতেও আমরা লক্ষ করেছি, ইসি নিজের ক্ষমতাটুকু স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না; বরং প্রশাসনের কাছে জিম্মি হয়ে ইসি প্রচুর অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের কথা বাদ দিলেও নির্বাচন কেন্দ্রগুলোর নিরাপত্তা বিধান এবং ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়া সম্ভব হয় না।

ক্ষমতাহীন সেনা মোতায়েন কার্যত কোনো কাজ দেয় না। তাই সেনা মোতায়েন করতে হবে তাদের পর্যাপ্ত ক্ষমতাসহ। নয়তো জাতিকে যেখানে এনে বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা দাঁড় করিয়েছেন, সেখানে একটি গ্রহণযোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা কঠিন।

জাতীয় সংসদের নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, রাজনৈতিক মেরুকরণ ততটা চাঙ্গা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রাজধানীর নাট্যমঞ্চের ঐক্যপ্রক্রিয়া নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই মেরুকরণের ধরন-ধারণের ওপরই জাতীয় নির্বাচন নির্ভর করবে। মিডিয়ায় খবর এসেছে, বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কেউ দুর্ভাবনায় রয়েছেন; কেউ আছেন খোশ মেজাজে। বাস্তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং ভোটারদের মনের ওপর নির্বাচন নির্ভর করবে। তবে নির্বাচন কমিশন যতটা সাফল্য ও যোগ্যতার সাথে আম্পায়ারিং করবে- গ্রহণযোগ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে কি না সেটাই ফলাফল মিলিয়ে দেবে। এটা ঠিক, ভোটারেরা পরিবর্তনের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছে। জাতীয় নেতাদের মনের অবস্থাও তাই। শেষ পর্যন্ত পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ইসির ভূমিকাই মুখ্য হয়ে যাবে।

যে কোনো মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাতে সবার প্রশ্ন একটাই- কী হবে? কী হতে যাচ্ছে? নির্বাচন হবে তো? সেই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে কি না, আবার ৫ জানুয়ারি ধরনের কোনো কিছুর আয়োজন চলছে না তো? এর বাইরেও অনেক প্রশ্ন করা হয়, যা উল্লেখ করা যায় না কিংবা উল্লেখ করলে নানা ধরনের প্রশ্ন উঠবে। আর জবাবই বা কী দেয়া সম্ভব? দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালো নেই। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রে এক ধরনের নৈরাজ্য চলছে। নীতি-নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন না তোলাই ভালো। আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কম কথাই সবার জন্য নিরাপদ। দেশে যখন এমন একটি গুমোট ও অস্বস্তিকর

পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই কোনো বিষয়ে মন্তব্য করা যায় না। তা ছাড়া, পুরো দেশটি এক ধরনের ভীতি ও শঙ্কার রাজ্যে পরিণত হয়েছে। কেউ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একবাক্যে মন্তব্য করতে পারছেন না। রাজনীতিবিদেরা রাজনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে নারাজ। অর্থনীতিবিদেরা শুধু বলেন, সামগ্রিক পরিস্থিতি হতাশাজনক।

গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার, পররাষ্ট্রনীতি, দেশের উন্নয়ন, ব্যাংকপাড়ার অবস্থা- কোথাও কেউ সুখবর দিতে পারছেন না। সরকারপ্রধান ও ক্ষমতাসীন দলের লোকদের রাজনীতি আছে, তারা যা খুশি বলতে পারেন, মন্তব্য করতে পারেন, প্রতিপক্ষকে শাসাতে পারেন। ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ শোনাতে পারেন। কিন্তু পুরো জাতিকে হতাশায় ঘিরে ধরেছে। এ দিকে, নির্বাচনের রোডম্যাপ শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকবে কি না, বলা কঠিন।

জাতীয় রাজনীতিতে নানামুখী সঙ্কট রয়েছে। অসংখ্য ইস্যু রয়েছে। আস্থা-অনাস্থার সঙ্কটও কম নেই। তাই সরকার সঙ্কট ঘনীভূত করার ক্ষেত্রে এখনো কোনো ছাড় দেয়নি। আবার বিরোধী দলও একটা সীমা পর্যন্ত ছাড় দেবে, তার বাইরে নির্বাচনকে এড়িয়ে যেতেও পারে। তবে দেশী-বিদেশী প্রভাবক শ্রেণী এবার আমাদের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বেশ উৎসাহী। এই উৎসাহে যাতে ভাটা না পড়ে সে ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী জোট সমানভাবে সতর্ক থাকার চেষ্টা করার কথা।

এবার বিচারবহির্ভূত হত্যা, খুন, গুম, জেল-জুলুম বেশি মাত্রায় সামনে এসে যাবে। দলবাজির বিষয়টি জনগণ আমলে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা, জনগণ বিগত দিনের দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির সাক্ষী হয়ে আছে। জনগণ প্রত্যক্ষ দেখা এ বিষয়গুলোর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোর্টে যাবে না। প্রতিবাদ করার সুযোগ পায়নি বলে সাক্ষ্য দিতে যাবে না। তবে ব্যালট হাতে পেলে সেটি বাক্সে ফেলার সুযোগ পেলেই হবে।

খালেদা জিয়ার বিষয়টি জনগণের মনে এত বেশি দাগ কেটেছে যে, সেটাই সরকারকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জে ফেলতে পারে। বিচার-আচার নিয়ে জনগণ উচ্চবাচ্য করেনি। করতেও যাবে না। কিন্তু যে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, সেটা ভাবনারও অতীত। তা শাসকেরা এখনো ভাবতে পারছেন না। এখনো শাসকেরা যেদিকে তাকাচ্ছেন, সেদিকেই 'নিজের লোক' দেখতে পাচ্ছেন। সবাই কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন গাইতে চেষ্টা করছে। এটাই যেকোনো স্বৈরশাসক ও একনায়কের দৃষ্টিভ্রম। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে অতীত যতটা স্মৃতিতে আছে, ততটায় মনে হয়- সব একনায়ক একই ধরনের আচরণ করে থাকেন। একই ধরনের ভাবেন। একই ধরনে সব মানুষকে নিজের লোক ভাবতে চেষ্টা করেন। যতক্ষণ না তখত উল্টে যায়, ততক্ষণ তারা শুধু দুর্বিনীত থাকেন না, এতটা বেপরোয়া থাকেন যে, মনে হয় তারা ছাড়া আর কেউ ক্ষমতার যোগ্য নন। প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। যারা আছে তারা তো দুর্বল। ফুৎকারে উড়ে যাবে।

যদিও আমরা কোনো শাসকের ভাগ্য গুনে বলে দিতে পারি না, কার কী পরিণতি হবে বা কখন হবে। এটা বিধাতা নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। তবে জানিয়ে দিয়েছেন- দুর্বিনীত

এবং দুঃশাসক, যারা জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জুলুম করে, তাদের পরিণতি কোনো দিন ভালো হয় না।

এবার বিশ্বপরিস্থিতি ও জাতীয় প্রেক্ষাপট একসাথে পাল্টে গেছে। আঞ্চলিক রাজনীতিতে বোঝাপড়ার ধরনও পাল্টে যেতে শুরু করেছে। এখন আঞ্চলিক রাজনীতিতে আমরা একক খেলোয়াড় নই। খেলোয়াড়ের সংখ্যা শুধু বাড়েনি, আরো বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করে যাবে।

আঞ্চলিক রাজনীতির সাথে বিশ্বরাজনীতির পারঙ্গম অনেক খেলোয়াড় রয়েছেন, যারা তাদের স্থানীয় এজেন্টদের সময়মতো কাজে লাগাবেন এবং ঘুড়ির রশির মতো টানবেন। তাই আগামী জাতীয় নির্বাচন শুধু বাংলাদেশের মাঠের একটা খেলা নয়। এখানে বহু উৎসাহী দর্শক থাকবেন, আম্পায়ার থাকবেন অনেকেই। তা ছাড়া, দেশীয় রাজনীতির অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা বসে থাকবেন না। তারা নতুন করে অঙ্ক কষবেন। তাই জাতীয় নির্বাচন হবে জাতীয় প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের জন্য। এ সত্যটি কেউ মস্তিষ্ক থেকে বাদ দিলে ভুল করবেন।

নয়া দিগন্ত, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮

“

২০০৮ সালে তিনি (হাসিনা) যে রাজনৈতিক চমক দিয়েছিলেন, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনে সারা পৃথিবীতে এমন ব্যর্থ দ্বিতীয় কোন রাজনীতিক পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে বহু স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র ছিল, এখনও আছে কিন্তু এমন জগাখিচুড়ি কেউ কোথাও দেখেনি। শুনেছি, ঝি মেরে বউকে বোঝানো। জজকোর্ট, হাইকোর্টে দেখেছি, অনেকে শত্রুকে বা অন্যকে নাজেহাল করতে নিজের সন্তানকে হত্যা করে। কিন্তু মহাজোট সরকারের আমলে দেখলাম, সরকার হত্যা করে বিরোধীদলের ওপর দোষ চাপায়

”

এ কেমন মন্ত্রিসভা?

কাদের সিদ্দিকী

প্রবাদ আছে, যত গর্জে তত বর্ষে না। সেটাই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রমাণ হলো। আমাদের বহুকালের একটা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল, যা ভেঙে চুরমার, খান খান হয়ে গেছে। এখন আর কোন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বালাই নেই। নেতা-নেত্রীদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই গণতন্ত্র। দেশের জন্মের বেদনার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলাম তারা সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে গিয়ে অন্য মেরুতে পড়ে আছে। এখন যখন যেমন তখন তেমনের পালা। একে একে দুই বা দুইয়ে দুইয়ে চার হয় না। বঙ্গবন্ধু নিহত হলে ঘাতকের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। সে সময় যারা খুনিদের দালালি করেছে, পক্ষ নিয়েছে তারাই বরং ভাল, ফুলে ফেঁপে বটগাছ হয়েছে। আমরা প্রতিবাদকারীরা চিকন হতে হতে একেবারে শুঁটকি। একটানা ১৬ বছর নির্বাসনে ছিলাম। দেশে ফিরে একদিন দেখলাম ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে আওয়ামী লীগ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কি অপরাধ, তিনি পাকিস্তানি দূতাবাসের দাওয়াতে গিয়েছিলেন। এডভোকেট আনিসুল হকের পিতা সিরাজুল হককে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করে করে অবস্থা। লজ্জার খাতিরে তিনি নিজেই ইস্তফা দিয়েছিলেন। সিরাজুল হক আর বঙ্গবন্ধু একই সঙ্গে কলকাতার বেকার হোস্টেলে ছিলেন। শুনেছি, জননেত্রীর জন্মের খবরে বঙ্গবন্ধু বেশ মনমরা ছিলেন। কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, কি বলি ভাই! বাড়িতে বউ রেখে এসেছি। ক'দিন হলো একটি সন্তান হয়েছে। হাত খালি, কি যে করি!

তখন বঙ্গবন্ধুর বন্ধু সিরাজুল হক নেত্রীর জন্য ফতুয়াসহ অন্যান্য জিনিসপত্র কিনেছিলেন। তা নিয়ে বহুপরিশ্রম করে মেয়ের মুখ দেখতে বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন। তখন এখনকার মতো এত সুবিধা ছিল না, এত স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষমতাও ছিল না। সেই এডভোকেট সিরাজুল হক বাদ পড়েছিলেন। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পক্ষে আইনজীবী হওয়ায় এক সময় আওয়ামী লীগ করতে পারেননি। কিন্তু এখন সেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং তার জাতীয়পার্টি আওয়ামী লীগের গলার মালা। এক সময় ভাবাও যায়নি, যে আওয়ামী লীগ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে টেনে নামিয়েছিল, সেই এরশাদ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ওঠাবসা করতে পারে। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যেদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে সেদিন নিশ্চয়ই নুর হোসেন, ডা. মিলন কবর থেকে হাত তালি দিয়েছে। নুর হোসেনের বাবা-মা, ডা. মিলনের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের দোয়ায় আওয়ামী লীগ ফুলে ফেঁপে উঠে নেত্রীর রাজনৈতিক পরিপক্কতা বিশ্বজোড়া প্রসার পেয়েছে। রাজনীতিতে শেষ কথা নেই- এই প্রবাদ এমন ন্যক্কারজনক রূপ নিতে আর কেউ কখনও দেখেনি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে নিয়ে মহাজোট করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সারাপৃথিবীকে দেখিয়েছিলেন সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মহা মিলন হলে কি হয়। বিশেষ করে স্বৈরাচার আর গণতন্ত্রের আচার এক সঙ্গে হলে কি হয়। সে এক দুর্দান্ত স্বাদের বহিঃপ্রকাশ। এক কথায় ২০০৮ সালে তিনি যে রাজনৈতিক চমক দিয়েছিলেন, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচনে সারা পৃথিবীতে এমন ব্যর্থ দ্বিতীয় কোন রাজনীতিক পাওয়া যাবে না। পৃথিবীতে বহু স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র ছিল, এখনও আছে কিন্তু এমন জগাখিচুড়ি কেউ কোথাও দেখেনি। শুনেছি, ঝি মেরে বউকে বোঝানো। জজকোর্ট, হাইকোর্টে দেখেছি, অনেকে শত্রুকে বা অন্যকে নাজেহাল করতে নিজের সন্তানকে হত্যা করে। কিন্তু মহাজোট সরকারের আমলে দেখলাম, সরকার হত্যা করে বিরোধীদলের ওপর দোষ চাপায়। গত কয়েক বছর অন্যায় ভাবে সরকার হত্যা গুম করে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চেষ্টা করেছে। চোরের মা'র বড় গলা শুনেছিলাম, ইদানীং তাও দেখলাম। মানুষ মারা, জ্বালাও পোড়াও এসবের অনেকটাই করেছে সরকার বা সরকারিদলের সমর্থকেরা। কিন্তু চালিয়ে দেয়া হয়েছে বিরোধীদলের ওপর। দারুন দুর্বল বিরোধীদল তার জবাব দিতে পারেনি। নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন- গণমানুষের এই দাবিটাও আদায় করতে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারেনি। এখনও দেশের শতকরা ৯০ জন মানুষ কলুষমুক্ত অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। দুই-তিন শতাংশ ভোটার ভোট কেন্দ্রে যায়নি, তারপরও মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশন ৪০ শতাংশের হিসাব দিচ্ছে। ছাত্র নকল করলে শিক্ষক ফেরায়, কিন্তু শিক্ষকরা করলে কে ফেরাবে? পরিচালনা পরিষদ, গভর্নিং বডি? তারাও যদি দুর্নীতিপরায়ন হয় তাহলে উপায় কি? আসলে খুব একটা উপায় নেই। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর অসততা জমাট বেঁধেছে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচন কাজে কত ম্যাজিস্ট্রেট অংশ নিয়েছিল, তারা যখন বিচার করবেন, তখন তাদের বুকে বাঁধবে না জাতীয় নির্বাচনে ভোট চোরকে তারা সহায়তা করেছেন? পুলিশ, বিডিআর, আনসার ভিডিপি -যাদের চোর-ডাকাতের হাত থেকে দেশের ধন-সম্পদ রক্ষা

করার কথা, তারা যে জাতীয় নির্বাচনে চোরের সাথি হয়েছেন, তাদের বিবেক কি একটুও নাড়া দেবে না? যদি তাদের বিবেক নাড়া না দেয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভাল থাকতে, সৎ থাকতে, সত্য কথা বলতে তারা বলবেন কি করে বা উপদেশ দেবেন কি করে? নিজে অন্যায় করে অন্যকে অন্যায়ে বাধা দেয়া যায় না।

গতবার স্বৈরাচার সঙ্গে নিয়ে তারা জোট করেছিলেন। জোট করে ভোট করেছেন, সেজন্য আল্লাহর বিচারে যা হওয়ার তা হবে। জনতার বিচারেও যে কম বেশি কিছুই হবে না তা নয়। নুর হোসেন, ডা. মিলনের আত্মার অভিসম্পাত আর তাদের পরিবার-পরিজনদের হা-হুতাশ নিশ্চয়ই আল্লাহর আরশ কেঁপে কেঁপে উঠবে এবং পরিণতি যা হওয়ার তা অবশ্যই হবে। কিন্তু এবার নির্বাচন নিয়ে যে বাহানা হয়েছে তার কোন মানে হয় না। মহাজোট এক সঙ্গে নির্বাচন করবেন, সিট ভাগাভাগি করবেন তা নিয়ে কার কি মাথা ব্যথা? কিন্তু এত নকশা কেন? এটাতো কোন নির্বাচন নয়। মহাজোট আগেও ছিল, এখনও আছে। তাদের থাকতে কে মানা করেছে? যে যা-ই বলুন, বাধা বা নির্বাচন বয়কট করার কারণে ভোট কেন্দ্রে যে ভোটার যায়নি এটা শাশ্বত সত্য। ভোটার থাকলে পত্র-পত্রিকায় টেলিভিশন ক্যামেরায় উপচে পড়া ভোটারের ছবি থাকতো। কেন জাতীয় পত্রিকায় কুকুরের ছবি আসবে? কেন মন্ত্রীর ছেলের ৪৭৫ ভোট দিতে আঙুল ব্যথা করবে? কেন প্রিজাইডিং অফিসারকে সরকারের পক্ষে সিল দিতে হবে? এসবই তো নৈতিকতার পতন। শিডিউল ঘোষণার পর পরই বর্তমান সরকার নির্বাচনে হেরে গেছেন। ১৫৩ বা ১৫৪ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতায় নির্বাচন পৃথিবী কখনও দেখেছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের ত্রাণকর্তা উইনস্টন চার্চিল বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেননি। এমন কি নির্বাচনে জয়ী হতেও পারেননি। শুনছি মহাজোটের বা জননেত্রীর প্রধান খুঁটি ভারত। সেখানে লোকসভার ৫৪৫ সিট। আগামী মে-তে নির্বাচন। খোঁজ নিয়ে দেখবেন ক'জন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচন একেবারে তুলার মতো হালকা করে দিয়েছে ১৫৩ বা ১৫৪ জনের বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন। পাঠকরা খেয়াল করবেন, ভবিষ্যতে এই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৩ জনের ১৫০ জনই ফেল করবে। তার মধ্যে জামানত হারাবেন ১২৫ জন। এটা কোন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নয়, কেয়ামত পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না। এখন আবার আরেক বাহানা শুরু হয়েছে। জাতীয়পার্টি একসঙ্গে নির্বাচন করেছে, একসঙ্গে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে, এখন একসঙ্গে সরকারে থাকবে। হঠাৎ জননেতা শেখ হাসিনার খেয়াল হয়েছে সংসদে একটা বিরোধীদল থাকতে হয়। পাতানো সরকার, পাতানো নির্বাচন, শেষ পর্যন্ত পাতানো বিরোধীদল। জনাব আ.স.ম আবদুর রব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের গৃহপালিত বিরোধীদল হয়েছিলেন। এখন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জাতীয়পার্টি শেখ হাসিনার গৃহপালিত সরকার এবং বিরোধীদলে শামিল হলেন- এতে দোষের কি? কতটা শরম লেহাজহীন হলে বলা যায়, আমরা সরকারেও থাকবো, বিরোধীদলেও থাকবো। মানে তারা যা করবেন জনগণ সব মেনে নেবে। হ্যাঁ, এমনটা হয়, হতভম্ব বিরোধীদল থাকলে। দেশের মানুষ কখনও কখনও এরকম হতাশ ও দিশাহারা হলে লোভী চতুররা এমনটাই ভাবে। মূলকথা অবৈধ সংসদে প্রকৃত বিরোধীদল নেই। রওশন এরশাদ সরকারের অনুগ্রহে তথাকথিত

সংসদ সদস্য হয়েছেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় তার মার্কা না থাকায় জাতীয়পার্টির কেউ সঠিক অর্থে নির্বাচিত নন। নানা বর্ণের, রঙের ফানুস হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তার যদি কোন বিবেক বিবেচনা করার বিচারবোধ থাকতো তা হলে আর সবাই শপথ নিলেও সংসদ সদস্য হিসেবে তিনি নিতেন না। কারণ তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছিলেন। আল্লাহতায়ালা সবই দেখেন এবং জানেন। তার আর এই ভাঙা হাটের রঙ করে শপথ নেয়ার মানে ছিলনা। কেন তিনি শপথ নেবেন? তার কথায় যারা পাতানো নির্বাচন করেননি তাদের কি হবে? যে এরশাদকে রংপুরের মানুষ বুকে তুলে নিয়েছিলেন, তার চরম দুঃসময়ে রাজনীতিতে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, সেই জীবনদাতাদের সারাদেশ ও পৃথিবীর সামনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ যতখানি ছোট করেছেন, জল্লাদ হায়েনারাও তার দেশের মানুষকে এভাবে অপমান অপদস্ত করে না। জাতীয়পার্টি সরকারেও থাকবে, বিরোধীদলেও থাকবে- এ যেন মামা বাড়ির আবদার? জাতীয় পার্টিকে সরকারি দলেই থাকতে হবে, বিরোধীদলে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দেশের অবস্থা ভাল না, তাই যা খুশি তাই করছেন। এরকম করলে আগামীতে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের ঝাটা মেরে বিদায় করে দেবে। রাস্তাঘাটে চলা মুশকিল হয়ে পড়বে। বিশ্বপণ্ডিত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ইতিমধ্যেই বলেছেন, মাছের মুড়াও খাবেন, লেজও খাবেন- এটা চলতে পারে না, এটা নৈতিকতা বিবর্জিত। পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য শুনে বড় হাসি পায়। মহাজোটের কার নৈতিকতা আছে? সত্যকে সত্য বলার সাহস কে রাখে? এজগতের বাইরেও যে জগৎ আছে, যেখানে আমাদের সবাইকে যেতে হবে, জবাব দিতে হবে মহান আল্লাহর কাছে- কেমনে রাখছে সে কথা? সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানাবার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে কেউ কেউ মনে করছে বেশ সফল হয়েছেন। সফলতা-ব্যর্থতা চোখের সামনে নয়, আরও একটু দূরে তাকাতে হয়। সামান্য একটু সময় অপেক্ষা করতে হয়। যেভাবে নেতানেত্রীরা দেশের সর্বনাশ করেও উন্নতির কথা বলছেন, তারা কোন দিন উন্নতি চোখে দেখেননি। দিনাজপুরে কর্নাই গ্রামে কতশ'শ' হিন্দু এই শীতের রাতে উন্মুক্ত আকাশের নিচে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তিনি উন্নতি করেছেন। কে অশান্তি সৃষ্টি করছে, কে ধ্বংস করছে তাকে ধরুন, বিচার করুন। অতি সাধারণ দ্বিমতপোষণ করলে যেখানে খন্দকার মাহবুব হোসেনের মতো একজন নির্বাচিত আইনবিদকে মুহূর্তে জেলে ঢোকানো যায়, এমনকি রিমান্ডে নেয়ার সাহস দেখায়- তারপরও বলতে হবে দেশে আইন বলে কিছু আছে? লম্ফঝম্প করে একের পর এক বলেছেন যারা অশান্তি সৃষ্টি করবে তাদের ছাড়া হবে না। ছাড়াতো হবে না বুঝলাম কিন্তু কবে ধরা হবে? কোন বস্তিতে আগুন লাগানোদের ধরতে গিয়ে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ধরা পড়ে- এই তো সমস্যা। যেখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজনৈতিক ফায়দা লুটার আশায় নেতানেত্রীদের নির্দেশে নিজের স্কুলে আগুন দেয়, সেই শিক্ষকের কাছে কোমলমতি ছোট ছোট বাচ্চাদের পড়তে দেয়ার কোন মানে হয়? জেলখানার জল্লাদ যে ফাঁসি দেয়, সে ওই জল্লাদ হেড মাস্টারের চেয়ে অনেক ভাল। কোন জল্লাদ কখনও তার ছেলের গলায় ফাঁসির রজ্জু লাগিয়ে টেনে ধরে না। তা হলে হেড মাস্টার কেন, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর জন্য নিজের স্কুলে আগুন দিলো? এমন ঘটনা তো আরও অনেক ঘটেছে। ধরা পড়েছে

মাত্র দু'একটা। কত জায়গায় আওয়ামী লীগের লোকেরা বস্তিতে আগুন দিয়েছে, পাড়ায় পাড়ায় আগুন দিয়েছে। গত বছর রামুতে যে বৌদ্ধমহল্লায় সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ড হয়েছে সেখানে থানার ওসিসহ বহু আওয়ামী নেতাদের যোগসাজশ ধরা পড়েছে। আমার কথা নয়, একজন মন্ত্রীর কথা। নির্বাচন পরবর্তী যে ক'টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকটাতে প্রশাসনের লোকজন দুই-তিন ঘণ্টা পরে গেছে। তবে কি সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর জ্বালাও পোড়াও করে সরকার তাদের প্রতি মানুষের সিমপ্যাথি অর্জনের চেষ্টা করছে? ব্যাপার মোটেই ভাল নয়। তাই সময় থাকতে তথাকথিত নির্বাচন বাতিল করে কে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলো কে করলো না, জনগণ অংশগ্রহণ করলো কি না সেটা বিবেচনায় এনে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে একটি নির্বাচন করুন। বিদেশী প্রেসক্রিপশন অনুসারে দুই দল বা দুই নেতার দেশ নয়। দেশের মালিক ১৬ কোটি জনগণ। আজ তারা ঘুমিয়ে আছে অথবা নির্বিকার। সেই জন্য হঠাৎ বাবুদের এত দাপট। দেশের মালিক জনগণ একবার গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালে তথাকথিত নেতানেত্রীদের দূরবিন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ জননেত্রীর জীবনের সব থেকে বড় রাজনৈতিক কলঙ্ক।

আজকের খবর, ১৬ জানুয়ারি ২০১৪

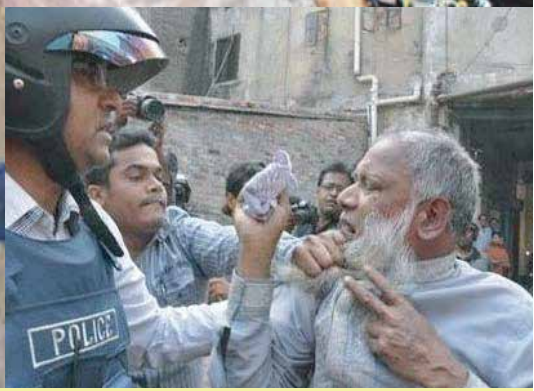

ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড

“

হঠাৎ একটি মাইকে বলা হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন নামাজ পড়ছেন। ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটা বাজে। প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী) বললেন, আরে থামো, এখনও আসরের ওয়াক্তই হয় নাই। একটু পরে বলো। একথা শুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করলেন।
(আমার ফাঁসি চাই, পৃষ্ঠা নং: ১৫০)

”

আওয়ামী সরকারের যতো ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড

এম এস চৌধুরী

ভোটবিহীন নির্বাচনে গঠিত সরকার পাঁচ বছর অতিক্রম করল। উন্নয়নের ধুয়া তুলে ঘুমপাড়ানী মাসিপিসির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলো পাঁচটি বছর দেশবাসীকে। না, গান গেয়ে নয়– Gun এর ভয়ে তটস্থ রেখে। মানুষ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখল তাদের পতনের ঘটনা।

ক্ষমতাকে নির্বিঘ্ন করতে সকল স্বৈরাচারী সরকার বাহিনীর ওপর নির্ভর করে থাকে। শেখ হাসিনা সরকার আরো বেশি সুচতুর, আরো বেশি কৌশলী- তারা শুধু বাহিনী নয় জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, আদালতকেও করায়ত্ত করে বিরোধী দল ও মতের লোকদের ওপর দশটি বছর চালিয়ে গেছে নির্যাতন- নিপীড়ন। মানুষ হত্যা, গুম, সম্পত্তি দখলসহ নানা অবিচারের এতটুকু সুবিচার কোথাও গিয়ে পায়নি। দেশের সর্বোচ্চ আদালাতের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার পরিণতি বলে দেয় কিভাবে আইন আদালতকে কুক্ষিগত করেছে এ সরকার। সিনহা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বিদেশ

থেকে তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন- ব্রোকেন ড্রিম। ঐ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন কিভাবে আওয়ামী লীগ সরকার আদালতকে আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। কিভাবে একের পর এক ফরমায়েশি রায় আদালতকে দিয়ে সরকার করিয়ে নিয়েছে। তিনি বলেছেন- যে দেশে প্রধান বিচারপতির নিরাপত্তা নেই- সে দেশে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী, তা ব্যাখ্যা করে বলার কী আছে?

আওয়ামী লীগ ২০০৮ এ বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে প্রথম টার্গেট হিসেবে শনাক্ত করে আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী। কারণ তারা জানে তাদের অন্যায়, দেশ বিক্রি করার নীতি, দুর্নীতি, লুটপাটের কর্মকাণ্ড দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী চেয়ে চেয়ে দেখবে না। যাতে তারা বাধা না দিতে পারে, বাধ সাধতে সাহসী না হয়- সেজন্য বিদেশী নীল নকশায় ' পিলখানা হত্যাকাণ্ড' ঘটনাটি সংঘঠিত করা হয়। র‍্যাব থেকে সেনাকর্মকর্তাদের বিডি আর- এ বদলি করা এবং শেখ হাসিনার দরবারে অনুপস্থিত থাকা প্রমাণ করে না পিলখানায় ঐ দিন ৫৭ সেনা কর্মকর্তার জঘন্য হত্যার নকশা পূর্বেই করা হয়েছিল? বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সমরেও এতো সেনা কর্মকর্তার জীবনহানি ঘটেনি। এমনকি সমকালীন পৃথিবীর কোন যুদ্ধে এক সঙ্গে এতো সংখ্যক সেনা কর্মকর্তার মৃত্যুর ইতিহাস পাওয়া যায় না। এটা ছিল শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে একটি মেসেজ- আমরা যা যা করব তোমরা নীরবে দেখে যাবে, কোন উচ্চবাচ্য করা যাবে না। যদি করো, পরিণতি পিলখানার মতোই হবে। সেনাবাহিনীকে নৈতিকভাবে দুর্বল করে দেয়া ছিল উদ্দেশ্য। এরপর দ্বিতীয় টার্গেট হিসেবে শেখ হাসিনা সরকার বেছে নেয় ইসলাম ইসলামী দল নির্মূল করা। শেখ হাসিনা মুখে মুখে ইসলামের কথা বললেও তার পা চাটা গণমাধ্যমের কিছু দালাল সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী শেখ হাসিনার 'ধর্মপ্রেম' সম্পর্কে নানা গালভরা বুলি প্রচার করলেও প্রকৃত অর্থে তা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার ও ছলনা ছাড়া কিছু নয়। শেখ হাসিনার ধর্ম নিয়ে ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার কি রকম তা মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টুর লিখিত গ্রন্থ 'আমার ফাঁসি চাই' পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যায়। যদিও বইটি এখন দুষ্পাপ্য। তাই একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি-

"বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালের শেষ মুহূর্তে ধানমন্ডি ৫ নাম্বার রোডের ৫৪ নাম্বারের বাড়িতে ওঠেন। ৯৫ সালের জানুয়ারির প্রথম থেকেই জোরসোর ভাবে লাগাতার আন্দোলন সংগ্রাম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি শুরু করলেন। দুপুর দু'টায় টঙ্গি থেকে মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো। .....

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে হবে। হঠাৎ একটি মাইকে বলা হল জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হল জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন নামাজ পড়ছেন। ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটা বাজে। প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী) বললেন, আরে থামো, এখনও আসরের ওয়াক্তই হয় নাই। একটু পরে বলো। একথা শুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করলেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা নিশান পেট্রোল জীপের বড় বড় জানালার গ্লাস খুলে নামাজ পড়তে শুরু করলেন।" (আমার ফাঁসি চাই, পৃষ্ঠা নং: ১৫০)

এ রকম অনেক ঘটনা ঐ গ্রন্থে লেখক বর্ণনা করেছেন যার দ্বারা শেখ হাসিনার ধর্মপ্রীতি যে শুধুমাত্র লোক দেখানো এবং মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য তা নিশ্চিতভাবে অনুধাবন করা যায়।

২০০৮ এ ক্ষমতায় এসে শেখ হাসিনা নির্ধারণ করলেন দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতার জন্য হুমকি হতে পারে ইসলামী দল। সবদল নয়, যেসব দল ইসলামের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায়, পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম করতে চায়, যাদের জনগণের মধ্যে ভিত্তি রয়েছে। যারা সুসংগঠিত এবং সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, সে হিসেবে তারা জামায়াত ইসলামীকে এক নম্বর টার্গেট বানালো। তারা লক্ষ্য করেছে স্বাধীনতা যদ্ধে ভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তা পোষণ করা দলটি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দ্রুত নিয়মতান্ত্রিকভাবে জনগণের সমর্থন লাভ করেই চলেছে। একদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা এবং জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশ নিয়ে জনগণের ভোটে সংসদে প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর মাধ্যমে নতুন স্রোতধারা সৃষ্টি করছে দলটি। উল্লেখ্য,স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে বহু দলীয় শাসন ব্যবস্থা পুন: প্রবর্তন হলে ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচনে মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) ২০টি আসন লাভ করে যা পূর্বতন দল জামায়াতের প্রতি জনগণের আস্থার উজ্জ্বল উদাহরণ বলা যায়। এরপর ১৯৮৬ তে তৃতীয় জাতীয় সংসদে জামায়াত ইসলামীর নামে ১০টি ১৯৯১ তে পঞ্চম জাতীয় সংসদে ১৮টি এবং ২০০১ এ সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৭টি সংসদীয় আসন লাভ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় জামায়াতের প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা।

জামায়াতের প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা অর্জন বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় দলটির। পিলখানায় ৫৭ সেনা কর্মকর্তা হত্যার ঘটনা হজম করে আওয়ামী লীগ সরকার দ্বিগুন উৎসাহে নেমে পড়ে ইসলাম ও ইসলামপন্থী দলকে নির্মূল করতে। একে একে জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে কটুক্তি ও নাশকতার অভিযোগে আটক করে। পরে একাত্তরের মানবতা বিরোধী অপরাধে সাজানো মামলা রুজু করে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালে বিচার কার্যক্রম শুরু করে। জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীসহ শীর্ষ পাঁচ নেতাকে ঐ সাজানো মামলায় ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়। জামায়াতের সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযম আজীবন কারাভোগের শাস্তি চলাকালীন অসুস্থ অবস্থায় মারা যান। অপর জামায়াতের সিনিয়র নায়েবে আমির বর্ষীয়ান নেতা মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বিচারাধীন অবস্থায় জেল হাজতে মারা যান। বিএনপির আরেক বর্ষীয়ান নেতা আবদুল আলীমও বিচার চলাকালে জেলে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া আরও কয়েকজন জামায়াতের শীর্ষ নেতার বিচার শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এদেরও যে কোন সময় চূড়ান্ত রায় দিয়ে একই পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়া হতে পারে। বিগত দশ বছরে জামায়াতকে নির্মূল করতে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে আটক, জেলহাজতে ঢুকানো, নির্যাতন, রিমান্ড, পুলিশি হয়রানি অব্যাহত রয়েছে। অথচ এসব বিচার কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মহল প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তারা রায় পুনর্বিবেচনা

করতে অনুরোধ করেছে।

আওয়ামীলীগের এই নির্যাতন নিপীড়ন থেকে রক্ষা পায়নি বিএনপিও। দলটির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে অর্ধশতক কালের আবাসস্থল (যা সরকার কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত) হতে এক কাপড়ে বাস্তুচ্যুত করে তাঁর দুই প্রবাসী পুত্র তারেক রহমান ও মরহুম আরাফাত রহমানের ওপর নানা মামলা রুজু করে এবং বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে অভিযুক্ত করে আওয়ামী সন্ত্রাসের যাত্রা শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ বেগম খালেদা জিয়া গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে জেল হাজতে আছেন। বিএনপির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিক সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী (মুসলিম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরীর পুত্র) যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালে বিচারে মানবতাবিরোধী সাজানো মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। বি এনপি নেতা এম ইলিয়াস আলী, সালাহ উদ্দিন আহমেদসহ বহু নেতাকর্মীকে গুম, হত্যা ও জেল হাজতে আটক করা হয়।

সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী মুসলিম লীগ হতে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এবং ভারতের আগ্রাসী নীতির একজন কঠোর সমালোচক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার তাদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে দেশের জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলগুলোকে নির্মূল করার নীল নকশা নিয়ে এগোতে থাকে। তাদের আরো একটি বড় লক্ষ্য- এদেশের যুব সমাজকে বিপদগামী করা। ইসলাম বিদ্বেষী হিসেবে গড়ে তোলা। নৈতিকতা, চরিত্র যাতে বিনষ্ট হয়, তারা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে- দেশের ভালো নিয়ে চিন্তা করতে না চায়- ইসলাম থেকে দূরে সরে আসে সেজন্য নৈতিক অধ:পতনের সকল রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। মুখে মাদকবিরোধী বক্তব্য দিয়ে আইওয়াশ এবং মাদক দমন অভিযান পরিচালনা করলেও 'ইয়াবা' 'গাজা' ফিনসিডিল এর মরণ নেশা দ্রব্যের স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলার জন্য বদিদের দ্বারা সকল প্রবেশ পথ রাখা হয়েছে উন্মুক্ত। একজন তরুণ মরণনেশার কবলে একবার আটকে পড়লে সে কখনো ইসলামের ধারে কাছে ভিড়তে পারে না। পারে না সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে। দেশের রাজনীতিতেও সে কোন ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে না। ফলে দেশের ক্ষমতায় কে আসলো, কে থাকলো, দেশ কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে, ভিন্ন দেশের আগ্রাসনে দেশ কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে- এসব দেখা যখন যুব শক্তির ছিল একান্ত অপরিহার্য, সেই যুব সমাজের এক বিরাট অংশকে নেশায় ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবন যেভাবে দিন দিন ধ্বংসপ্রায় তেমনি দেশ ও জাতিও সমূহ ধ্বংসের মুখে, তা দেখার তাগিদ তাদের নেই। এভাবে দেশের আগামী ভবিষৎ দিন দিন অন্ধকারের অতল গহবরে হারিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হিসেবে দাবি করে। যদিও তাদের কর্মকাণ্ড কখনো ধর্মনিরপেক্ষতা প্রমাণ দেয় না। নির্বাচনের সময় এলে আওয়ামীলীগের ইসলামপ্রীতি উছলে উঠে। 'হেফাজতে ইসলাম' নামে অরাজনৈতিক ইসলামী দলের সঙ্গে ২০১২ ও ২০১৩ তে যে আচরণ করেছিলো তা দেশ বিদেশের মানুষ ভুলে যায়নি। রাতের অন্ধকারে রাস্তায় আলো নিভিয়ে যে পৈশাচিক হামলা চালিয়ে হত্যাকাণ্ড চালানো হয় তা আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের জ্বলন্ত উদাহরণ।

সেই হেফাজতে ইসলামকে নিয়ে নতুন খেলায় নেমেছে আওয়ামী লীগ আসন্ন জাতীয় সংসদ ২০১৮ এর নির্বাচনকে সামনে রেখে। ভোটের জন্য 'তেঁতুল হুজুর' নামে ব্যঙ্গ করা আল্লামা শফি হুজুরকে দিয়ে শেখ হাসিনার 'কওমি জননী' উপাধি গ্রহণ করা- এসব নাটক এখন দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ২০০৮ এ বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশে ওয়াজ মাহফিল কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। ১৫ আগস্টে মসজিদের ইমাম 'জাতির পিতা' উল্লেখ করে মোনাজাত না করায় গ্রেফতার ও জেলহাজতে প্রেরণ করার ঘটনা একটি দু'টি নয় বহু সংঘটিত হয়। মসজিদ, মাদরাসাকে নিয়ন্ত্রণ, কওমি মাদরাসাগুলোকে জঙ্গী তৈরির আস্তানা হিসেবে মন্তব্য, দাড়ি-টুপিওয়ালাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে নাজেহাল করার নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা প্রমাণ করে আওয়ামী সরকারের ইসলাম বিদ্বেষী নীতি। সরকারের আজ্ঞাবাহী নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিয়েছে আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত কোন ইসলামী জলসা, মাহফিল করা যাবে না। গান, বাজনা, নাটক ইত্যাদি সব করা যাবে, যাবে না শুধু ইসলামী মাহফিল? আওয়ামী সরকারের ইসলাম বিদ্বেষী নীতির প্রকাশ সংবিধান সংশোধনের মধ্য দিয়েও প্রমাণিত। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট মুন সিনেমা হলের মালিকানা নিয়ে দায়ের করা একটি রীটের শুনানী শেষে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে। যদিও ঐ সংশোধনীতে বৈধতা দেয়া ১৭৪টি অধ্যাদেশের মধ্যে মাত্র দু'টি বাদ দিয়ে ১৭২টিই রেখে দেয় সরকার। কিন্তু সংবিধানের মূলনীতি থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' কথাগুলো তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি প্রতিস্থাপন করে সরকার। অথচ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে কোরআন সুন্নাহ পরিপন্থী কোনো কাজ না করার অঙ্গীকার করেছিল। (সূত্র দৈনিক, আমার দেশ, ৩০ অক্টোবার ২০১৩)

আজ সময় এসেছে এসব বুঝে আসন্ন নির্বাচনে সঠিক ভূমিকা নেয়ার। নানা চক্রান্ত চলছে, চলছে ভিতরে ভিতরে আওয়ামী লীগকে তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় নিয়ে আসার তৎপরতা। প্রতিবেশি দেশ থেকে প্রচার করা হচ্ছে- বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী দেখতে চাই। তার মানে প্রতিবেশি দেশ মুখে মুখে যতো বলুক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমরা কোন হস্তক্ষেপ করবো না। একটা নিরপেক্ষ অংশীদারিত্ব ও সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা দেখতে চাই। আর আমরা বলতে চাই- সাধু সাবধান! তৃতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ শাসন কায়েম হলে দেশে মুসলমান ও ইসলামের অবস্থা কি করুণ হবে তা কল্পনা করাও কঠিন!

সংখ্যালঘু নির্যাতন

“

সংখ্যালঘুদের দুরাবস্থার জন্য দায়ী কি শুধুই তারা? যতবারই রামুর ঘটনা ঘটে, জঙ্গিদের নাড়ি-নক্ষত্র জানার পরও কামরুল আর মায়ার মতো লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিএনপি-জামায়াতের ওপর। এই আচরণ একমাত্র জঙ্গিরাই করে, তাহলে আওয়ামী লীগ কি জঙ্গি! আগুন আসলেই কারা দেয়, একমাত্র অন্ধ ছাড়া মিডিয়ার কল্যাণে ১৭ কোটি মানুষ দেখেছে, কিন্তু তার পরও সব দোষ জজ মিয়ার।

”

সংখ্যালঘুদের শাপমোচন কি হবেই না

মিনা ফারাহ

ম্যালকমের অমিয় উক্তি: মনটা যখন খুব খারাপ থাকে, সিভিল রাইটস আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ ‘ম্যালকম এক্সের’ একটি উক্তি আমাকে বাঁচিয়ে দেয়– ‘তুমি কারাগারে গিয়েছ কি না প্রশ্ন করে কী লাভ, যে মুহূর্তে তুমি কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে জন্মেছ তোমার জন্মই হয়েছে কারাগারে।’ যখন আমার দক্ষিণা কালীমন্দিরসহ পৈতৃক বসতভিটাটি দখলের উদ্দেশে স্থানীয় ভূমিদস্যুরা রাজনৈতিক দানবদের সহায়তায় এর বিক্রি এবং হস্তান্তর বন্ধ করতে ট্রাইব্যুনালকে ব্যবহার করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ইনজাংশন দিলো তখন আমিও মনে করেছিলাম, যে দিন সংখ্যালঘু পরিবারে জন্মেছি সে দিনই আমাদের ভাগ্যে নির্যাতন নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন করে কী লাভ! রামু, রমনা কালীমন্দির, বিশ্বজিতের মতো সাম্প্রদায়িক ঘটনাগুলোর জন্য বিচার পাওয়ার আশা সংখ্যালঘুরা ৬৭ বছরেও করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। ’৭১-পরবর্তী ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলনে কোনো সরকারই জনগণের মতামত আমলে নেয়নি, বরং নিজেদের সুবিধামতো সংবিধানে যোগ-বিয়োগ করে এমন সব স্ববিরোধী শব্দ চাপিয়ে দিয়েছে, যাতে সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গিবাদ দুটোই ফুঁসে উঠেছে। রমনা কালী থেকে পাকশি, বহুপ্রজাতির সংখ্যালঘুদের

দেশে ৪৩ বছর ধরে গণতন্ত্রের নামে যে পরিমাণ সাম্প্রদায়িকতা হয়েছে, বিশ্বে নজিরবিহীন। অন্যেরা যারা অত্যাচার করে, ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করে না, ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। যা লিখেছি শুনে নয়, বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তথ্য-উপাত্তনির্ভর। শাসকগোষ্ঠী বারবার অস্বীকার করলেও বিষ্ঠার গায়ে ঢাকনা দিলে লাভ হয় না, প্রতিদিনকার মিডিয়াই প্রমাণ। সমস্যাটি দুই দেশের সীমান্ত। মাইগ্রেশনের অন্যতম কারণ নির্যাতন, নির্যাতনের মূলে ভূমি দখল। তাই যত দিন না ভূমি সমস্যার সমাধান চাইবে দিল্লি, তত দিন পর্যন্ত কোনো ডিপ্লোমেসিতেই নির্যাতন বন্ধ হবে না। সুজাতা-সুষমারা কেন সমাধানের বদলে সমস্যা, বুশ বিধ্বস্ত ইরাকের মতো আরো কয়েক দফা ঘা খাওয়ার পর টের পাবে বাংলাদেশীরা। সুজাতা ডিপ্লোমেসির কারণেই এরশাদকে সিএমএইচে রিমান্ডে নিয়ে ৫ জানুয়ারির নির্বাচন আদায়। আমেরিকার নাম বিশ্বপুলিশ, কিন্তু পোস্ট কলোনিয়াল ভারতে বাংলাদেশের পুলিশ দিল্লি। ফরেন পলিসি বিষয়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা এতটা স্থূল বলেই টকশোগুলোর ভয়ঙ্কর চেহারা। দিল্লি মনে করুক, কিন্তু সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ নয়। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যালঘুরা কেন লঘু হতে হতে প্রায় মূল্যহীন, সেই আলোচনাই করব।

২০০১ সালে ১২ হাজার মাইল দূরে বসে যখন প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর পেতাম, জোট সরকারের পতন চেয়েছি। স্যাটেলাইটের কল্যাণে এবার সরাসরি দেখছি সংখ্যালঘু নির্যাতন আরো কত নৃশংস! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনী একই নির্যাতন চালাত ইহুদিদের ওপর। রমনা কালী থেকে পাকশি, যতই দেখছি, প্রমাণ হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে তিন টার্ম আওয়ামী শাসনামলে এরা কত বেশি সাম্প্রদায়িক, এদের ওপর দ্বিতীয়বারের মতো ভর করেছে নাৎসি আদর্শ। ভূমিই সংখ্যালঘুদের এক নম্বর শত্রু। এই শাপমোচন কোনো সরকারের আমলেই হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না, কারণ দিল্লি-ঢাকা এদেরকে মানুষই মনে করে না। ৬৭ বছরে বাংলাদেশের প্রায় ৭ শতাংশ জমি অর্পিত হওয়ার মূলেও তাই। সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ভূমিদস্যুরা এতটাই বেপরোয়া, যেকোনোভাবেই হোক, উচ্ছেদের মাধ্যমে দখলই ওদের কাজ, এভাবেই স্বাধীন বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে মাফিয়া শ্রেণী, এই পদ্ধতিতেই প্রায় পাঁচ লাখ মুরগি ব্যবসায়ী রাতারাতি মিলিয়নিয়ার হয়েছে। জোট সরকারের আমলে সংখ্যালঘু নির্যাতনের মূল উদ্দেশ্য ভূমি দখল হলেও মহাজোটের আমলে সেটা ভূমি এবং নির্বাচন দুটোই দখল। ৬৭ বছরে ওপারের সংখ্যালঘুরা বেড়েছে কয়েকগুণ, এপারের সংখ্যালঘুরা সঙ্কুচিত হতে হতে প্রায় অদৃশ্য। পাকিস্তানের ২৪ ভাগ সংখ্যালঘু কমে ১ ভাগ হওয়ার কারণ ওরা সাম্প্রদায়িক, কিন্তু আমাদের অসাম্প্রদায়িক দেশে বারবার জঙ্গি হামলার মতো ঘটনাগুলো ঘটছে কেন? বুঝলাম জোট সরকার খারাপ, কিন্তু তিন টার্ম আওয়ামী আমলে লাখ লাখ হিন্দু কেন ভারতে গেল, আসুন গোড়ায় খুঁজি।

জায়োন বনাম বাংলা ভূমিদস্যুরা : জায়োনদের কবলে পড়ে ফিলিস্তিন আর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অবস্থা এক ও অভিন্ন। দুই দেশেই দখল, উচ্ছেদ, হত্যা। পার্থক্য একটাই, এখানে সাম্প্রদায়িকতা হয় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আর জায়োনরা খোলামেলাই বলে

মুসলমানেরা তাদের শত্রু, জঙ্গিবাদ নিয়ে আমাদের মতো মিথ্যাচার নেই। এ দিকে মমতা-হাসিনার সংখ্যালঘু দরদের একমাত্র উদ্দেশ্য, ভোট। শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ সংখ্যালঘুর পশ্চিমবঙ্গে কোনো ঝুঁকিই নেবেন না মমতা। তবে মোদির পুশব্যাকের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ ঘোষণা বনাম তিস্তার পানি আটকে দেয়ার মধ্যে 'স্যাটানিক' চরিত্র। শক্ত মেরুদণ্ডের সংখ্যালঘুদের দেশে বাবরি মসজিদের ঘটনার পর গুজরাটের ঘটনা হিন্দুত্ববাদী মোদিকে সমান বিতর্কিত এবং জনপ্রিয় করেছে; কিন্তু হিন্দুদের আওয়ামী নির্ভরতার কোনোই কারণ নেই, সেই পরিমাণ ভোটও তাদের নেই। তবু আওয়ামী প্রীতির মূলে বরাবরই এই গোষ্ঠীকে ভুল বোঝানো হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ ছাড়া এরা এতিমতুল্য। ফলে এরাও কী ভীষণ কাপুরুষ, দেশপ্রেমহীন, ৫০ বছরেও মেরুদণ্ড সোজা হলো না। শতাব্দীর নতুন ক্রীতদাস, সব অধিকার একটি দলের পায়ে সমর্পণ করে হাতে-পায়ে অদৃশ্য শিকল পরেছে। সংখ্যালঘুদের এ দেশে থাকার জন্মগত অধিকারের সাথে যুক্ত হয়েছে ভোটের ১০০ ভাগ শর্ত। ভোট দিলেও জ্বালাও-পোড়াও, না দিলেও। ম্যালকমের কথাই ঠিক, জন্মই হয়েছে বাংলাদেশে নির্যাতনের প্রশ্ন করে কী লাভ! ৪৩ বছরেও স্পষ্ট নয়, কে ধর্মনিরপেক্ষকে জঙ্গি। অসাম্প্রদায়িকতার মুখোশে 'জঙ্গিবাদের' উপস্থিতি কেউই লক্ষ করছে না। এই গণতান্ত্রিক জঙ্গিবাদ বর্তমান সরকারের নতুন আবিষ্কার। তবে খালেদাকে এ জন্য ধন্যবাদ, অন্তত খুব বেশি জোরগলায় 'ধর্মনিরপেক্ষতার' দাবিটি তিনি কখনোই করেননি, বরং আদর্শের অবস্থানে মুসলমান জাতীয়তাবাদ স্পষ্ট। তার মানে এই নয়, তিনি অসাম্প্রদায়িক নন। তবে এই দফায় যা ঘটল, কেষ্ট বেটাকে চিহ্নিত না করাটা বিএনপির জন্য মারাত্মক ভুল। ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে মন্দির ভাঙা এবং জ্বালাও-পোড়াওয়ের ঘটনাগুলো জনসম্মুখে তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল বিরোধী দলের। এত প্রমাণ হাতে রেখেও খালেদা কেন নীরব, অন্তত আমার বোধগম্য নয়। তাদের উচিত উন্নত বিশ্বের মতো অপরাধগুলো ফাঁস করা। ডিজিটাল যুগে সব সম্ভব।

ভাওয়াল এস্টেটের দান করা রমনা কালীর ভূমি দখলে রাখা, বৌদ্ধবিহারে আগুন, মালোপাড়া, কালশী প্রমাণ হলো সংখ্যালঘুরা কত বেশি মূল্যহীন ও অস্পৃশ্য। পুড়ে কাবাব হলেও ভোটের অভিশাপ থেকে মুক্তি নেই, ৫ জানুয়ারিকে কেন্দ্র করে যা ঘটল, জঙ্গিদের বারবার চিহ্নিত করছে মিডিয়া, কিন্তু কী লাভ? রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় আরো সক্রিয় ভূমিদস্যুরা অধিক অপরাধে লিপ্ত। বহু নাটকের পর খালেদার হুঁশ ফিরেছে, তবে মা দুর্গা গজে নাকি ঘোড়ায় চড়ে বাংলাদেশে আসবেন, সেটাও বলে দেন হাসিনা। আর মমতার নামাজিদের সাথের ছবি পত্রিকায়, বিশাল হাজী ক্যাম্প বানিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে সি-অফ করেন। এসবের উদ্দেশ্য কখনো ভোট, কখনো জমি কিংবা দুটোই। ভারতীয় সংখ্যালঘুদের অবস্থা এ দেশের মতো নিকৃষ্ট না হওয়ার কারণ ভিন্ন আলোচনা। আমাদের জন্য ম্যালকমের কথাই ঠিক, এ দেশে হিন্দু হয়ে জন্মালে নির্যাতনের জন্য বিশাল কারাগারে জানমাল দুটোই বিছিয়ে রাখতে হবে। ৬৭ বছর ধরে প্রত্যেক শাসকের আমলেই সংখ্যালঘু নির্যাতন ধাপে ধাপে বেড়েছে। তবে বারবার মন্দির ভাঙার ঘটনা ৬৫-কেও হার মানিয়েছে। তখন বিরতি দিয়ে ভাঙত, এখন বিরতিহীন। উর্দিপরা শাসকেরা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কখনোই মিথ্যাচার করেনি। পরিত্যক্ত বাড়িঘর, মন্দিরে

তালা দিয়ে ঘোষণা করেছে শত্রু সম্পত্তি; কিন্তু উদির বদলে এবার শাড়িপরা শাসকেরা সংখ্যালঘু নির্যাতন হলেই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রোপাগান্ডা চালায়। আর এ কাজটিতে আওয়ামী লীগ অনন্য ও অদ্বিতীয়।

৬৪-৬৫তেও এত সংখ্যালঘু নির্যাতন দেখিনি। তখন পানাম সিটি, নোয়াখালী, বরিশাল, পুরান ঢাকার মতো দাঙ্গার ঘটনাগুলো সীমিত আকারে, বরং অধিক হিন্দু দেশ ছেড়েছে '৭১-এর পর। প্রফেসর বারকাতের বইটিতে অর্পিত সম্পত্তি আর মাইগ্রেশনের ভয়াবহ পরিসংখ্যানগুলো ৬৭ বছরের নির্যাতনের বিশাল ক্যানভাস। আমাদের সমস্যা আমরা এমন অশিক্ষিত, গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রকে খদ্দের বনাম স্বামীর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছি। আমাদের চোখে স্বৈরতন্ত্রই এখন গণতন্ত্র। আর সেই সুযোগেই ফেরাউনরা এতটা অত্যাচারী। আমরা জানি, এপারের হিন্দুরা বরাবরই মেরুদণ্ডহীন; কিন্তু কেন এমন হলো, দিল্লি কখনোই জানতে চায়নি। বাস্তবে দেখা গেছে, একমাত্র আওয়ামী শাসনামলেই সংখ্যালঘু নির্যাতকেরা অসম্ভব বেপরোয়া হয়েও সরকারের আনুকূল্য পায়। এরা জাদুর কাঠি দিয়ে বোঝাতে পেরেছে একমাত্র আওয়ামী লীগই সংখ্যালঘুদের বন্ধু, বাকিরা শত্রু।

বাস্তবে '৭১-এর পর আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম মাঠে। অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণার মাধ্যমে তত দিনে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুটপাট করা শেষ। রমনা কালী থেকে পাকশি প্রতিটি ঘটনার উদ্দেশ্যই ভূমি দখল। সংখ্যালঘুদের গায়ের জোরে দুর্বল বানিয়ে ওরা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হওয়ায় দেশত্যাগের সাথে ভূমি দখলের পরিসংখ্যান প্রায় সমান। বিশ্বায়নের যুগে বাংলাদেশের ভূমির মূল্য আকাশচুম্বী, ম্যানহাটনের চেয়ে বেশি। সুতরাং সংখ্যালঘু উচ্ছেদ করে দখলই রাতারাতি মিলিয়নিয়ার হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়। '৭১-পরবর্তী রানা প্লাজার মতো হঠাৎ গজে ওঠা গার্মেন্ট শিল্প যার ভিত্তিই প্রতিযোগিতা দিয়ে অর্পিত সম্পত্তি দখল। প্রায় ৯০ ভাগ শিল্পকারখানার জমিই হয় পানির মূল্যে, নয় দখলকৃত। প্যালেস্টাইনিদের ভূমিও ক্রমাগত দখল করে বসতি গড়ছে জায়োনিস্টরা আর রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদ করে ভূমি দখলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বুদ্ধবাদীরা। মৌন থেকে আশকারা দিচ্ছে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী অশান্তির রানী, অং সান সুকি। বলছি, সংখ্যালঘু নির্যাতনের আন্তর্জাতিক ক্যানভাসে '৭১-পরবর্তী বাংলা জায়োনিস্টরা ইহুদিদের চেয়ে কোন অংশে কম? তুলনামূলকভাবে এ দেশের ইতিহাস অনেক বেশি জটিল ও সাম্প্রদায়িক। রানা প্লাজার দখল করা জমি নিয়ে ভিকটিম পরিমল বাবুর কত কেচ্ছা-কাহিনী মিডিয়ায় এলো, কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চেতনার সরকার কোনটার বিচার করল? সংবিধানকে স্ববিরোধী বানিয়ে জঙ্গিবাদের মুখোশে এভাবেই চলছে নির্যাতন।

ক এবং খ তফসিলের রচনা : উর্দিপরা ৬৪-৬৫ বুঝি, কিন্তু '৭১-পরবর্তী সংখ্যালঘুদের অনিরাপত্তার ব্যাখ্যা চাই। দেশ বিভাগের পরও এই অঞ্চলে ভূমির মালিক বলতে তখন সংখ্যালঘুরাই। '৭১ শেষ হতেই চামচিকার দেশে হাতেগোনা ভুঁইফোড় বিলিয়নিয়ার শিল্পপতিদের একেকজনের দখলে হাজার হাজার বিঘা, কারো পকেটে আশুলিয়া-গাজীপুরের বিরাট অংশ। কারো অর্ধশত গার্মেন্ট, কেউ আবাসন ব্যবসার টাকা রাখতে সুইস ব্যাংকে দৌড়ায়, কেউ পাঁচ হাজার বিঘা দখলে রাখতে নামমাত্র বুদ্ধাশ্রম আর

হাসপাতাল বানিয়ে রেখেছে। আমার প্রশ্ন, এই সম্পত্তি কি পৈতৃক সূত্রের? '৫০-এর আইনে সরকারের দখলে বিপুল খাস জমির পর একদা হিন্দু মুখরিত দেশটিতে '৬৫-এর শত্রু সম্পত্তি হজম করা শেষ না হতেই '৭১-এর মাইগ্রেশনকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় দফায় অর্পিত সম্পত্তি লুটপাটের শিরোমণি ব্যবসায়ী সংসদ সদস্যরা, সংখ্যায় যারা প্রায় ৮৫ ভাগ, ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতি করে। পশ্চিমের বাঘা পত্রিকাগুলো আমাদের শিল্পপতিদের লুটপাটের খবর ছাপায়। সংসদে বাংলা দাউদ ইব্রাহিমদের স্বার্থে ইচ্ছামতো আইন যোগ-বিয়োগ হয় যেমন, ক. এবং খ. তফসিলের আইন। যে উদ্দেশ্যে আইন বানানো হলো, সাথে সাথে বুমেরাং। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর মতো প্রায় পাঁচ লাখ মামলার সৃষ্টি হলে মাইনাস হলো খ, বাকি থাকল ক। ক-এর তেমন মুরোদ নেই যত দিন না গডফাদাররা থাকবে কি থাকবে না মীমাংসা হয়। এই মীমাংসা জীবনেও হবে না, কারণ সর্ষের মধ্যে ভূত। ঢাকা থেকে শ্রীপুর যাওয়ার পথে ভাওয়াল রাজার এই যে হাজার হাজার বিঘা সরকারের দখলে, একদা হিন্দু অঞ্চল আশুলিয়া বা সাভার যেতে ডানে-বাঁয়ে যা কিছু, এই যে লাখ লাখ সরকারি বাড়ি, অফিস-আদালত এবং জবরদখল মালিকানা কাদের জমি? ফিলিস্তিনিদের ভাগ্য ভোগ করেও হিন্দুরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমায় আর ক্রমাগত অস্তিত্বের পে লড়াই করে জিতে যাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, ক্যাপিটাল হিলের চোখে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, স্থান হয়েছে জাতিসঙ্ঘে। এই যে শত শত মালোপাড়া আর সাঁথিয়ার ঘটনা, কী করতে পেরেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সংগঠন? এরা ব্যস্ত আত্মপ্রচারে। এদের ধর্মীয় চর্চায় ঢাকের শব্দ আছে, ধর্মের শক্তি নেই। কয়েক দিন আগে টেলিভিশনে দেখলাম, এক চ্যানেলের মালিক নাকি ভাওয়ালের ১৫০ বিঘা জমি দখল করেছেন। আমি আর আশ্চর্য হই না কারণ, বিলিয়নিয়ার ভূমিদস্যুদের কাবে সব ক'টা গডফাদার না হলে '৭১-পরবর্তী প্রায় পাঁচ লাখ মুরগি ব্যবসায়ীর এত দ্রুত সম্পদ কী করে সম্ভব? আর সংসদে মিনিটে জনগণের ৪৮ হাজার টাকা ধ্বংস করে সিলমারা গডফাদারদেরকেই সমর্থন জোগাচ্ছে শাড়িপরা উর্দি শাসকেরা। কুলাঙ্গারদের রক্ষার্থে এমন সব বক্তব্য রাখছে, সুবিচার প্রয়োগে আদালত পর্যন্ত বিব্রত। ইহুদি বংশোদ্ভূত বাম চিন্তাবিদ নোয়াম চমোস্কি বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রের নামে পশ্চিমারা সবচেয়ে বড় ডাকাত, এদের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে কখনো শান্তি আসবে না।' আমি বলব, সংখ্যালঘু ইস্যুটি নিয়ে আমি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যেকোনো রথী-মহারথীর সাথে বিতর্কে যেতে রাজি। আমি জানি, আমি জিতব এবং ওরা হারবে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে কারো দেনা-পাওনা নেই।

৬৭ বছরে ওরা খুব ভালো করেই জেনেছে কিভাবে সংখ্যালঘু নির্যাতন করতে হয় (বাঙালি-অবাঙালি)। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকেরা যখন মন্দিরে দাঁড়িয়ে অসাম্প্রদায়িকতার ভাষণ দেন, ১০ হাজার মাইল দূরে বসেও আমার প্রচণ্ড হাসি পায়, কখনো কখনো রাগে গায়ে যন্ত্রণা হয়। ওরা ইংরেজদের মতো সুবিধাবাদী, এই ইস্যুতে কথা বলার যোগ্যতা নেই। আজ পর্যন্ত রমনা কালীকে '৭১-পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে না দিয়ে, মা দুর্গা গজে কিংবা উটে চড়ে বাংলাদেশে এলে সংখ্যালঘুদের কী লাভ? দেবী থাকবে কোথায়? তার তো স্থায়ী একটি ঘরও নেই। অর্থাৎ বিএনপি নয়, বরং আওয়ামী লীগই এ দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জনক। রমনা কালী দিয়ে শুরু, পাকশী দিয়ে

আপাতত শেষ। কংগ্রেস সরকার আমাদের সর্বনাশ করেছে, প্রণব মুখার্জিদের উসকানিতেই ৫ জানুয়ারির নির্বাচন ও নির্যাতন দুটোই ঘটেছে। তারা যদি নির্বাচন পণ্ড না করত, মালোপাড়া, সাঁথিয়ার ঘটনা কখনোই কেন ঘটত না আমি সেই বিতর্কে যেতে রাজি। মুজিবই সর্বপ্রথম রমনা কালীর ভূমিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলে আজ পর্যন্ত সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত। এই উদাহরণ সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে বড় প্রতীক, যা জামায়াত-শিবিরের গলায় আছে বলে দাবি করতে পারবেন না মুনতাসীর মামুনরা। 'সরকার আওয়ামী হলে মন্দিরটি আজ পর্যন্ত কেন রাষ্ট্রের দখলে, কে জানতে চায়?'

এ দিকে বাবরি মসজিদ ভাঙার পরও সাম্প্রদায়িক মোদিকে সঙ্গত কারণেই ভোট দিয়েছে শক্ত মেরুদণ্ডের সংখ্যালঘুরা। আর ক্ষমতায় থাকার জন্য মরিয়া হাসিনা যখন প্রতিটি ধর্মীয় নির্যাতনের পরেই বিচারের বদলে কোটি টাকার চেক নিয়ে হাজির হয়ে যান, আমি তখন এপারের মেরুদণ্ডহীনদের জন্য বিজেপির মতো আদর্শের রাজনীতির প্রয়োজন অনুভব করি। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণেই ওপাড়ের সংখ্যালঘুরা আরো বেশি উজ্জীবিত, মোদিকে চেক-ব্যালেন্সে আসতে বাধ্য করেছে। ভোটের আগে বিজেপি তার ভুলের জন্য মা চেয়েছে; কিন্তু এত বড় সাম্প্রদায়িক ঘটনার পরও আমরা কি আজ পর্যন্ত বলতে শুনেছি, 'রমনা কালীমন্দির ফিরিয়ে না দেয়ার জন্য দুঃখিত! বলতে পেরেছি কি, স্থায়ী মন্দির না হওয়া পর্যন্ত একটি ভোটও নয়'! কয়েকটা বড় পোস্টে চাকরি আর সুরঞ্জিত মার্কা মন্ত্রী বানালেই কি ইতর অবস্থা ঢাকবে? বিষয়টি এমন, এ দেশের সংখ্যালঘুরা পালিত শূকরের মতো, এদেরকে দিয়ে যা খুশি করানো সম্ভব। এই যে সারা দিন মাইকে ঘোষণা দিয়ে রামু-উখিয়ার দুর্ঘটনা ঘটাল, বিএনপি-জামায়াত যদি সত্যিই জড়িত থাকে তাহলে বিচার করল না কেন? হাসিনার সরকার তো আদালতপাড়ায় যেতে যেতে গিনিস বুকের রেকর্ড ভেঙেছে। অর্থাৎ হাসিনা জানেন (মহামতি লেনিনের ভাষায়), খোঁয়াড়ের সব ক'টা শুয়োরই তাদের।

দায়ী কে? সংখ্যালঘুদের দুরবস্থার জন্য দায়ী কি শুধুই তারা? যতবারই রামুর ঘটনা ঘটে, জঙ্গিদের নাড়ি-নক্ষত্র জানার পরও কামরুল আর মায়ার মতো লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিএনপি-জামায়াতের ওপর। এই আচরণ একমাত্র জঙ্গিরাই করে, তাহলে আওয়ামী লীগ কি জঙ্গি! আগুন আসলেই কারা দেয়, একমাত্র অন্ধ ছাড়া মিডিয়ার কল্যাণে ১৭ কোটি মানুষ দেখেছে, কিন্তু তার পরও সব দোষ জজ মিয়ার। আমি কোনো দলের নই, কিন্তু আজ আমার একটি নৈতিক প্রশ্ন আছে। '৭১-পরবর্তী জামায়াত-শিবির যদি রমনা কালীর জমি দখল করে নিজের ঘরে রিফিউজি বানিয়ে রাখত, ঘাদানির মতো লাখ লাখ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কী ব্যাখ্যা করত? মন্দিরের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস না করার জন্য বহু তদবির সত্ত্বেও '৭২-এর সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে জমিটি পার্কের হাতে কেন হস্তান্তর করল, উত্তর আওয়ামী লীগ কোনো দিনও দিতে পারবে না। তাহলে কে সাম্প্রদায়িক, কে গণতান্ত্রিক? এমনকি শিবির পর্যন্ত রমনা কালীর জমি দখল করেনি। অসাম্প্রদায়িক দেশে একটি রমনা বা বৌদ্ধবিহারের ঘটনা সরকার উৎখাতের জন্য যথেষ্ট বিস্ফোরক। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন গুম করতে কারা নির্যাতন করল, বিষয়টি দিনের আলোর মতো

পরিষ্কার হওয়ায় বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপানো আর বিষ্ঠার গায়ে ঢাকনা দেয়া সমান। একমাত্র নির্যাতনের মাধ্যমেই তারা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছে অর্থাৎ সারা বিশ্ব জানল সংখ্যালঘু নির্যাতন করেছে বিরোধী দল। মন্দির ভাঙা কিংবা হিন্দুসম্পত্তি জ্বালিয়ে দিলে কিছু মানববন্ধন হয়, বানকি মুনকে চিঠি লেখে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নামের অপদার্থ সংগঠনটি, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কিছু ঢেউটিন এবং কয়েক বান্ডেল টাকা দেয় সরকার, সেই সাথেই শেষ করে দেয় বিচারের প্রয়োজন। অন্যথায় হেটক্রাইমের জন্য ৪০-৫০ বছরের জেল হবেই। মিডিয়ায় বহুবার দেখেছি ছাত্রলীগ, এমপি-মন্ত্রীদের নেতৃত্বে জঙ্গি স্টাইলে জ্বালাও- পোড়াও। এর পরেও যারা নিজেকে অসাম্প্রদায়িক দাবি করে, অবশ্যই মুখোশধারী। তাহলে এই দেশে কি সংখ্যালঘুরা আর থাকবে না? এ দেশ হিন্দুশূন্য হলে গডফাদারদের লাভ। গত সাড়ে পাঁচ বছরে সংখ্যালঘুদের ওপর এই পরিমাণ বুলডোজার চালানোর উদ্দেশ্যই তা-ই। আর এই সুযোগে প্রতিপক্ষকেও নির্মূল করা, অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি। সরকার যখন কাউকে জঙ্গি বানানোর জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে তখন আসল জঙ্গিদের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন, আর এই ঘোড়া রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশ।

অস্বীকারের উপায় নেই, ৬৭ বছর ধরেই সব সরকারই কম-বেশি সাম্প্রদায়িক। ৪৩ বছরেও স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি সংখ্যালঘুদের। ভুলে গেলে চলবে না প্রায় ৮৫ ভাগ সংসদ সদস্যই ব্যবসায়ী, ব্যবসার ফাঁকে সময় পেলে রাজনীতি করে, মিলিয়নিয়ার হওয়ার জন্যই রাজনীতিতে আসে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মাফিয়া হওয়ার সুযোগ না থাকলে দেশের সাথে এই পরিমাণ বেঈমানি তারা করত না। '৭১-পরবর্তী অবাঙালিদের জমি ভূমিদস্যুদের জন্য আরেকটি চমকপ্রদ সুযোগ হওয়ায় অসম্ভব পৈশাচিক কাণ্ড ঘটছে। কালশীর ঘটনা কারা ঘটিয়েছে, ভদ্রলোকদের আমরা চিনি। মূলত হিন্দুরা ভারতে পালিয়ে গেলেও জেনেভা ক্যাম্পেই ৪৩ বছর অমানবিক জীবন ভোগ করছে অবাঙালিরা। ক্যাম্পের বিষাক্ত জীবন নিজ চোখে দেখেছি, ৮ বাই ৮ ঘরে গাদাগাদি করে চার প্রজন্ম, মরলে ঠিকমতো লাশ বের করার জায়গা পর্যন্ত নেই। দিন যতই যাচ্ছে, হিন্দু-বিহারি বাছ-বিচার নেই, ভূমিদস্যু জায়োনিস্টদের হাত ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। পার্থক্য একটাই, স্টেটলেস বিহারিদের কেউ নেবে না; কিন্তু ভারতে যাওয়া হিন্দুদের অবস্থা জামাই আদরের মতো। সীমান্ত পার হলেই রেশনকার্ড এবং ভোটার হওয়ার সুযোগ, জ্যোতি বসু এবং মমতারা এ দেশের সংখ্যালঘুদের সর্বনাশ করেছেন। '৬৫-এর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও '৭১-এর পর রিফিউজিদের বিষয়ে গান্ধীর এমন উদাসীনতার কারণ কলোনিলিয়ানিজম, প্রমাণ ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি। তাদের কারণেই এপারের সংখ্যালঘুরা হতে এখন প্রায় মূল্যহীন।

এসব বলার অন্যতম কারণ, পুশব্যাক নিয়ে ধর্মীয় উগ্রবাদী নেতা মোদি আর মমতাহীন মমতার বাকযুদ্ধের অন্তরালে শুধুই ক্ষমতা। বরং সুষমার সফরের অন্যতম প্রোপট হতে পারত, সবার আগে মাইগ্রেশন নিরুৎসাহে ঢাকার সাথে আলোচনা। এ ছাড়াও অত্যাচারিত হিন্দুদের তালিকা তো দিল্লির হাতে আছেই। শুদ্ধ রাজনীতি করলে পুশব্যাকের প্রয়োজন হয় না, বরং পরিত্যক্ত হিন্দুসম্পত্তি এবং ভুয়া মালিকানায় লাখ লাখ বিঘা এনবিআরের মাধ্যমে ভূমি অফিসে তালিকা বানিয়ে জন্মগতভাবে দেশত্যাগী নাগরিকদের স্বদেশে

পুনর্বাসিত করা। দেশজুড়েই যখন লাখ লাখ একরের ছিটমহল, ১৫ হাজার একরের জন্য যুদ্ধ করে কী লাভ? বাংলাদেশের জমির দাম ম্যানহাটনের চেয়ে বেশি আর এটাই হিন্দুদের অভিশাপ। মোদির উচিত সে দিকেই দৃষ্টি দেয়া, অন্যথায় মূল্যহীন সংখ্যালঘুরা ক্ষুদ্র হতে হতে বিলীন হয়ে যাবে।

বস্তি আর ক্যাম্পে আগুন: অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেয়ার চেষ্টা সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের জন্য যথেষ্ট, ফলে মুরোদে না কুলোতে পেরে খ তফসিল বাতিল। ক তফসিলটি এখনো বাতিল হয়নি, কিন্তু এর তেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। তবে এর অন্তর্ভুক্ত যারা (বাঙালি-অবাঙালি) সবাই এই সুযোগের অধিকারী। প্রশ্ন হলো, দেশ অসাম্প্রদায়িক হলে এসব ঘটনা ঘটছে কেন? রামু-উখিয়ার পর কালশীর ঘটনা যদি চোখ না খোলে, কিছুই খুলবে না। পরিত্যক্ত জমির ওপর বস্তি এবং জেনেভা ক্যাম্পগুলোতে বারবারই আগুন লাগার কারণ উচ্ছেদ ও ভূমি দখল। সংসদে এবং বাইরে দুইখানেই গডফাদাররা যত দিন খেতে পারবে, সরকার তত দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে। আমার বিবেচনায়, আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার বাক্যবাণ চতুর্থ পর্যায়ের ক্যান্সারের মতো। ইলিয়াস মোল্লা আর শামীম ওসমানদের মতো গডফাদাররা প্রকাশ্যে জঙ্গিবাদ করেও সমর্থন পাচ্ছেন সংসদের। কালশীর আগুনে ইলিয়াস মোল্লার সম্পৃক্ততা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো বারবার বস্তিতে কেন আগুন লাগে। এই বদমাশ গডফাদারের নদী দখলের সংবাদ পত্রিকায়। ১২ খুনের বিচারসাপেক্ষে খুনি ইলিয়াস মোল্লার ফাঁসি না হওয়ার কোনোই কারণ নেই, বরং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আগে এসব জঙ্গির বিচার হওয়া উচিত। ৪৩ বছর আগের ঘটনায় চাক্ষুষ প্রমাণ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রামু-পাকশীর ঘটনার সাথে জড়িত জঙ্গিদের প্রমাণ ক্যাপিটল হিল থেকে ইইউ পার্লামেন্ট পর্যন্ত বিস্তৃত। জায়োনিস্টরাও এভাবেই বারবার ফিলিস্তিনিদের জমি দখল করে ইহুদিদের জন্য বাড়ি বানায়, মোল্লারাও সেই গোয়ালের গরু। ঘটনা ঘটামাত্র তদন্ত চলছে, কমিটি গঠন মুখস্থ রাবিশ। শুনছি ইলিয়াস মোল্লা বিহারিদের সাথে সমঝোতায় যেতে চায়। এই যখন সরকারের অবস্থা, তখন দাউদ ইব্রাহিমদের দোষ কোথায়! বিএনপি-জামায়াত জোট মন্দির ভাঙলে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু কালশী-মালোপাড়ার ঘটনাও কি প্রমাণ করতে হবে?

ঢাকাডাইজেস্ট, ১৭ জুলাই ২০১৪

“একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকারই দিবে, তা পাশের কোন অমুসলিম রাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদেরকে কী কী অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয় না, তার পরোয়া না করেই দেবে। এ কথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামের চেয়ে অধিক ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে অন্য কোনো ব্যবস্থা সে জটিলতার সমাধান করেনি। বাংলাদেশে হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ জৈন বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তারা স্বাধীনভাবে রুজি- রোজগার করেন, পূজা-পার্বণ করেন এবং স্বাধীনভাবে তাদের সকল অধিকার নির্বিঘ্নে ভোগ করে আসছেন”

সংখ্যালঘুদের নিয়ে আওয়ামী লীগের নষ্ট রাজনীতি

এম আর করিম

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল ধরে বাংলাদেশে সকল ধর্মের মানুষ এখানে সহাবস্থান করে আসছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শতকরা নব্বই ভাগের বেশি মুসলিম হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের অনুসারীরা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। Minori মানে সংখ্যালঘু-অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট জাতিগোষ্ঠী। অক্সফোর্ড ডিকশনারি ও অন্যান্য অভিধান অনুযায়ী একটি মানবসংগঠন, সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র অংশই হচ্ছে সংখ্যালঘু। অর্থাৎ একটি সংগঠন, সমাজ বা রাষ্ট্র যাদেরকে নিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে যদি একাধিক দল বা উপদল থাকে তাহলে সংখ্যার দিক থেকে যারা ক্ষুদ্র তারাই হচ্ছে সংখ্যালঘু। Wikipidia- তে বলা হয়েছে, A minoritz group is a sociological categorz within a demographic. Rather than a relational “social group”, as the term would indicate, the term refers to a categorz that is differentiated and defined bz the social majoritz, that is, those who hold the majoritz of positions of social power in a societz. The differentiation can be based on one or more observable human characteristics, including, for example, ethnicitz, race, gender, wealth, health or sexual orientation.

বাংলাদেশে বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান। বহু ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষেরা দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করে আসছে। সুতরাং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে ধর্ম, জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে এখানে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে :

১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু
২. জাতিগত সংখ্যালঘু
৩. ভাষাগত সংখ্যালঘু এবং
৪. অন্যান্য সংখ্যালঘু

সুতরাং বিভিন্ন বিচারে এর প্রত্যেকটি গ্রুপকে বলা হয় সম্প্রদায়। সম্প্রদায় শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 'পরম্পরাগত ধর্মগত' বিভাগ বা দল' 'গুরু বিশেষের শিষ্যগণ সমাজ বা দল'। 'ইক্' প্রত্যয় যোগে গঠিত সাম্প্রদায়িক শব্দটির অর্থ হচ্ছে, কোনো 'সম্প্রদায় থেকে আগত সম্প্রদায় বিশেষের মতাবলম্বী'।

Communalism এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ধর্মীয়, জাতিগত বা আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতাকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতার অপর বৈশিষ্ট্য হলো অন্য ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা-যা প্রায়ই দাঙ্গায়ও রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ হিসাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের মুসলিমবিদ্বেষ, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্ট-হিড, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় দেশেই কোনো-না কোনো রূপে সাম্প্রদায়িকতার কমবেশি অবস্থিতি রয়েছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতন দেশে দেশে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করছে। বিশেষ করে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক দেশেই মুসলমানরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে নির্যাতিত হয়ে আসছে। ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, মিয়ানমার, চীনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মুসলমানদের ওপর হত্যা, খুন, দেশান্তরিতসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে অহরহ। অথচ মুসলমানদের এই অমানবিক নির্যাতনের ব্যাপারে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা দু-একটা বিবৃতি ছাড়া কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমানে মিয়ানমারে মুসলমানদের ওপর অমানবিক নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। অথচ বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কল্পকাহিনী ও নাটক তৈরি করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভিন্নভাবে চিত্রিত করার অপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সোনালি দেশ

ইসলাম ধর্ম আগমনের পূর্বে এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল না বললেই চলে। কিন্তু মুসলমানদের আগমনের মধ্য দিয়েই এখানে ইসলামের সৌন্দর্য সহনশীলতা

পারস্পরিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও মজবুত করেছে। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হয়। এরই মাধ্যমে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামের বিস্তৃতি ছড়িয়ে পড়ে সমাজের সর্বত্র এবং শাসন ক্ষমতার দায়িত্বভার গ্রহণ করে মুসলমানরা। বাংলার এই জনপদে তরবারি তথা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং একদিকে হিন্দুধর্মের কঠোর জাতি ভেদপ্রথা, ধর্মীয় নির্যাতন-নিপীড়ন, অপর দিকে ইসলাম প্রচারকগণের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন এবং ব্যাপক দানশীলতা, উদার ও সহমরমী মনোভাবই এতদঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাধিক্যের অন্যতম তথা একমাত্র কারণ। ভারতে ইসলাম ধর্মের আগমনের পূর্বে এখানে বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব প্রভৃতি ধর্মমতের অস্তিত্ব ছিল। মুসলমানরা সিন্ধু জয় করে ৭১১ সালে। সেই থেকে ভারতের বুকে মুসলিম শাসকদের শাসন শুরু। ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলায় তুর্কি, পরবর্তীতে পাঠান মুঘলদের শাসন কায়েম হলো। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসকদের শাসন চালু ছিল। ঐতিহাসিক ইলিয়ট লিখেছেন, বিন কাসিম 'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মুখ্য অধিবাসী ও ব্রাহ্মণদের মন্দির নির্মাণ, মসলিমদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্ভয়ে বসবাস ও আত্মোন্নতির জন্য প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিলেন। জিয়াদ আলী লিখেছেন, 'হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের স্নেহ প্রীতির সম্পর্কে মধুর ছিল পারস্পরিক সৌহার্দ্য স্থাপনের নজির সৃষ্টি হয় নবম শতাব্দী থেকেই।

ব্রিটিশরাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে

১৭৫৭ সালে বাংলা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির করতলগত হয়। শাসন ও শোষণের জন্য তারা যে পলিসি গ্রহণ করে তা হচ্ছে divide et impera অর্থাৎ 'ভাগ করো ও শাসন করো'। লর্ড এলফিনস্টোন ১৮৫৮ সালে তিনি 'ভারতের রাষ্ট্রসচিব চার্লস উড ১৮৬২-তে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন যে ভারতের 'জাতিগুলির' অন্তদ্বন্দ্বই ভারতে ব্রিটিশদের শক্তি জোগাবে। তাই 'এই বিভেদকারী শক্তিকে' জিইয়ে রাখতে হবে, কারণ সমগ্র ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে আর কতদিন আমরা টিকে থাকতে পারব?

ভারতে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব

বাংলাদেশের গত একশ বছরের ইতিহাসে চারটি সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছে। এক. ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠন, দুই. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব, তিন. ১৯৪৭ সালে জাতিস্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান অর্জন এবং চার. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ। বিশেষ করে ১৯০৫ সালের ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠন ভারতীয় রাজনীতিতে সৃষ্টি করে এক বড় ধরনের অভিঘাত। কলকাতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত এই নতুন প্রদেশ গঠন ছিল ইংরেজ আমলের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর। কলকাতার বর্ণহিন্দুরা দেড় শ' বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাদের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজদের 'বয়কট'-এর কর্মসূচি নেয়। তাদের সন্ত্রাস ও সহিংসতার আগুনে পুড়ে ছাই হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ। এই সৃষ্ট ঘটনা-প্রবাহের অভিঘাতে নিদারুণ মর্মযাতনা নিয়ে অকালে ইন্তেকাল করেন ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার জাগরণের অন্যতম নায়ক নওয়াব সলিমুল্লাহ।

বিষয়টি হচ্ছে পূর্ব বাংলার ভাগ্যবঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ ঢাকা কেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠনকে দেখেছে তাদের 'ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাত' রূপে। অন্য দিকে ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিরূপে বেড়ে ওঠা কলকাতা কেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকগণ, এ ঘটনাকে মূল্যায়ন করেছেন, তাদের দেড়শ' বছরে গড়ে তোলা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর একটি কঠিন আঘাতরূপে। তাদের ভাষায় এ ঘটনা ছিল এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়। সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষায় এই জনপদকে পিছিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র কম হয়নি। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতে লজ্জাবোধ করেননি। এই অপকীর্তি ঢাকার জন্য ইংরেজরা হিন্দুদের বন্ধু সেজে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক প্রচারযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির নতুন রূপায়ণ ঘটিয়ে তারা হিন্দুদের 'মুক্তিদাতা'রূপে আবির্ভূত হয়। মুসলিম শাসনামলে হিন্দুরা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল বলে তারা নানা প্রকার মিথ্যা ও অলীক কাহিনী প্রচারে লিপ্ত হয়। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের বিভিন্ন নাটক তৈরি করছে। এখন সেই ভারতেই আবার সারা বিশ্বে ফেরি করে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভোটবিহীন হলেও আওয়ামী লীগের কেন থাকা প্রয়োজন তা বিশ্বকে জ্ঞান দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ভারতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখার জন্য কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিজেপি পর্যন্ত সকলেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ একটি চেষ্টা সব সময়ই লক্ষ্য করা যায়। এর উদ্দেশ্য শোষণ ও নির্যাতন বজায় রাখা। জনগণের সাধারণ ধর্মানুভূতি ব্যবহার করার জন্য গান্ধী-নেহেরু থেকে শুরু করে হেগড়ে-বাজপেয়ি পর্যন্ত সকলেই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন জুগিয়ে উসকে দিতে কংগ্রেস সরকার ভারতে এক ঘন সাম্প্রদায়িকতার বার্তাবরণের সৃষ্টি করেছে। এই রাজনৈতিক দর্শন সম্পূর্ণ নিজ দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ক্ষমতার রাজনীতি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ভোটের প্রয়োজনে কখনো হিন্দু কখনো মুসলিম মৌলবাদকে যেমন রাজীব ব্যবহার করেছেন তেমনি খ্রিস্টান ধর্মকেও তিনি বাদ দেননি।

ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণহত্যা

ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও মতবাদ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও দাঙ্গা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। যখন ইংরেজ শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলিছিল তখন দক্ষিণ ভারতে মারাঠা শক্তির পুনর্গঠনকল্পে বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে রায়গড়ে এক বক্তৃতায় বলেন, 'আমাদিগকেও শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ঢাল-তলোয়ার লইয়া অসংখ্য মুসলমান বহিরাগতকে হত্যা করিতে হইবে। যদিও এরূপ যুদ্ধে আমাদেরও কিছু ক্ষতি হইবে, তাহা হইলেও এরূপ স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে।'

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা হাতে পাওয়ার পর বলেই ফেললেন, 'মুসলিমদের এক হাজার বছরের প্রতিশোধ নিলাম।' আর

প্রতিশোধ নেয়ার ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ১৯৪৮ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর রাতের অন্ধকারে মুসলিম ঐতিহ্যের লীলাভূমিখ্যাত স্বাধীন-সার্বভৌম হায়দারাবাদ আক্রমণের মাধ্যমে লাখ লাখ মুসলিম হত্যা, হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রমহানি, শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভারত তার প্রথম রক্তপান উদ্বোধন করে। শত শত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আড়ালে মুসলিম নিধন করতেও ভারত একটুও পিছপা হয়নি। ১৯৪৯ সালের দাঙ্গায় বাংলায় পাঁচ থেকে দশ হাজার, ১৯৫৭ সালের ১৩ আগস্ট করাঁচিতে দুই শ', ১৯৬৭ সালে আহমেদাবাদে ১৯৭৯ সালের ১৪ এপ্রিল জামশেদপুরে একশ' পঁচিশ, ১৯৮০ সালের ৬ আগস্ট মুরাদাবাদে দুই হাজার, ১৯৮৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আসামে দুই হাজার সাত শ' তেত্রিশ, ১৯৯০ সালের ১২ ডিসেম্বর হায়দারাবাদে এক শ' বত্রিশ এবং ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে দুই হাজার মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃত্যখেলায় প্রাণ হারায়। এছাড়া ছোট-বড় আরও অসংখ্য দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

প্রায় ত্রিশ কোটি মুসলিম অধিবাসীর ভারতে একত্রিশ মিলিয়ন (তিন কোটি দশ লাখ) লোকই বাস করে উত্তর প্রদেশে, যা মুসলিম ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একটি রাজ্য। এই একত্রিশ মিলিয়ন মুসলিম বসতির রাজ্যে ফায়েজাবাদ স্থাপত্যশিল্পে পরিপূর্ণ একটি জেলা, যেখানে মুসলিমদের অন্যতম নিদর্শন 'বাবরি মসজিদ' অবস্থিত। ১৫২৭ সালে প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরের নির্দেশে মীর বাকী মসজিদটি নির্মাণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে সম্রাটের নামানুসারে 'বাবরি মসজিদ' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৯৪০ সালের পর একে 'মসজিদে জন্মস্থান' (অর্থাৎ জন্মস্থানের মসজিদ, হিন্দুরা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, এখানে রাম জন্মগ্রহণ করেছেন। আর এটা ছিল বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রথম হাস্যকর ষড়যন্ত্র)। স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার পর এখানে কোন সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও দাঙ্গা হয়নি বা দেখা যায়নি। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এ পর্যন্ত সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় সাড়ে তের হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিয়াছে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের নষ্ট রাজনীতি

বাংলাদেশের (১৯৭১-২০০০) সব সরকারই কম বা বেশি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে ও দিচ্ছে। তা তারা দিয়েছে ও দিচ্ছে 'ভোটের জন্য', 'ক্ষমতায় থাকার জন্য' বা 'ক্ষমতা পাওয়ার জন্য'। অর্থাৎ শাসকশ্রেণী ও গোষ্ঠী না চাইলে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হবে না বরং তার বিলোপ ঘটবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগই বাঙালি-অবাঙালির বিভেদ তৈরি করে জাতিকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত করে চলছে। তাদের উদ্দেশ্য লুটপাট, হিন্দুদের জমি দখল। হিন্দুদের তাড়াতে পারলে অর্থসম্পদ সম্পত্তির দখল আর দেশে থাকলে জোর জবরবস্তি করে ভোট নেয়াই তাদের মুদ্রা দোষে পরিণত হয়েছে। এদেশে সাম্প্রদায়িক বিভেদের পেছনে কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস কাজ করেনি। সবই মূলত ঘটেছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পারস্পরিক হিংসাবিদ্বেষ থেকে। (লুট, সম্পত্তি প্রাপ্তি, সহজে ক্ষমতাশালী হওয়া ইত্যাদি)

এবার সংখ্যালঘু নির্যাতন পূর্ব পরিকল্পিত

'২ জানুয়ারি ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় অগ্নি রায়ের রিপোর্টটিতে তেমন আভাসই মিলেছে। তাতে বলা হয়েছে, 'নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার গঠিত হবে, কোনো কারণে এই সরকার পড়ে গিয়ে যদি জামায়াত সমর্থিত বিএনপি সরকার আসে, তাহলে বিপুলসংখ্যক অনুপ্রবেশকারী মোকাবেলার জন্য ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের অনুসারী দেশীয় মহলও ইনিয়ে বিনিয়ে ঘটনার একই পূর্বাভাস জানিয়েছিল। সরকার সমর্থক বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের অনেকে আগে থেকেই বলে আসছিলেন, নির্বাচনের পর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হবে। বিপুলসংখ্যক সংখ্যালঘু দেশ ত্যাগ করবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা কিভাবে নিশ্চিত হলেন? গত ৫ নভেম্বর ২০১৩ 'হুঁশিয়ার বাংলাদেশ' শিরোনামে বিশিষ্ট কলামিস্ট, কবি, বিশ্লেষক জনাব ফরহাদ মজহার লিখেছেন-'এটা পরিষ্কার যে কোনো না কোনো অশুভ শক্তি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে চায়। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তা খুবই বিপজ্জনক। ইতোমধ্যে অনেকে ঘরে বসে না থেকে রাস্তায় প্রতিবাদ করেছেন, জনগণকে অশুভ বিপদ সম্পর্কে সচেতন করছেন।' সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে এ দেশে একটি হিন্দুও থাকবে না। সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ করার সংকল্প ও সাফল্যের ওপর বিরোধী জোটের রাজনৈতিক সাফল্য নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি হুঁশিয়ার হতে হবে ইসলামপন্থীদের। ঘটনা যারাই ঘটাক পুরা দোষ তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলবেই। ইতোমধ্যে তা শুরুও হয়ে গিয়েছে। জামায়াত-শিবিরের ওপর দোষ চাপানো সাধারণ ফর্মূলা। (সূত্র : নয়া দিগন্ত ০৫-১১-২০১৩)

অপারেশন মাইনোরিটি- সংখ্যালঘু নির্যাতনে কার কী অবদান শিরোনামে : বিশিষ্ট কলামিস্ট মিনা ফারাহ লিখেছেন,

একটি দলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধরে রাখার জন্য সংখ্যালঘু কার্ডটি লাইফ সাপোর্টের মতো জরুরি কেন, বোঝার জন্য আইনস্টাইন হওয়ার দরকার নেই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে প্রমাণ হয়, হিন্দুদের কোনো শত্রু লাগে না, কারণ এরা এদের তিন শত্রু অর্থাৎ 'ভারতপ্রীতি, আওয়ামী নির্ভরতা, মেরুদণ্ডের অভাব', একটিও বুঝতে অক্ষম।' সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় কিছু মিডিয়া বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো মন্ত্রী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের 'কেষ্ট বেটা'– একটাও গ্রেফতার হলো? সুতরাং যা আছে ৯৯ শতাংশ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। জামায়াত-শিবিরকে সন্ত্রাসী দেখিয়ে নিজেদের সন্ত্রাস অব্যাহত রাখার মূলে, একদলীয় শাসন ভুলিয়ে দেয়া। সংখ্যালঘু বিষয়টি বহুমাত্রিক, দায় একা জামায়াত-শিবিরের ওপর চাপিয়ে ভুল করছে সরকার।' (নয়া দিগন্ত, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর হঠাৎ সংখ্যালঘু নির্যাতন কেন?

৫ জানুয়ারি একদলীয় নির্বাচনে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ সংখ্যালঘুদের পরিবারের ওপর হামলা চালিয়ে দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে এই চক্রান্ত চালায়। ফেনীর মালো পাড়ায় সহিংস ঘটনার জন্য তারা নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী শেখ আবদুল ওহাবের সমর্থকদের দায়ী করছেন। জানা

যায়, এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে এই আসনে বিদ্রোহী প্রার্থী ছিলেন তিনি। নির্বাচনের আগেই প্রকাশ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের তাকে ভোট না দেয়ার পরিণতি 'ভয়াবহ হবে' বলে শাসিয়ে দিয়েছিলেন। মালোপাড়া মন্দিরের সামনে নির্বাচনী সভায় স্থানীয় হিন্দুদের অধিকাংশই অনুপস্থিত থাকে। তারা রণজিত রায়কে সমর্থন দিয়েছিলেন।

সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার পর আওয়ামী লীগের বিজয়ী প্রার্থী রণজিত কুমার রায় বলেছেন, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ নেতা ও হুইপ শেখ আবদুল ওহাবের ক্যাডারেরা। অভয়নগর উপজেলা চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক সাংবাদিকদের জানান, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের ইন্ধনে এ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনের পর ওই দিন রাতে দিনাজপুর সদর উপজেলার কর্নাই গ্রামে হিন্দুদের কয়েকটি বাড়ি ও দোকানে ভাঙচুর হয়। আক্রান্ত হয় কয়েকটি মুসলিম পরিবারও। ঘটনাস্থল থেকে শামীম ও কামরুল নামে সরকার সমর্থক দু'জন হামলাকারী যৌথবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। দিনাজপুর সদর আসনের সংসদ সদস্য এবং উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেত্রী জেসমিন আরা জোস্নার অনুরোধে ওদের ছেড়ে দেয়া হয়। এর পরপরই তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা কর্নাই গ্রামে তাণ্ডব চালায়। তারা কর্নাই বাজারের হিন্দু ও মুসলমানদের ১০-১২টি দোকানে ভাঙচুর, লুটপাট এবং গ্রামের বেশ কিছু সংখ্যালঘুর বাড়িতে হামলা চালায়। নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলায় কালীমন্দিরে আগুন দিয়েছে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল খালেকের ভাষ্য মতে, দলের প্রার্থী নির্বাচিত এমপি ছবি বিশ্বাসকে ভোট দেয়ায় নিজ দলের প্রতিপক্ষ গ্রুপের লোকেরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত ফলদা ইউনিয়নে মন্দির পোড়ানোর ঘটনার প্রধান আসামি আওয়ামী লীগের শীর্ষ এক নেতাকে গ্রেফতার না করায় এবং নিরাপত্তাজনিত কারণে নির্বাচন বর্জন করেছে সহস্রাধিক হিন্দু ভোটার। নোয়াখালীর কৃষ্ণপুরে হিন্দুদের ধর্মীয় উপাসনালয়ে হামলার ঘটনায় স্থানীয় পুজা কমিটি আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। পটুয়াখালীর শহরতলী লাউকাঠি বাজারে ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বাহাদুর শেখের দাবিকৃত এক প্যাকেট সিগারেট ও ৫০০ টাকা না দেয়ায় তিনজন হিন্দু ব্যবসায়ীকে মারধর, দোকানপাটে হামলা ও ভাঙচুর করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে সে ও তার ক্যাডার বাহিনী। (সূত্র : আমার দেশ)

৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের পর যখন পশ্চিমা বিশ্ব নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে, তখন সংখ্যালঘু নির্যাতনের একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে এসবের সাথে বিএনপি-জামায়াতকে জড়িত দেখিয়ে এক দিকে পশ্চিমা বিশ্বের সহানুভূতি, অন্য দিকে ভারতে যারা আসন্ন নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় লাভ করতে পারে সেই ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সমর্থন লাভের প্রয়াস চালানো হয়েছে। ভারতের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সমর্থনের পেছনে ভারতের রয়েছে এজেন্ডা। রয়েছে জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ভারত লজ্জিত হয়ে

মোহভঙ্গ হয়েছে। বিশ্বের নজর ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটিয়ে যাচ্ছে।

সংখ্যালঘুদের সম্পদ দখলের যত অভিযোগ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে পরিস্থিতির শিকার হয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে তাদের সহায় সম্পত্তি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলে স্বাধীনতা-পরবরতী সময়ে এর মূল কারণ ছিল আওয়ামী জুলুম, নির্যাতন, লুটপাট আর দখল আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীরাই যে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে এসব সহায় সম্পত্তি দখল করে নেয়। অথচ কোনো সংখ্যালঘুর বাড়িঘর জামায়াতের নেতাকর্মীরা দখল করেছে এমন কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। ইসলাম ধর্মেও অন্যের সম্পদ দখল নিষিদ্ধ তথা হারাম করেছে । এই নির্দেশনা বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা পালন করেন অক্ষরে অক্ষরে। রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সব সময় সংখ্যালঘুদের তাদের নিজস্ব ভোট ব্যাংক হিসেবে মনে করে থাকে। আর তাই অত্যন্ত কৌশলে সংখ্যালঘুদের নিজেদের পক্ষে রাখতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে এর ফায়দা নিতে চায় বিভিন্ন সময়ে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, প্রতিটি সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ রয়েছে।

বিগত ২০০৯-২০১৩ সালের আওয়ামী লীগ শাসনামলের দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মিলবে অতি সহজে। রামু আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনে সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। কক্সবাজারের রামু ও উখিয়ার বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরে ন্যক্কারজনক এই হামলার ঘটনা ঘটে। এই হামলায় ধর্মনিরপেক্ষতার দাবিদার বর্তমান আওয়ামী লীগের সংশ্লিষ্টতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছবির মাধ্যমে আজ দেশের মানুষের কাছে পরিষ্কার। ২৯ সেপ্টেম্বর রাত দশটায় প্রথম মিছিলটি বের হয় রামু উপজেলা আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি আনছারুল হক ভুট্টোর নেতৃত্বে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে- মিছিলটির শুরুতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম হোসেন। তার বা পাশে যুবলীগ নেতার ভাই হাফেজ মোহাম্মদ। এ ছাড়াও হামলায় আরো নেতৃত্ব দেয় উখিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর পুরান ঢাকায় ১৮ দলের ডাকা অবরোধে সরকারের নির্দেশে প্রতিরোধ করার নামে হিন্দু ধর্মের অনুসারী বিশ্বজিৎ নামের এক যুবককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। দিবালোকে টিভি ক্যামেরার সামনে উপুর্যপরি চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় এই হতভাগ্য যুবকে। হিন্দু পরিচয় দিয়েও বর্বর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায়নি দর্জিকর্মী বিশ্বজিৎ! এই ঘটনায় আদালত দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসির আদেশ প্রদান করে ছাত্রলীগের ঐ সকল নেতা কর্মীদের। বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি সংগঠনের এতসংখ্যক কর্মীর এক সাথে আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ এই প্রথম।

২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংখ্যালঘু নির্যাতনের কয়েকটি চিত্র এখানে

তুলে ধরা হলো– ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার বড়মাছুয়া ইউনিয়নের খেজুরবাড়িয়া গ্রামের চার সংখ্যালঘু পরিবারের পানের বরজ ও খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয় সরকার সমর্থকরা।

৫ মার্চ ২০০৯, সাতক্ষীরা সদর উপজেলার যুগিপোতা গ্রামের রবিন মন্ডলের ১২ বিঘা জমির চিংড়িঘের দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা। ১৯ এপ্রিল ২০০৯, দিনাজপুর সদর উপজেলার পাড়বড়ইল গ্রামের ১১৩টি ভূমিহীন পরিবারকে উচ্ছেদ করে জোতদারকে জমি দখল করিয়ে দেয় পুলিশ। এ সময় পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ওইসব পরিবারের ঘরবাড়ি। ২০ এপ্রিল ২০০৯, কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সম্পত্তি দখল করতে গিয়ে অজিত করাতি ওরফে ক্ষীরমোহনকে পিটিয়ে হত্যা করে। এ সময় চারটি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট করে তারা। ২০০৯ সালের মে মাসে সাতক্ষীরার আবাদের হাটের ঘোষাল পরিবারের ৩৮ বিঘা জমি দখল করে নেয় যুবলীগের এক ক্যাডার ও তার সহযোগীরা। ১৪ মে ২০০৯, কালিগঞ্জের উজয়মারিতে ২২টি সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখল করে নেয় আওয়ামী লীগের কর্মীরা। ১১ জুলাই ২০০৯, দোহারের নারিশা পূর্বচর গ্রামে সংখ্যালঘু নৃপেন মালাকারের জমিতে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দখল করে নেয় সরকার দলীয় ক্যাডারা। ২০১২ সাল ৫ মার্চ ২০১২। নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের তিনটি সংখ্যালঘু পরিবারের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। ১৫ মে ২০১২, রাতের আঁধারে মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা ও তার সহযোগীরা উপজেলার পানপুঞ্জির খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কবরস্থান দখল করে ক্রুশ গুঁড়িয়ে দেয়। ২৮ মে ২০১২, সিলেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরে ৩৩ বছরের বন্দোবস্তীয় দোকান দখল করে নেয় সরকারদলীয় সন্ত্রাসীরা। ২৫ জুলাই ২০১২ নরসিংদীর পলাশের চরসিন্দুর গ্রামে শ্মশানের জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের চারটি বাড়িঘর ও মূর্তি ভাঙচুর এবং তাদের বাড়িতে লুটপাট করা হয়। ২২ আগস্ট ২০১২, রাজধানীর সূত্রাপুরের ৯৫ ঋষিকেশ দাস লেনে আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীরা এক হিন্দু পরিবারের বাড়ি দখল করতে তাদের নয় জনকে মারধর, লুটপাট এমনকি পরে তাদের অপহরণ করে। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২, পিরোজপুরের নাজিরপুরে রুহিতলাবুনিয়া গ্রামে মন্দিরের জমি দখল করার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিন মাঝি ও অপর আওয়ামী লীগ নেতা মনোরঞ্জন গোলদার গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১২, মাদারীপুরের রাজৈরের খালিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম সাতপাড় গ্রামে রামমোহন মন্ডলের পূজামণ্ডপে পুলিশ এক তরুণীকে উত্ত্যক্ত করে। পূজারীরা এর প্রতিবাদ করায় মধ্যরাতে এসআই কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের সদস্যরা প্রতিমা ভাঙচুর করে। ২০ ডিসেম্বর ২০১২, সাতক্ষীরার দেবহাটার ঢেবুখালিতে ৩০০ বিঘার একটি ঘের দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। ২০১৩ সাল ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, আওয়ামী লীগ নেতারা চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সংখ্যালঘুদের ওপর চরম নির্যাতন চালায়। ২৭ মার্চ ২০১৩, আওয়ামী লীগের দলীয় মিছিলে যোগ না দেয়ায় কুষ্টিয়া কুমারখালী উপজেলার দয়ারামপুর ঘোষপাড়ায় তিনটি হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা করে এবং ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। ৩১ মার্চ ২০১৩, বগুড়ার

সোনাতলার গড়চৈতন্যপুর গ্রামে পূজামণ্ডপের ৪টি প্রতিমা ভাঙচুর করে যুবলীগ। (১ এপ্রিল ২০১৩, দৈনিক আমার দেশ)। ১০ এপ্রিল ২০১৩, কলাপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায়ের শশ্মান দখল করে নেয় সরকারদলীয় ক্যাডাররা। ২২ অক্টোবর ২০১৩, আওয়ামী লীগের একদল সন্ত্রাসী বন্দুক উঁচিয়ে কাফরুল থানার পুলিশের সামনেই ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী রীতা গমেজের বাড়ির একাংশ দখল করে নেয়। ২ নভেম্বর ২০১৩ পাবনার গাঁথিয়ার বনগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর চালানো হয় অমানবিক নির্যাতন। ৪ ডিসেম্বর ২০১৩, বগুড়ায় যুব লীগ নেতৃবৃন্দ অত্যাচারের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবারকে এলাকা ছাড়া করে। অধিকারের রিপোর্ট মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর ২০১১ সালের জানুয়ারি-মার্চ মাসের রিপোর্টে বলা হয়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের প্রথম সোয়া দুই বছরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর অমানবিকভাবে নির্যাতন হয়েছে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৮১৩ ব্যক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এ নির্যাতনের কারণে ৩ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৭৬৬ জন এবং ৫১টি মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে। ১২ জনের জমি দখল করা হয়েছে, ৪ জনের ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ পরবর্তী ৫ জানুয়ারির একদলীয় ভোটারবিহীন প্রহসনের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য আবারো হামলা চালানো হয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর।

কিন্তু এবারো প্রমাণ হয় আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা। মালোপাড়া, ঠাকুর গাঁসহ বেশ কয়েকটি স্থানে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া পাবনার সাঁথিয়ায় মন্দিরে আগুন দেয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা। জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামীর নির্বাচনী এলাকা হিসেবে এর সাথে জামায়াতকে প্রথমে অভিযুক্ত করা হয়; কিন্তু অল্প সময়েই বেরিয়ে আসে প্রকৃত সত্য। এর পরও একটি স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে কোনো ঘটনায় রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য আদর্শবাদী দল জামায়াতকে জড়ানোর অপচেষ্টা করে আসছে সবসময়। অথচ বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে (জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী এবং জামায়াতের নায়েবে আমীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীসহ) প্রায় প্রতিটি আসনে অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও বিপুল পরিমাণে ভোট প্রদান করে জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের বিজয়ী করেছিলেন ।

কিছু দিন আগে পাবনার বনগ্রামে হিন্দু বাড়িতে হামলা হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান পরিদর্শনে গিয়ে পুলিশ অফিসারকে বলেন, 'মন্ত্রী হয়ে যদি সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেয়, তা হলে সেই মন্ত্রীকে আপনারা প্রশ্রয় দেন কেন? আপনারা মূল আসামিদের বাদ দিয়ে রেখেছেন।' একটি পত্রিকা দেখিয়ে তিনি বলেন, মন্ত্রীর পাশে সন্ত্রাসীরা ঘুরে বেড়ায়। সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড. অধ্যাপক আবু সাইয়িদ চৌধুরী বলেন, সদ্য বিগত স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিলে এবং সন্ত্রাসীরা তার সাথে ঘুরে বেড়ালে পুলিশ কী করবে? ১৩ জানুয়ারি হিন্দু-বৌদ্ধ কল্যাণ ফ্রন্ট সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন-পরবর্তীকালে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য হামলার অভিযোগ করেছে। এসব কথার অর্থ হলো, হিন্দু বাড়ি ও মন্দিরে হামলা তারাই

করে, যারা ধরা পড়লেও ক্ষমতাবানদের আশীর্বাদে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে।

সেনবাগে সংখ্যালঘুর জমি দখল করেছে আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা : থানায় জিডি করেও রক্ষা করতে পারেনি বাবার রেখে যাওয়া শেষ সম্বল ১৪ শতাংশ জমি। স্থানীয় আওয়ামী লীগের ক্যাডাররা জমিটুকু জোরপূর্বক দখল করে সেখানে ইরি ধানের চারা রোপণ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের মতি মিয়ারহাট সংখ্যালঘু দাইয়া বাড়ির এলাকায়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকার নিরীহ সংখ্যালঘুর লোকজন আতঙ্কে দিন অতিবাহিত করছে।

থানায় দেয়া অভিযোগে জানা গেছে, উপজেলার কাদরা ইউনিয়নের হিরাপুর গ্রামের সংখ্যালঘু মৃত রসরাজ চন্দ্র দাসের আহম্মদপুর মৌজার ২১৯৩ নং খতিয়ানভুক্ত ও ৫০৩১ দাগের ১৪ শতাংশ জমি তার পাঁচ ছেলে টকন চন্দ্র দাস, স্বপন চন্দ্র দাস, তপন চন্দ্র দাস, শুপন চন্দ্র ও নিমাই চন্দ্র দাসের নামে ওয়ারিশ সূত্রের মালিক খতিয়ানভুক্ত হয়।

"মহিউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রীর বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের জায়গা দখলের অভিযোগ" চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী বেগম হাসিনা মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের অভিযোগ উঠেছে। বুধবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন নগরীর কে সি দে রোড এলাকার বাসিন্দা ঝিনু রানী বড়ুয়া। (শীর্ষ নিউজ ডটকম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যাচার

জনাব আবুল বারাকাত আওয়ামী ঘরানার একজন অন্যতম বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত। তিনি মৌলবাদী অর্থনীতির গবেষক হিসেবেও পরিচিত। অর্থাৎ সরলীকরণে জামায়াতের অর্থ সম্পদেও খোঁজখবরই বেশ রাখেন তিনি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভট তথ্য দিয়ে চমক সৃষ্টিতেও কম পটু নন। তার রচিত বই 'অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস' সারণি-১৯ এ দেখানো হয়েছে, অর্পিত সম্পত্তি দখলের সময় সর্বোচ্চ সংখ্যক (৩৭%) সুবিধাভোগী মুসলিম লীগের সাথে জড়িত ছিল। আর বর্তমানে (২০০৬) ক্ষমতাসীন বিএনপির সাথে ৪৫%, আওয়ামী লীগের সাথে ৩১%, জামায়াতের সাথে ৮% ও জাতীয় পার্টির সাথে ৬% সুবিধাভোগী সংশ্লিষ্ট। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আওয়ামী লীগের অন্যতম বুদ্ধিজীবী হিসেবে খ্যাত জনাব আবুল বারাকাত তার গবেষণায় ৩১% সম্পত্তি আওয়ামী লীগ কর্তৃক দখল করার হিসাব দেখিয়েছেন। তাহলে সত্যিকার হিসেব করলে দেখা যাবে হিন্দুদের সম্পদ দখলের খতিয়ান তার থেকে কয়েকগুণ বেশি হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সংখ্যালঘু হামলার ৮৩ ভাগে আ'লীগ জড়িত : প্রবীর মিত্র

৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর সারাদেশে যেসব সহিংসতা ঘটেছে সেগুলোর শতকরা প্রায় ৮৩ ভাগেই আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মাইনরিটি পার্টি। শনিবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবের হলরুমে 'সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন এবং তাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের বিচার দাবি' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনে

পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবীর মিত্র এ অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব হামলা হয়েছে তার একটারও বিচার হয়নি। সব রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালিয়ে শুধু ফায়দা লুটেছে। কোনো সরকারের কাছেই সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়। বড় বড় রাজনৈতিক দলে যেসব হিন্দু নেতা রয়েছেন তারা শুধু নিজের জন্য সুবিধা ভোগ করছেন। সাধারণ হিন্দুদের জন্য কিছুই করেননি। (সূত্র : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ জাস্ট নিউজ)

হিন্দুদের ওপর হামলায় আওয়ামী লীগও জড়িত : হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ

বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের বাড়িঘর হামলার জন্য সরকারের দিক থেকে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে এসব ঘটনার সাথে সরকারদলীয় সমর্থকরাই জড়িত। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের একজন নেতা সুব্রত চৌধুরী বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলে সেটা এখন রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের ওপর দোষ চাপানোর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হামলাকারীদের বিচারের আওতায় না আনার একটি সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে। এখন যেমন বলা হচ্ছে জামায়াত-শিবির এটা করেছে। এটা একটা শ্লোগান হয়ে গেছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সব জায়গায় জামায়াত-শিবির করেছে বিষয়টি এ রকম না। অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগের লোকজনও জড়িত হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি।' (উৎস : ১০ জানুয়ারি, ২০১৪ বিবিসি বাংলা)

সংখ্যালঘু নির্যাতনে ডিসিদের চিঠি পেয়ে হতবাক সরকার

দেশের বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অবস্থা জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাচ্ছেন বিভিন্ন জেলা প্রশাসক (ডিসি)। এসব চিঠি পেয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলো রীতিমতো হতবাক। ওইসব চিঠিতে, সংখ্যালঘু নির্যাতনে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের পরোক্ষভাবে দায়ী করা হচ্ছে। এ ছাড়া সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাতক্ষীরা, দিনাজপুর, যশোর ও বাগেরহাট জেলার ডিসিরা সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। (উৎস : ১০ জানুয়ারি, ২০১৪ মানবজমিন)

নাগরিক তদন্ত কমিটির সাতক্ষীরার ক্ষতিগ্রস্ত ২৩টি স্থান পরিদর্শন

যশোর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর জেলার ঘটনা তদন্তে গঠিত নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রুহুল আমিন গাজী এবং সদস্যসচিব ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক কাদের গণি চৌধুরীর নেতৃত্বে কমিটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের তদন্তকাজ পরিদর্শন শেষে কমিটির আহবায়ক রুহুল আমিন গাজী বলেন, 'সাতক্ষীরার যে করুণ দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখেছি তা বর্ণনা করার মতো নয়। নিরস্ত্র মানুষর ওপর সরকারের বৈধ অস্ত্র দিয়ে যেভাবে

নির্যাতন করা হয়েছে, তার বিচার একদিন আল্লাহ করবেন।' (সূত্র : ৩১-০১-২০১৪, দৈনিক আমার দেশ)

ইসলামে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

একটি জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় রাষ্ট্র কাঠামোতে বিজাতীয় লোকদের উপস্থিতি জনিত জটিলতার সমাধান তিন উপায়ে করে। প্রথমত, তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে নিজেদের জাতিসত্তার বিলীন করে নেয়। দ্বিতীয়ত, তাদের জাতিসত্তাকে নির্মূল করার জন্য হত্যা, লুটতরাজ ও দেশান্তরিতকরণের নিপীড়নমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। তৃতীয়ত, তাদেরকে নিজেদের ভেতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখে দেয়। দুনিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই তিনটি কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও গৃহীত হয়ে চলছে। আজকের ভারতে খোদ মুসলমানদেরকে এসব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদেরকে যে অধিকারই দেয়া হয় তা সংখ্যাগুরুর দেয়া অধিকার। সংখ্যাগুরুরা ওসব অধিকার যেমন দিতে পারে তেমনি তাতে কমবেশি করা বা একেবারে ছিনিয়ে নেয়ারও অধিকার রাখে। কিন্তু মৌলিকভাবে যে সমস্ত অধিকার সংখ্যালঘুদের ইসলামী রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাণের নিরাপত্তা

অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনিকে মৃত্যুদন্ড দেন। তিনি বলেন, "যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।" (ইনায়া শরহে হিদায়া, ৮ম খ-) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মিকে হত্যা করে। তিনি খুনিকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হাতে সমর্পণ করা হলে তারা তাকে হত্যা করে। (বুরহান শরহে মাওয়াহিবর রহমান, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৭)

"যে অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দিল আমি তার বিরুদ্ধে বাদি হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদি হবো আমি কিয়ামতের দিন জয়ী হবো।" (তারিখে বাগদাদ)

'যে সংখ্যালঘুকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে স্বয়ং আল্লাহকে কষ্ট দিল।' (তাবরানি আওসাত) হযরত আলী (রা)-এর আদালতে সংখ্যালঘু নাগরিক হত্যাকারী এক মুসলিমকে উপস্থিত করা হলো এবং সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে তার অপরাধ প্রমাণিত হলো। হযরত আলী (রা) হত্যাকারী মুসলিমকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। তাঁর রায় কার্যকর করার মুহূর্তে নিহত সংখ্যালঘুর ভাই এসে বলল, আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। হযরত আলী (রা)-এর প্রশ্ন ছিল লোকটির প্রতি-হয়তো তারা তোমাকে শাসিয়েছে, চোখ রাঙিয়েছে, হুমকি দিয়েছে তাই তুমি একান্ত বাধ্য হয়ে ক্ষমা করতে

এসেছো? জবাবে সে জানালো, না, এ হত্যা ছিল অনিচ্ছাবশত। তারা রক্তপণ (দিয়াত) দিয়েছে। এতে আমি রাজি। হযরত আলী (রা) তখন তার উদ্দেশে বললেন, নিশ্চয়ই তুমি জান, যারা আমাদের নিরাপত্তায় থাকবে তাদের জানের মূল্য আমাদের জানের মতোই। তাদের রক্তপণ আমাদের রক্তপণের মত। (সুনানে কোবরা)। এ ছাড়াও ফৌজদারি দন্ডবিধি, সম্মানের হিফাজত, পারিবারিক বিষয়াদি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উপসনালয়, জিযিয়া ও কর আদায়ে সুবিধা দান, অমুসলিমের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা, বাকস্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশা, চাকরি, অমুসলিমদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়, সামরিক চাকরি থেকে অব্যাহতি ইত্যাদি অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একান্ত দায়িত্ব।

একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদের যে অধিকারই দিবে, তা পাশের কোন অমুসলিম রাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদেরকে কী কী অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয় না, তার পরোয়া না করেই দেবে। এ কথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামের চেয়ে অধিক ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে অন্য কোনো ব্যবস্থা সে জটিলতার সমাধান করেনি। বাংলাদেশে হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ জৈন বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ আছেন, তারা স্বাধীনভাবে রুজি- রোজগার করেন, পূজা-পার্বণ করেন এবং স্বাধীনভাবে তাদের সকল অধিকার নির্বিঘ্নে ভোগ করে আসছেন।

ইসলাম সকল প্রকার সম্প্রদায়িক শ্রেণীভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। লঘিষ্ঠ আর গরিষ্ঠকে মুক্ত করতেই এই জীবনব্যবস্থার আগমন। শাশ্বত বিধান আল ইসলামের লক্ষ্যই হচ্ছে সকল প্রকার ভেদাভেদ উঁচু-নিচু, হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে অন্য সকল মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত করা। সুতরাং যারা এতুটু চেতনা বিশ্বাস ও আল্লাহর কাছের জবাবদিহির মানসিকতাকে লালন করে তারা কখনোই অন্যের অধিকার হরণ সামাজিক অনাচার সৃষ্টি ও সম্পদ লুণ্ঠনের মতো গর্হিত কাজ করতে পারে? বরং তারা সকল ত্যাগের বিনিময়ে হলেও তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি ইসলামের সৌন্দর্য খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গোঁা পৃথিবীর মানুষকে যেভাবে আকৃষ্ট করেছে, আজও যদি তার প্রতিনিধিরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন, তাহলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হবে সারা পৃথিবী। একশ্রেণী স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নির্যাতন, তাদের সম্পদ লুটপাট করে লাভবান হচ্ছে। আবার আর এক শ্রেণী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য মিডিয়ার মাধ্যমে এর কল্পকাহিনী তৈরি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও ইসলামকে বিপন্ন করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আজ আমাদেরকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। সুদৃঢ় করতে হবে এ দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য সম্প্রীতির বন্ধনকে।

> বিভিন্ন ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের ওপর দোষারোপকরা আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কোনো ঘটনা ঘটলেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিএনপি-জামায়াতের ওপর সরাসরি দায় চাপানো হয়। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও তার কর্তাব্যক্তিগণও বিষয়গুলোতে দায়িত্বহীন বক্তব্য প্রদান করে। যার ফলে দলীয় অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ক্ষেত্রে অন্য দলকে দায়ী করা হলেও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততার জড়ালো প্রমাণ মিলে।

সংখ্যালঘু নির্যাতনে আওয়ামী লীগের কালো হাত

জয়দেব মুখার্জী

১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পরপরই শুরু হয় সংখ্যালঘু নির্যাতন। ১৯৭২ সালে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পূজামণ্ডপেই হামলার ঘটনা ঘটে। এ কথা মনে রাখা অনিবার্য যে, তৎকালীন শাসকচক্র তাদের সকল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই হিংস্র ছিলো। সংখ্যালঘু হিন্দুরা যদিও তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ছিলো না, তবুও তারা নির্যাতিত হওয়ার কারণ ছিলো 'সংখ্যালঘু'। তৎকালীর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যুব সংগঠন সুপরিকল্পিতভাবেই এ ঘটনা ঘটিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো, হিন্দুদের ভয় দেখানো, যাতে তারা পালিয়ে যায় এবং তাদের সহায় সম্পদ যুবলীগ নেতা-কর্মীরা দখলে নিতে পারে। এভাবেই শুরু হয় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাস।

এরপর থেকে আওয়ামীচক্র যতবারই ক্ষমতায় এসেছে কিংবা ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে ততবারই তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাসে যোগ করেছে নতুন নতুন মাত্রা। ১৯৭২ সালের ঘটনাকে স্বাধীনতা পরবর্তী বিশৃংখলা বলে চালিয়ে দিলেও পরবর্তীতে প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন করে তার দায় অন্যদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এই বহুরূপী রাজনৈতিক দলটি।

‘নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা’ -একটি বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদবাক্য। এই প্রবাদ বাক্যটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ব্যাপারে শতভাগ প্রযোজ্য। ১৯৭১ সালে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ভারতের সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল বাংলাদেশ। সেই স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সংগঠন আওয়ামী লীগের হাতেই শুরু হয়েছিল সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইতিহাস। স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসেও এই ধারা অব্যাহত রেখেছে আওয়ামী লীগ।

২০০৯ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর থেকে অদ্যাবধি আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর হাতে নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দু ছাড়াও অন্যান্য নাগরিকরা। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ এসব অপকর্মের দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ঘাড়ে। যদিও গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে আওয়ামী লীগের এ ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ বুমেরাং হয়ে গেছে। প্রতিটি সংখ্যালঘু নির্যাতনের পেছনে আওয়ামী লীগের কালোহাত ও কুটিল চক্রান্তের তথ্য ফাঁস হয়ে গেছে। যে কারণে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ আজ আওয়ামী লীগের অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

বর্তমান পুস্তিকায় ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সংখ্যালঘু নির্যাতনে আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠনগুলোর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ হাজির করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রকাশনাপত্র থেকে এসব তথ্য এ পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। এ পুস্তিকার তথ্যচিত্র থেকে এ কথা আবারও প্রমাণ হচ্ছে যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের পেছনে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোই প্রধান কারিগর।

নির্যাতিত সেই মানুষগুলোর আর্তচিৎকার আর বেদনায় ভারী হয়ে উঠছে আকাশ বাতাস। সংখ্যালঘুদের ভাগ্যে আওয়ামী শাসন আমলে কী ঘটেছিলো তারই আলোকপাত করছি।

০১. ২২ আগস্ট ২০০৯, রাজধানী ঢাকার সূত্রাপুরে জমি দখলের উদ্দেশে এক হিন্দু পরিবারের নারী শিশুসহ ৯ সদস্যকে অপহরণের প্রায় আটঘণ্টা পর তাদের উদ্ধার করে পুলিশ। ডিবি পুলিশ পরিচয়ে হৃষিকেশ দাস লেনের ৯৫ নম্বর বাড়ি থেকে তাদের অপহরণ করা হয়। এ সময় ওই বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার ও টাকা পয়সা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ স্থানীয় আওয়ামী লীগের চার কর্মীকে গ্রেফতার করে। অধিকার রিপোর্ট, ২০০৯

০২. ১৯ এপ্রিল ২০১০, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিবাসীদের পক্ষে শংকর মিত্র অভিযোগ করেন আমড়াগাছিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবর রহমান ছায়েদ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি কামরুল ইসলাম এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য হাবিবুর রহমান, জালাল, আমির হোসেন মানিক, হাসান হোসেন, তোপা, হারেস ও তাজুলের অত্যাচারে তারা দিশেহারা। তারা তাদের ভিটেমাটিতে থাকতে

পারছেন না। তাদের ৫শ' বিঘা জমি দখল করে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে । অধিকার রিপোর্ট, ২০১০

০৩. ১১ অগাস্ট ২০১০, ঢাকার সূত্রাপুরের লালমোহন সাহা স্ট্রিটে ৭৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা হাজি ইসলাম ও সুত্রাপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হোসেনের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত পিস্তল, রামদা, হকিস্টিক ও শাবল নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রী রাধাকান্ত ঠাকুরানী লক্ষ্মী জর্নাধনচক্র জিওবিগ্রহ মন্দিরে হামলা চালায়। এ সময় দুর্বৃত্তরা মন্দিরের দরজা জানালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পাঁচটি প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলে। অধিকার রিপোর্ট, ২০১০

০৪. নওগাঁয় সন্ত্রাসীদের হাতে এক সংখ্যালঘু পরিবার ৭ দিন ধরে অবরুদ্ধ। জনকণ্ঠ, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১০, আসক, পৃষ্ঠা-২২৯

০৫. পুরান ঢাকার সূত্রাপুরের বাড়ি ও মন্দির দখলের ঘটনায় প্রশাসনের সাথে দখলকারীদের বিশাল অঙ্কের টাকার লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সত্ত্বেও কোন অপরাধী গ্রেফতার হয়নি। অভিযোগ ওঠে, ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মী এ লুটপাটের ঘটনায় সম্পৃক্ত হয়েছে। ইত্তেফাক, ১৬ আগস্ট ২০১০, আসক, পৃষ্ঠা-২২৯

০৬. ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২, কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়-আবাসস্থলে বর্বরোচিত হামলায় যারা ইন্ধন দেয় তাদের অনেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সদস্য। সরেজমিন অনুসন্ধানে করে এ দাবি করে মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'। যায়যায়দিন, ১৮ অক্টোবর ২০১২

০৭. পিরোজপুরে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসতঘর দখল। জনকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১০,আসক, পৃষ্ঠা-২২৯

০৮. ১৭ মে ২০১২, মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার ব্রাহ্মণবাজারের সিঙ্গরপুর পানপুঞ্জিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সমাধি দখল করে ক্রুস গুঁড়িয়ে দেয় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মতিন ও তার সহযোগীরা। হামলাকারীরা প্রয়াত এক মন্ত্রীর সমাধি গুঁড়িয়ে দেয় এবং আরও ১০টি সমাধির ক্রুস গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাধি দখল করে নেয়। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

০৯. ২২ অক্টোবর ২০১১ আওয়ামী লীগের কর্মী পরিচয় দেয়া একদল সন্ত্রাসী বন্দুক উঁচিয়ে কাফরুল থানার পুলিশের সামনেই ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী রীতা গমেজের বাড়ির একাংশ দখল করে নেয়। রীতার পরিবার থানায় অভিযোগ করতে গেলে তা নেয়নি। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১০. ২২ আগস্ট ২০১১, রাজধানীর সূত্রাপুর ৯৫, ঋষিকেশ দাস লেনে আওয়ামী লীগ আশ্রিত সন্ত্রাসীরা এক হিন্দু পরিবারের বাড়ি দখল করতে গিয়ে ওই পরিবারের ৯

জনকে মারধর, লুটপাট ও পরে তাদের অপহরণ করে। এর আগে তাদের বাড়িটি বিক্রি করার জন্য ভয়ভীতি ও হুমকি দেয়। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১১. ১২ জুলাই ২০১২, নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার নাকইলে ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর এক পল্লীতে আওয়ামী লীগ কর্মী শরীফুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল ভূমিদস্যু জমি দখলের জন্য হামলা চালায়। এ সময় ক্ষুদ্রজাতি-গোষ্ঠীর অর্ধশতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১২. ২৫ মে রাজশাহীর চারঘাটে জমির সীমানা নিয়ে বিরোধে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী আজহার উদ্দিন তার দলবল নিয়ে অনিলচন্দ্র মন্ডলের বাড়িতে হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা অনিলচন্দ্র তার স্ত্রী বাসন্তী রানী, ছেলে শ্যামলচন্দ্র মন্ডল, তার ভাই অভিচরণ মন্ডল, অভিচরণ মন্ডলের স্ত্রী শান্তা রানীকে কুপিয়ে জখম করে। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১৩. ২৫ জুলাই ২০১১, নরসিংদীর পলাশের চরসিন্দুর গ্রামে শ্মশানের জায়গা দখলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ কর্মীরা সংখ্যালঘুদের চারটি বাড়িঘর ও মূর্তি ভাংচুর এবং তাদের বাড়িতে লুটপাট করা হয়। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১৪. ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১১, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় উপজেলার বড়মাছুয়া ইউনিয়নের খেজুরবাড়িয়া গ্রামের সিকদার বাড়িসহ চার সংখ্যালঘু পরিবারের পানের বরজ ও খড়ের গাদা পুড়িয়ে দেয়া হয়। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১৫. ৩১ মার্চ ২০০৯, সাতক্ষীরা দেবহাটার কালাবাড়িয়ায় মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ ঘোষের মালিকানাধীন ৩০০ বিঘার ঘের দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা। দখলে বাধা দিলে তার স্বজনদের পিটিয়ে আহত করা হয়। সোনার বাংলা, ১২ অক্টোবর ২০১২

১৬. ২৪ নভেম্বর ২০১৩, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বরিশালের পৌর কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতার নেতৃত্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের রতন ভৌমিকের বাড়িতে হামলা চালায়। এ সময় ওই বাড়িতে মনসা মন্দিরের নির্মাণাধীন মনসা প্রতিমা ভাঙচুর ও ২ নারীকে আহত করে বাড়িতে তিনটি সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেয়। কালের কণ্ঠ, ২৫ নভেম্বর ২০১৩

১৭. ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর স্ত্রী বেগম হাসিনা মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক পরিবারকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদের অভিযোগ উঠে। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন নগরীর কে সি দে রোড এলাকার বাসিন্দা ঝিনু রাণী বড়ুয়া। সমকাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

১৮. ২৮ নভেম্বর ২০১৫, মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা জায়ফরনগর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি রেমানের বিরুদ্ধে দেবালয় মন্দিরের জমি দখল ও স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ ওঠে। এ ব্যাপারে জুড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ

দেওয়া হলে পুলিশ গিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রথম আলো, ২৯ নভেম্বর ২০১৫

১৯. ৩০ জানুয়ারি ২০১৬, পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার শাখারিকাঠী গ্রামের ২০টি হিন্দু পরিবারকে তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে ভারত চলে যেতে বলেছেন নাজিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও নাজিরপুর সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোশারেফ হোসেন খানের আত্মীয়রা। ইতিমধ্যে ওই সব হিন্দু পরিবারের বাড়ি ঘরের পাশের ফাঁকাস্থানে কয়েকটি ঘর তুলে প্রায় ৭ একর জমি দখল করেছেন তারা। সংবাদ, ১লা ফেব্রুয়ারি,২০১৬ / সংগ্রাম ও শীর্ষ নিউজ, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

২০. ১১ মার্চ ২০১৬ বরগুনা সদরের গৌরীচন্না ইউনিয়নের উত্তর মনসাতলী গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাতটি পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা,মারধর ও পরিবারের নারী সদস্যদের লাঞ্ছিত করে। হামলাকারীরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী মিলন চন্দ্র বিশ্বাসের সমর্থক বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রথম আলো, ১২ মার্চ ২০১৬

২১. ১৮ মার্চ ২০১৬, সদর উপজেলার জালালাবাদ জলদাস পাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে রাতের আঁধারে এক হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা ও তাদের বসতভিটা দখল করা হয়েছে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন। এছাড়া স্বর্ণালংকার ও টাকা লুটেরও অভিযোগ উঠেছে। এইবেলা, ০১ এপ্রিল ২০১৬

২২. ১৫ জানুয়ারি ২০১৭, খুলনায় চিত্ত রঞ্জন বাইন (৪৫) নামে এক হিন্দু কলেজ শিক্ষককে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। দুপুর ২টায় মহানগরীর শের এ বাংলা রোডের ৫৯ নং বাড়ির নিচ তলার ভাড়া বাসা থেকে পুলিশ তার হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করে। এইবেলা, ১৫ জানুয়ারি ২০১৭

২৩. ২০ জানুয়ারি ২০১৭, গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়গাঁও বাজার রাতে মন্দিরের ভেতর ঢুকে দুর্গাসহ ছয়টি মূর্তি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় পুলিশ কাউকে আটক করতে পারেনি। নয়া দিগন্ত, ২২ জানুয়ারি ২০১৭

২৪. ০৮ জুলাই ২০১৭, নরসিংদী শহরের মধ্যকান্দা পাড়ায় দিনের বেলায় ঘরে ঢুকে এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ দিপ্তি রানী ভৌমিক (৪৫) কে গলা কেটে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। নিহত গৃহবধূর নাম শনিবার দুপুর ১২টার দিকে মধ্যকান্দা পাড়া দেশপ্রিয় রোডের হরিপদ সাহার বাড়ির ৫ম তলার ফ্ল্যাটে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের স্বামীর নাম প্রদীপ কুমার ভৌমিক। যুগান্তর, ০৯ জুলাই ২০১৭

২৫. ১৯ আগস্ট ২০১৭, মৌলভী বাজারের কমলগঞ্জে দীপক মল্লিকের (৪৫) সাথে জিতেন মল্লিকের জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি আসিদ আলীর ছেলে শাহ আলমের নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একটি সংঘবদ্ধ

দল দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা ও ভাংচুর করে। সন্ত্রাসীদের ভয়ে মহিলারা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। মুখোমুখিডটকম, ২০ আগস্ট ২০১৭

২৬. ৬ অক্টোবর ২০১৭, লৌহজং উপজেলা খিদির পাড়া ইউনিয়নের ফুলকুচি গ্রামে সংখ্যালঘু হরিপদ হালদারের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর, লুটপাট করে প্রতিবেশী আজিজুলগংরা। জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ২০১৭

২৭. ০১ নভেম্বর ২০১৭, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার পুলিশ বনবিভাগের বাগান থেকে রনজিত কুমার রায় (২৫) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের পর্যাপ্ত আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায় খুনিরা। জনকণ্ঠ, ০১ নভেম্বর ২০১৭

সংখ্যালঘু নির্যাতনের কেস স্টাডি

সংখ্যালঘু নির্যাতনে জড়িত আওয়ামী লীগ

বিভিন্ন ঘটনায় বিএনপি-জামায়াতের ওপর দোষারোপকরা আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। কোনো ঘটনা ঘটলেই আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিএনপি-জামায়াতের ওপর সরাসরি দায় চাপানো হয়। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকার ও তার কর্তাব্যক্তিগণও বিষয়গুলোতে দায়িত্বহীন বক্তব্য প্রদান করে। যার ফলে দলীয় অপরাধীরা পার পেয়ে যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ক্ষেত্রে অন্য দলকে দায়ী করা হলেও পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততার জড়ালো প্রমাণ মিলে।

কেস স্টাডি নং : ১

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা

১৯ অক্টোবর ২০১৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পবিত্র কাবা শরীফকে ব্যঙ্গ করে ছবি পোস্টের জের ধরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বাড়ি-ঘরে হামলার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে মাদরাসা শিক্ষক এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

বিএনপি-জামায়াতকে দোষারোপ

বিএনপি-জামায়াতের চক্রান্তে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাছান মাহমুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফসহ দায়িত্বরত ব্যক্তিরা।

- নাসিরনগরে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় বিএনপি-জামায়াত জড়িত: হাসান মাহমুদ-বাসস,৭ নভেম্বর ২০১৬

- সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় বিএনপি-জামায়াত জড়িত: হানিফ- মানবজমিন, ৬ নভেম্বর ২০১৬

- বিএনপির সহায়তায় জামায়াত-শিবির বারবার সাম্প্রদায়িক হামলা করছে: তারানা হালিম -কালেরকণ্ঠ, ৪নভেম্বর ২০১৬

বিএনপির বিবৃতি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হামলার ঘটনায় তীর্ব নিন্দা জানিয়েছে বিএনপি। রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। হিন্দুদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা আক্রমণ চালাচ্ছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'সরকার সংখ্যালঘুদের ওপর সার্জিক্যাল অপারেশন চালাচ্ছে।' ঢাকা টাইমস, ১২ নভেম্বর ২০১৬

জামায়াতের বিবৃতি

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির, বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় কোন কোন মহলের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জামায়াতকে জড়িয়ে মিথ্যা বক্তব্য দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ এবং নিন্দা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ৭ নভেম্বর ২০১৬ এক বিবৃতি প্রদান করেন। মানবজমিন, ৫ নভেম্বর ২০১৬

আসল ঘটনা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুজুর সিরাজুল ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত শহরের ভাদুঘরে জামিয়া সিরাজিয়া দারুল উলুম মাদরাসার প্রধান ফটকে ২টি তালা মেরে দেয় দুর্বৃত্তরা। সে সাথে পবিত্র কাবা শরীফের ছবির উপর মূর্তি বসিয়ে বিরাট পোস্টার গাঁটিয়ে দেয়া হয়। একইভাবে শহরের কাউতলী জামে মসজিদ ও শহরতলীর বিজেশ্বরে জামিয়াতুস সুন্নাহ্ মাদরাসায় একই কায়দায় পোস্টার গাঁটানো হয়। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জেলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের ঘটনাটি জানান। সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে মাদরাসা পৌঁছে তালা ভেঙে গেইট খুলে দেয়। এ নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঠেকাতে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্থানীয় বিশিষ্ট আলেমদের নিয়ে তাৎক্ষণিক সভা করেন। উল্লেখ্য, গত ২৯শে অক্টোবর পবিত্র কাবা শরীফকে ব্যঙ্গচিত্র করে নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের জগন্নাথ দাসের ছেলে রসরাজ দাস তার ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট দেন। এ ঘটনার জের ধরে গত ৩০শে অক্টোবর দুষ্কৃতকারীরা উপজেলা সদরে সংখ্যালঘুদের মন্দির ও ঘর-বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে। মানবজমিন, ০৫ নভেম্বর ২০১৬

নেপথ্যে আওয়ামী লীগ

প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন হরিনবেড় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ফারুক আহমেদ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই ঘটনার হীন চক্রান্তের শিকার রসরাজের গ্রাম হরিণবেড়। তিনি দৈনিক শ্রমিক। বাড়ির পাশের বিলে জেলে হিসেবে মাছ

ধরে। ঘটনার দিনও ফোনটি বাড়িতে রেখে মাছ ধরতে যায়। তার ছোট ভাই অন্যজনের মোবাইলের মাধ্যমে ফোন করে রসরাজের সঙ্গে কথা বলে তাকে জানায়, তোমার ফেসবুক থেকে কী আপলোড করেছ, যা নিয়ে সমস্ত এলাকায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। এ কথা শুনে বাড়িতে এসে ফেসবুকে ঐ ব্যঙ্গচিত্র দেখে সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে রসরাজ নিম্নোক্ত ভাষায় একটি স্ট্যাটাস লিখেন- "প্রথমেই আমি সকল মুসলিম ভাইদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কারণ আমার অজান্তে কে বা কারা আমার আইডি থেকে একটি ছবি পোস্ট করেছে।" ঘটনার পর ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর উপাসনালয় পরিদর্শন শেষে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক শাহরিয়ার কবির যুগান্তরকে বলেন- রসরাজের মত সাধারণ ছেলের পক্ষে ঐ রকম ব্যঙ্গচিত্র বানানো সম্ভব নয়। কারণ ধর্মীয় ঐ ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করতে যে ধরণের মেধা, কম্পিউটার দক্ষতা প্রয়োজন তা রসরাজের নেই। এ দিকে প্রশ্ন উঠেছে রসরাজর গ্রেফতার ও আদালতে তার পক্ষে আইনজীবিকে দাঁড়ানোর ম্যাজিস্ট্রেটের সুযোগ না দেওয়া। এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট রসরাজকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তার বিরুদ্ধে রিমান্ড অর্ডার দেয়।

স্থানীয় সূত্র আরো জানায়, মন্ত্রী ছায়েদুল হক, আওয়ামী নেতা ফারুক ইউপি নির্বাচনে সমর্থন করেছিলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রাশেদ চৌধুরীকে। তাদের উপেক্ষা করে কৈবর্ত সমাজের মানুষ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করায় ঐ সমাজের মানুষের উপর প্রতিশোধ ও বালিঙ্গা বিলের আধিপত্য নিয়ে রসরাজকে ফাঁসিয়ে ফায়দা লোটার জন্যই এ হীন চক্রান্ত সম্পন্ন করা হয়। তাছাড়া নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইউনিয়ন আওয়ামি লীগ সভাপতি ফারুক আহমেদসহ স্থানীয় তিন নেতাকে বহিষ্কারে প্রমাণিত, আওয়ামী লীগ জড়িত।

- নাসিরনগর পুরুষ শূন্য, তাণ্ডবের নেপথ্যে ফারুক। যুগান্তর, ৬ নভেম্বর ২০১৬
- স্থানীয় আ'লীগের 'দ্বন্দ্বে' নাসিরনগরে হামলা। অপরাধবার্তা ডটকম, ৫ নভেম্বর ২০১৬
- স্থানীয় আ'লীগের 'দ্বন্দ্বে' নাসিরনগরে হামলা। পরিবর্তনডটকম, ৫ নভেম্বর ২০১৬
- মন্দির ভাংচুর : ইন্ধনে আওয়ামী লীগ নেতা। বিডিঅলনিউজ, ২ নভেম্বর ২০১৬
- নাসিরনগরে হামলায় আ'লীগ জড়িত: বিএনপি। যায়যায়দিন, ৬ নভেম্বর ২০১৬

কেস স্টাডি নং ০২

রামু বৌদ্ধপল্লীতে হামলা

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২, রাতে দুর্বৃত্তরা একযোগে হামলা চালায় রামুর ঐতিহ্যবাহী ১২টি বৌদ্ধবিহার এবং বৌদ্ধপল্লীতে। উত্তম বড়ুয়া নামে ফেইসবুকে পবিত্র কোরআন অবমাননার অভিযোগে এ হামলা চালানো হয়।

বিএনপি-জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ

রামুর বৌদ্ধ পল্লীতে হামলার ঘটনা একটি পরিকল্পিত সশস্ত্র জঙ্গীবাদী আক্রমণ। এ

জঙ্গীবাদীদের সঙ্গে কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বহু জামায়াত সদস্য জড়িত আছে। এমন তথ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

- সহিংসতায় জড়িত বিএনপি-জামায়াত সমর্থক ৬ উপজেলা চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি। ইত্তেফাক, ২৩ এপ্রিল ২০১৩

- রোহিঙ্গা, জামায়াত-শিবিরও জড়িত, প্রশাসন ব্যর্থ: সরকার গঠিত তদন্ত কমিটি। কালেরকণ্ঠ, ১১ অক্টোবর ২০১২

বিএনপির বিবৃতি

কক্সবাজারের রামুতে বৌদ্ধ বসতি এবং মন্দিরে হামলার ঘটনায় সরকার জড়িত রয়েছে বলে দাবি করেছেন দেশটির বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া। শনিবার রামুতে বৌদ্ধ পল্লী এবং মন্দির পরিদর্শন শেষে এক সমাবেশে মিসেস জিয়া একথা বলেন। মিসেস জিয়া বলেন যে, রামুতে বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তাই প্রমাণ করে যে, এ ঘটনার সাথে সরকার জড়িত ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, সরকারের নির্দেশেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়নি। বিবিসি, ১০ নভেম্বর ২০১২

জামায়াতের বিবৃতি

২০১২ সালের ১৯ অক্টোবর প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদপত্রের রিপোর্টে সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে 'রামুর বৌদ্ধ পল্লী, মন্দিরে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ আর লুটপাটের ঘটনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা জড়িত ছিল' মর্মে যেসব কথা লেখা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রামুর ঘটনার সঙ্গে জামায়াতের কোনো নেতাকর্মীর সংশ্লিষ্টতা ছিল না। মিথ্যা মামলায় জড়ানোর উদ্দেশেই তাদের নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা ঘটনার পর থেকেই জামায়াতের পক্ষ থেকে বলে আসছি- ওই ঘটনার সঙ্গে জামায়াতের কেউ জড়িত ছিল না। আমরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে আসছি।

আসল ঘটনা

২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে দুর্বৃত্তরা একযোগে হামলা চালায় রামুর ঐতিহ্যবাহী ১২টি বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ পল্লীতে। রামুতে উত্তম বড়ুয়া নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগ এনে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠী রামুর ১২টি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও ৩২টি বসতঘরে অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় আরও ছয়টি বৌদ্ধ বিহার ও শতাধিক বসতঘরে ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। পরদিন উখিয়া-টেকনাফে আরও কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ও বসতিতে একই ঘটনা ঘটে। কালেরকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

পরের ঘটনা

ঘটনায় কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ এবং কক্সবাজার সদর থানায় ১৯টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব মামলায় ৩৭৭ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১৫ হাজার জনকে আসামি করা হয়। পরে তদন্ত সাপেক্ষে সবগুলো মামলার অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। ১৯টি মামলার কেবল একটি আপসসূত্রে বিচার কাজ শেষ হয়েছে। মামলাটির চার্জশিটভুক্ত ৩৮ জন আসামির সবাই খালাস পেয়েছেন। বাকি ১৮টি মামলার বিচার কাজ অব্যাহত রয়েছে। বিচারাধীন এসব মামলায় ৯১০ আসামির মধ্যে অর্ধশতাধিক আসামি পলাতক রয়েছেন। বাকিরা জামিনে রয়েছেন। কালেরকণ্ঠ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নেপথ্যে আ'লীগ

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২, কক্সবাজারের রামু, উখিয়া, টেকনাফ এবং চট্টগ্রামের পটিয়ায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়-আবাসস্থলে বর্বরোচিত হামলায় যারা ইন্ধন দিয়েছেন তাদের অনেকেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সদস্য। মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার', নয়াদিগন্ত কক্সবাজার সংবাদদাতা সহ স্থানীয় সূত্রে জানা যায়- রামু বৌদ্ধ পল্লীতে হামলার মূল নায়ক হলো আব্দুল মুক্তাদি আলিফ, যিনি উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক আইডিতে "কোরআন অবমাননার" ছবি ট্যাগ করেছেন। আর উত্তম কুমার বড়ুয়ার ঘনিষ্ট বন্ধু হল আব্দুল মুক্তাদি আলিফ, যাকে কক্সবাজার জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক বসুমিত্র চাকমা আদালতে হাজির করে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। আর মুক্তাদি আলিফের রাজনৈতিক পরিচয় হলো, সে রামুর বহুল আলোচিত আওয়ামী লীগ নেতা সাইমুম সরওয়ার কমল গ্রুপের সদস্য এবং আলিফের মা শিমুল বেগম শ্রীকুল ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী। তাছাড়া গোয়েন্দা তথ্য মতে, ২৯ সেপ্টেম্বর রামুর ফকিরাবাজারের ফারুক কম্পিউটার টেলিকম নামের একটি দোকানে এসে মুক্তাদি নামের পলিটেকনিক কলেজের এক ছাত্র উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক থেকে বিতর্কিত ছবিটি বের করে এবং এরপর ছবিটি অনেকগুলো প্রিন্ট করে সরবরাহ করা হয়। নয়া দিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১২

কেস স্টাডি নং ০৩

যশোরের চাঁপাতলা মালোপাড়ায় হামলা

৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের পরপরই যশোরের অভয়নগর উপজেলার চেঙ্গুটিয়া-চাঁপাতলা এলাকার মালোপাড়ায় হামলার ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা মালোপাড়ার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শতাধিক ঘরবাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট চালায়। এ সময় লোকজন প্রাণ বাঁচাতে নদী সাঁতরে ও নৌকায় করে দেয়াপাড়া পালপাড়া পূজামণ্ডপে আশ্রয় নেন।

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ

যশোরের অভয়নগর উপজেলার চাঁপাতলা গ্রামের মালোপাড়ায় ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের দিনে হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে জামায়াত-শিবির। বিএনপির স্থানীয় পর্যায়ের বেশ কিছু নেতা-কর্মী এ সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০১৪

জামায়াতের বিবৃতি

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় গত রোববার রাতে অভয়নগর উপজেলার হিন্দু অধ্যুষিত চেঙ্গুটিয়া গ্রামের মালোপাড়ায় কিছু বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি ও লুটপাটের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী। গতকাল সোমবার যৌথ বিবৃতিতে জেলা জামায়াতের আমীর অধ্যাপক আব্দুর রশীদ ও জেলা সহকারী সেক্রেটারি এবং সদর উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান এম ইদ্রিস আলী এই প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, অভয়নগর উপজেলার মালোপাড়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্বাচন পরবর্তী যে সহিংসতা এবং তাণ্ডব চালানো হয়েছে, এর সাথে জামায়াতে ইসলামীর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যারা এই ঘৃণ্য অপকর্মের সাথে জড়িত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। সংগ্রাম, ৭ জানুয়ারি ২০১৪

আসল ঘটনা

৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে জাতীয় সংসদের হুইপ শেখ আবদুল ওহাব দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে মনোনয়ন পেয়েছেন বাঘারপাড়ার অধিবাসী রণজিত রায় এমপি। এ নিয়ে এক মাস ধরে ওই দুই নেতার সমর্থকদের মধ্যে চলছিল প্রকাশ্যে সংঘর্ষ ও সহিংসতার ঘটনা। একে অপরের সমর্থকদের মারধর, হত্যাচেষ্টা, অফিস পোড়ানোসহ নানা সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে কয়েক দিনে।

নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন রণজিত রায় এবং কলস প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন বিদ্রোহী প্রার্থী শেখ আবদুল ওহাব। এ নির্বাচনে চেঙ্গুটিয়া-চাঁপাতলা মালোপাড়ার ভোটাররা তাদের নিজ এলাকা অভয়নগরের প্রার্থী শেখ আবদুল ওহাবকে ডিঙিয়ে বাঘারপাড়ার বাসিন্দা রণজিত রায়ের নৌকা প্রতীকে ভোট দেন। এতে পরাজিত শেখ আবদুল ওহাব ও তার সমর্থকরা ক্ষিপ্ত হয়ে মালোপাড়ায় হামলা চালায়। নয়া দিগন্ত, ০৮ জানুয়ারি ২০১৪

নেপথ্যে আওয়ামী লীগ

যশোরের অভয়নগর উপজেলার চাঁপাতলা মালোপাড়ায় হামলার নেপথ্যে ইন্ধন ছিল মনোনয়ন বঞ্চিত ক্ষমতাসীন দলেরই একটি অংশের। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে হুইফ শেখ আব্দুল ওহাব দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে

কলস প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। রণজিত রায় দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় শেখ আব্দুল ওহাব ও তার পক্ষের লোকজন ধরেই নেন মালোপাড়ার ভোটাররা কোনো ভাবেই তাদের ভোট দিবেন না।

এজন্য নির্বাচনের আগেই চাঁপাতলা মালোপাড়ার বাসিন্দাদের দেখে নেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন হুইপ অধ্যক্ষ আব্দুল ওহাব। নির্বাচনে নৌকার বাইরে বের হতে না পারলে পরিণাম ভাল হবে না বলে শাসিয়েছিলেন।। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়দের উদ্দেশ্য করে হুইপ ওহাব বলেছিলেন, আপনারা সাম্পদায়িকতা থেকে বের হতে পারবেন না, আর আমার কাছে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা আশা করবেন- সেটা হবে না। আপনাদের কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভর করছে ভোটের পরে আমি অসাম্প্রদায়িক থাকবো না সাম্প্রায়িক আচার-আচরণ করবো। এদেশের জামায়াত-শিবির শুধু সাম্প্রদায়িকতা লালন করে সেটা ঠিক নয়, এদেশের সংখ্যালঘুরাও সাম্প্রদায়িক। পরবর্তীতে নির্বাচনের পর পরই রনজিত রায়ের পক্ষের কিছু লোক ভোটের দিন মুসলমানদের সম্পর্কে আপত্তিকর দু' একটি কথা বললে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। এ সুযোগটিও কাজে লাগায় হুইপ পক্ষ। সন্ধ্যায় যখন ১৮ দলের লোক মালোপাড়ায় হামলা চালায় তখন হুইপ পক্ষের লোকজনও তাতে যোগ দেয়। উপরোক্ত ঘটনাই মালোপাড়ার ঘটনায় আওয়ামী লীগের জড়িত থাকার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

– মালোপাড়ায় হামলা : নেপথ্যে ইন্ধন ছিল মনোনয়ন বঞ্চিত ক্ষমতাসীন দলেরই একটি অংশের। মানবকণ্ঠ, ৮ জানুয়ারি ২০১৪

– নির্বাচনের আগেই হুমকি দিয়েছিলেন হুইপ ওহাব। মানবজমিন, ৮ জানুয়ারি ২০১৪

– সহিংস ঘটনার জন্য নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী শেখ আবদুল ওহাবের সমর্থকেরা দায়ী। নয়া দিগন্ত, ৮ জানুয়ারি ২০১৪

কেস স্টাডি নং ০৪

বিশ্বজিৎ দাস হত্যা

২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর রবিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা বিশ্বজিৎ দাসকে বিনা কারণে প্রকাশ্য-দিবালোকে শত শত মানুষ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঐদিন সকাল থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে সরকার বিরোধী আন্দোলন চলছিল। পঁচিশ বৎসরের বর্ষীয়ান যুবক, পেশায় দর্জি বিশ্বজিৎ দাস জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হেঁটে পার হওয়ার সময় আন্দোলন বিরোধীরা (ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা) তাকে আঘাত হানা শুরু করে। নির্বিচার কিল-ঘুষি-লাথি ছাড়াও এই শীর্ণকায় যুবককে লৌহশলাকা দিয়ে পেটানো হয়। তদুপরি চাপাতির কোপে তাঁকে ধরাশায়ী করে ফেলা হয়। তিনি বারবার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অচেতন হয়ে

মাটিতে লুটিয়ে পরলে হত্যকারীরা চলে যায়। তখন তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নেয়া হয়। অত্যাধিক রক্তক্ষরণে অচিরেই তার মৃত্যু হয়। প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর ২০১২

জামায়াতের ঘাড়ে দোষারোপ

বিনা কারণে প্রকাশ্য-দিবালোকে শত শত মানুষ ও আইনরক্ষা বাহিনীর সদস্য এবং সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে নৃশংসভাবে বিশ্বজিৎ দাস হত্যার দায়ভারও জামায়াত-বিএনপির ওপর চাপিয়ে বারবার বক্তব্য দেয় আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা।

জামায়াতের বিবৃতি

নিহত বিশ্বজিৎ দাসের হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এর সাথে জামায়াতে ইসলামীর দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। যারা এই ঘৃণ্য অপকর্মের সাথে জড়িত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ।

আসল ঘটনা

বিশ্বজিৎ হত্যার ঘটনাটি ঘটে পুরান ঢাকায়। রোববারের ১৮ দল আহূত অবরোধ চলাকালে বিএনপি ও জামায়াত-সমর্থিত আইনজীবীরা মিছিল করেন আদালতপায়ায়। সেই মিছিল বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত এলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ধাওয়া করেন। দুই পক্ষে কিছুক্ষণ ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলে। এরই মধ্যে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। চারদিকে হইচই পড়ে যায়। এ সময় বিশ্বজিৎ ফুটপাত দিয়ে তাঁর দর্জির দোকানে যাচ্ছিলেন। অমনি ছাত্রলীগের কর্মীরা ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে তিনি একটি ক্লিনিকের দোতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন ছাত্রলীগের একদল কর্মী 'ওপরে ওপরে' বলে চিৎকার করেন। আরেক দল কর্মী দোতলায় উঠে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেউ তাঁকে ধরে লাঠি দিয়েপেটাতে থাকেন, কেউ চাপাতি দিয়ে কোপাতে থাকেন। ছেলেটি তখন হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতি করি না, ছাত্রদল বা শিবির করি না। আমি হিন্দু। আমি একটি দর্জিখানায় কাজ করি।' কিন্তু তাঁর সব আবেদন-নিবেদন, আহাজারি নিষ্ফল হয়ে যায় আক্রমণকারীদের নৃশংসতা ও বর্বরতার মুখে। উপর্যপুরি আঘাতে অচেতন হয় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে হত্যকারীরা চলে যায়। তখন তাকে মিটফোর্ড হাসপাতালে নেয়া হয়। অত্যাদিক রক্তক্ষরণে অচিরেই তার মৃত্যু হয়। প্রথম আলো, ১১ ডিসেম্বর ২০১২

জড়িত আওয়ামী লীগ

৯ ডিসেম্বর ২০১২, পুরান ঢাকায় ১৮ দলের ডাকা অবরোধে সরকারের নির্দেশে প্রতিরোধ করার নামে হিন্দু ধর্মের অনুসারী বিশ্বজিৎ নামে এক যুবককে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরবর্তীতে ঢাকার মহানগর

দায়রা জজ জহুরুল হক বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের ২১ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু করে। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে গণমাধ্যমে প্রচারিত ছবি দেখে শনাক্ত আট জনকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশ। বাকি ১৩ জন পলাতক থাকেন। অবশেষে ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল -৪ এর বিচারক এ বি এম নিজামুল হক, পুরান ঢাকার দর্জি দোকানদার বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের ২১ জন কর্মীর মধ্যে ৮ জনকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ ও বাকি ১৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দিয়ে রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদন্ড পাওয়া ছাত্রলীগের আট কর্মী হলেন শাকিল, নাহিদ, শাওন, কায়ুম, এমদাদ, সাইফুল, রাজন ও মিলন।

– বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলার বিচার শুরু ছাত্রলীগের ২১ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন। যায়যায়দিন, ৩ জুন ২০১৩

– বিশ্বজিৎ হত্যা: ছাত্রলীগের ৮ জনের ফাঁসি, ১৩ জনের যাবজ্জীবন। প্রথম আলো, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

– বিশ্বজিৎ হত্যার দায়ে ৮ জনের ফাঁসি, ১৩ জনকে যাবজ্জীবন। বাংলাবিডিনিউজ২৪ডটকম, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

এক নজরে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের চিত্র:

নির্যাতনের ধরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫
নিহত	৩৪	২৬	৩৯	২২	১৮	৪৫	২৪
আহত	৫০২	২৪৪	১০৭	৬৯	১১৮	৭৮	২৩৪
বাড়ি-ঘর ভাংচুর	৫	২০	২১	৮১	৪৪১	৩৭১	২০৯
মন্দির ভাংচুর	২৮	২৩	২৫	৪৬	১২৫	৩২	২১
মূর্তি	৩০	৩	৩২	১২	৩২২	১৯৩	১৮০
ধর্ষণ	২৫	৮৪	৬১	৫৯	৪২	৫৫	২৭
ধর্মান্তরিত	৫	২	৯	৫	৬	৪	৯

সূত্র: তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট আসক

“
সব কিছুতেই আওয়ামী লীগ রাজনীতিকরণ করে এমন এক নোংরা সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তা দু:খজনক। আওয়ামীলীগের এই নষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে আজ জেগে ওঠেছে এ দেশের মানুষ। এমন অপকর্মের জন্য আওয়ামী লীগকে সামনের দিনগুলোতে চরম খেসারত দিতে হবে।
”

এবার ভোটে আওয়ামী লীগকে লালকার্ড দেখাবে সংখ্যালঘুরা

তাজিম মাহমুদ

অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনিকে মৃত দেন। তিনি বলেন, “যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।”

যে অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট দিল আমি তার বিরুদ্ধে বাদি হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদি হবো আমি কিয়ামতের দিন জয়ী হবো।” (তারিখে বাগদাদ)

‘যে সংখ্যালঘুকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে স্বয়ং আল্লাহকে কষ্ট দিল।’ (তাবরানি আওসাত) হযরত আলী (রা)-এর আদালতে সংখ্যালঘু নাগরিক হত্যাকারী এক মুসলিমকে উপস্থিত করা হলো এবং সাক্ষী- প্রমাণের মাধ্যমে তার অপরাধ প্রমাণিত হলো।

ইসলাম সকল প্রকার সম্প্রদায়িক শ্রেণিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। লঘিষ্ঠ আর গরিষ্ঠকে মুক্ত করতেই এই জীবনব্যবস্থার আগমন। শাশ্বত বিধান আল ইসলামের লক্ষ্যই হচ্ছে সকল প্রকার ভেদাভেদ উঁচু-নিচু, হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে অন্য সকল মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত করা। সুতরাং যারা এতুটুকু চেতনা বিশ্বাস ও আল্লাহর কাছের জবাবদিহির মানসিকতাকে লালন করে

তারা কখনোই অন্যের অধিকার হরণ সামাজিক অনাচার সৃষ্টি ও সম্পদ লুণ্ঠনের মতো গর্হিত কাজ করতে পারে?

এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'ঠাকুর ঘরে কে রে?' তিনি বললেন, 'আমি কলা খাইনি।' তার মানে মূল প্রশ্নের জবাবের ধারে-কাছে তিনি যাননি। আমাদের দেশে দেশ পরিচালনায় নেতাদের কিছু কাণ্ড দেখে সাধারণ মানুষ শুধু কষ্ট পায় না, মাঝে মাঝে হাসিও পায়। পৃথিবী পরিবর্তনশীল, তাই সময়ের স্রোতে আমরাও এর বিপরীত দাঁড়াতে চাই না। সময়ের তালে তাল মিলিয়ে চলাকে অনেকে স্মার্ট মনে করি। আর অতীতকে ভুলে যাওয়াটা এক ধরনের ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। বলে থাকি, Past is past আর এই ঐতিহ্যকে ধারণ করতে গিয়ে অনেক সময় সত্যের সাময়িক পরাজয় ঘটে। আর এগুলো কোনো টেনশন ছাড়া আমাদের দেশের নেতারা দাম্ভিকতা করে যাচ্ছেন। এক ধরনের বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক আছেন। কেউ টকশোতে ইচ্ছেমতো জ্ঞান দিয়ে চলে যান, আবার কেউ সিন্ডিকেট নিউজ দিয়ে ঝাল মেটান। সব মিলে তারা অনেক ফায়দা লুটলেও ভুক্তভোগীরা থাকে ন্যায় বিচারের আড়ালে। আর এই বিচার নামের পাঠশালাতে অনেককে বিনা অপরাধে মুখোমুখি হতে হয়। ধামাচাপা পড়ে যায় সত্য ঘটনা। আর বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে। এক্ষেত্রে অনেকের পাণ্ডিত্য জাহির ও কথার ঠেলায় কাবু হতে হয়। যাদের বয়স একটু বেশি, আর যদি সে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের তালিকায় নাম লেখায়, তাহলে তো কথা নেই, সে-ই তো ইতিহাসবিদ। সে-ই সবজান্তা। আর সবাই...। তবে ছল-চাতুরী দিয়ে বেশি দূর এগুনো যাবে না। একদিন সচেতন নাগরিকের জয় হবে হবেই। গ্রামীণ একটা প্রবাদ - হায়রে কপাল মন্দ, চোখ থাকিতে অন্ধ। সমাজজীবনে অনেক মানুষ মেলে যারা অনেক ধনী কিন্তু ফকিরের হালতে থাকে। অনেকে চোখওয়ালা কিন্তু অন্ধের ভূমিকায় নফসের খায়েশে অন্ধ হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এখানে একটা বিষয় হলো, কেউ যদি নিজের ব্যক্তিত্ব না বোঝে, তাহলে তাকে বোঝানো দুঃসাধ্য। আমাদের বর্তমান সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার কিছু নায়কের ক্ষেত্রে এমন চরিত্র দেখে হতচকিত হওয়ার মতো। তারা অন্যের গালে ঝাল খেতে চান। কিন্তু নিজে বিষয়টি জানতে ও উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন না।

যা হোক বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি স্পর্শকাতর ইস্যু হলো সংখ্যালঘু নির্যাতন। সময়ে অসময়ে মোড় ঘুরানোর রাজনীতিতে এই অপরাজনীতি চলে ধুমধারাক্কা। বরাবরই প্রকৃত সত্যকে ধামাচাপারই আয়োজন চলে। তবে দেরিতে হলেও বেরিয়ে আসে ভেতরের খবর। বর্তমান আওয়ামী সরকার ২০০৮ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত এই গেমস খেলেছে হরদম। তবে কোন রাখঢাকে আড়াল করতে পারেনি সত্য ঘটনা। আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও আওয়ামী অপরাজনীতির দুর্বুদ্ধি টের পেয়েছে। পাগল প্রলাপের ভন্ডামিও ধোঁকাবাজির ধান্দায় ধরা খেয়েছে বার বার। সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন ও নেপথ্যের নায়করা কারা তা আজ সুস্পষ্ট। ভ্রান্তির অবসান তো ঘটবেই। জানান দিবেই সময়ে সুযোগে। প্রবাদে আছে -বৃক্ষ তোমার নাম কী? ফলে পরিচয়। আমগাছ লাগিয়ে যেমন কাঁঠাল আশা করা যায় না, ঠিক তেমনি বিদ্বেষী মন নিয়ে সত্যকে খোঁজা যায় না।

আমাদের রাজনীতিবিদরা বাছবিচার না করে এলোমেলো বক্তব্য দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বড় ওস্তাদ। কখনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আবার কখনও বলেন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য দুঃখিত, তদন্ত সাপেক্ষে বিষয়টি খতিয়ে দেখব। আবার কখনও বলেন, বিরোধী দলের নেতাকর্মীরা জড়িত। রাজনীতির এই মারাত্মক খেলায় অপরাধীরা থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। আর ভুক্তভোগীদের সঙ্গী হয় দুঃখরা। রাজনীতিবিদরা কথায় চিড়ে ভিজিয়ে এমন বক্তব্য দেন যেন মনে হয় আগামীকাল থেকে কোনো অপরাধযজ্ঞ ঘটবে না। অথচ তারাই থাকে এই অপরাধকর্মের কমান্ডার। আর নষ্ট চরিত্রের রাজনীতিবিদরা পারেনও বটে। যখন-তখন খোলস বদলে ফেলতে পারেন। বিগত দশ বছরে অনেক ঘটনা চোখের সামনেই ঘটে গেল। কোনো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং সুবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, এমনটি কেউই বলতে পারবেন না। শুধু মুখস্থ একটা বক্তব্য অমুক করেছে, অমুক করেছে। বর্তমান সরকার একটি অপরাধকর্মকে ঢাকার জন্য আরেকটি অপরাধের জন্ম দিয়েছে। যথেষ্ট কারিশমা দেখিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। দীর্ঘ একটি সময় এই দেশে হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে বসবাস করার সুবাদে এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে পারি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়নি। বরং অনেকের সঙ্গে ঘটেছে হৃদ্যতার বহিঃপ্রকাশ; অথচ আজ দেখতে পাচ্ছি অন্য রকম একটা নাটক। যখন আওয়ামী মহাজোট ভোটারবিহীন ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভের ইতিহাস গড়ে নতুন নজির সৃষ্টি করে তবে রাজনীতির মাঠে এসে জনগণের রিসিপশন ও রেসপন্স পাচ্ছে পায়নি। ঠিক তখনই ভিন্ন খাতে রাজনৈতিক গলিপথে একটি খেলা শুরু করে। সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে একটি নাটক বলতে পারি, যাতে করে সবার নজর ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। ক্ষমতার মসনদে স্থায়ীভাবে টিকে থাকার এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালায়। আর তারা অন্যের ওপর দায় এড়াতে বেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চালায়। যেটি জামায়াত-বিএনপি নেতাকর্মীদের ওপর দোষ চাপালেও আসল নায়ক হলো আওয়ামী নেতাকর্মীরা। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য কিছু সত্য ঘটনা তুলে ধরার চেষ্টা।

১. ২ নভেম্বর, ২০১৩ পাবনার গাঁথিয়ায় বনগ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা করে। হামলার বাদী বাবুল সাহা সাংবাদিকদের বলেন, ১০ জনকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে রাখা হয়েছে। দায়ের করা মামলার একজন আসামিও তাদের মধ্যে নেই। বাদীর পরিবারের সদস্যরা মন্ত্রী ও সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, প্রকৃত আসামিদের বাদ দিয়েযারা আমাদের সেদিন বাড়িতে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েপ্রাণ ও সম্পদ বাঁচিয়েছিলেন তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

২. বগুড়ার শাহাজানপুর ১৩নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আবদুর রউফ ও তার বাহিনীর সদস্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ওই এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়। গত ২ ডিসেম্বর, ২০১৩ চকজোড়া হিন্দুপাড়ার বেনু চন্দ্র মোহনের বাড়িতে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে ঢুকে বিস্ফোরক রাখার অভিযোগ তুলে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না পেয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে

তারা চলে যায়। তাদের অত্যাচারের প্রতিবাদে হিন্দু সম্প্রদায় গত ৩ ডিসেম্বর প্রতিবাদ-সমাবেশ করে। শাহজাহানপুরের ওসি মাহমুদুল আলম তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

৩. সাতক্ষীরার দেবহাটায় পারুলিয়া গ্রামে সুনীত সরকারের বাড়িতে আগুন দিয়ে পালানোর সময় আটক যুবলীগ নেতা আবদুল গাফফারকে এক বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ সাতক্ষীরা জেলার ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিমের আদালত গাফফারকে এক বছরের কারাদন্ড দিয়ে জেলহাজতে পাঠায়, যেটি মিডিয়ার কল্যাণে কারো অজানা নয়।

৪. পাবনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকুকে দায়ী করেন সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়িদ 'ফোরাম-৭১' আয়োজিত আতাইকুলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুস সালামের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সমবেশে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসীরা তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর পুলিশ খুঁজে পায় না। ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-পরবর্তী হিন্দুদের ওপর যে হামলা হয়েছে সে ব্যাপারে ৩ জানুয়ারি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, জামায়াত-শিবিরের ওপর দোষ চাপানো (সরকারি) গল্প। তিনি আরও বলেন, সংখ্যালঘুদের হামলার দায় শুধু চাপিয়ে পার পাওয়া যাবে না। এর সঙ্গে কারা জড়িত তা আমরা জানি (সরকারি দল)। নির্বাচন-পরবর্তী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় জামায়াত-শিবির জড়িত এটা একটা স্লোগানে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে এমনটি নয়, বরং আওয়ামী লীগই এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশে ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক বাড়িঘর এবং মন্দিরে হামলার ঘটনার পর বিবিসিকে তিনি এ কথা বলেন। সুব্রত চৌধুরী আরও বলেন, সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে সেটা এখন রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের ওপর চাপানোর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হামলাকারীদের বিচারের আওতায় না আনার একটি সংস্কৃতি চালু হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বরাবরই বিরোধী পক্ষকে দমন-নিপীড়ন করা একটি রেওয়াজ হয়ে গেছে। এই বিষয়ে একটি প্রবাদ মনে পড়ে গেল, 'যাহা করেন গিন্নি বলেন কেষ্টা বেটাই চোর।' দেশের কোনো প্রান্তে যে কোনো ঘটনার জন্য হরহামেশা যাচাই-বাছাই ছাড়াই বলা হয়, এ ঘটনার সঙ্গে জামায়াত-শিবির জড়িত। সাভারে রানা প্লাজা ধসে পড়ার পর সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, হরতাল সমর্থকদের ঝাঁকুনিতে এটি ঘটেছে। নারায়ণগঞ্জে ত্বকি হত্যার পর জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করা হয়। পরবর্তীকালে আসল দোষীর খোঁজ পাওয়া যায়।

সর্বোপরি এটাই বলতে পারি, অপরাধীরা বীর দর্পে ঘুরে বেড়ায় আর নিরীহ মানুষই বারবার জুলুমের শিকার হয়। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে রাসুল (সা.)- কে

অবমাননার অজুহাতকে পুঁজি করে রামুর মন্ডলপাড়া থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগ নেতার ভাই হাফেয মোহাম্মদ। জেলা ছাত্রলীগ নেতা সাদ্দাম হোসেন। মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী মৎস্যজীবী লীগের রামুর সভাপতি আনসারুল হক ভুট্টো। মিছিলটি থেকে শেষে চৌহমুনী চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বৌদ্ধ বসতিতে হামলার উসকানি দেয়া হয়। (সূত্র : দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৬ অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা-১৬) উখিয়ার কোটবাজার স্টেশন থেকে বের হয় আরেকটি মিছিল। এখান থেকে হামলা করা হয়েছিল পূর্ব রত্না পাল সুদর্শন বৌদ্ধ বিহারে। মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন হলুদিয়া পালং ইউপি চেয়ারম্যান মিন্টু চৌধুরী, উখিয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল হক চৌধুরী। (সূত্র : দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১৫ অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা-১) গত ৫ মার্চ মঙ্গলবার ২০১২, বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার শেরপুর শহীদিয়া আলিয়া মাদরাসা শহীদ মিনার ভাঙচুরের সময় ধরা পড়ে শহর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক তবিবুর রহমান টিপু। অথচ সেখানেও জামায়াত-শিবিরকে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র চলছিল।

৫. যুবলীগ-প্রভাবশালী যোগসাজশে ১৪ হিন্দু পরিবার উচ্ছেদ

স্থানীয় যুবলীগ কর্মীর আশ্রয়ে প্রভাবশালীরা ১৪ হিন্দু পরিবারকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে। বরগুনার তালতলী উপজেলার পঁচাকোড়ালিয়া ইউনিয়নের উত্তর গাববারিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। যুবলীগ কর্মীদের সহযোগিতায় স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ও সন্ত্রাসীদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নামমাত্র দামে ভিটেমাটি বিক্রি করে চলে গেছেন এ গ্রামের ১৪টি হিন্দু পরিবার। তাদের কেউ কৃষক, কেউ চা-পানের দোকান চালিয়ে সংসার চালাতেন। ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া যাদব সরকার ২০১৫ সালের ২৩ মার্চ তালতলী থানায় তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচারের বিষয়ে একটি মামলা করেন। মামলার পর এলাকার মুনসুর আকনের ছেলে আবদুর রশিদ আকনকে (৪২) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যাদব সরকারের অভিযোগ, বছর তিনেক আগে আবদুর রশিদ তাদের কাছে চাঁদা দাবি করতেন। তার স্কুলপড়ুয়া মেয়েকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয়দের কাছে বিচার চেয়ে কোন ফল পাননি।

যাদব জানান, নির্যাতন সইতে না পেরে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে তিনটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে বরগুনা শহরে আশ্রয় নেয়। একই কারণে ২০১৪ সালের শুরুর দিকে আরো দুটি পরিবার শহরে চলে যায়। তিনি জানান, গত ১১ মার্চ রশিদসহ ২০-২৫ জন এসে ওইসব হিন্দু পরিবারের কাছে চাঁদা দাবি করে। অন্যথায় ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বলে। হত্যার হুমকিও দেয়। এ কারণে গত ১৩ মার্চ গ্রামের নয়টি হিন্দু পরিবার একযোগে ভিটেমাটি ত্যাগ করে বরগুনার বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নেয়।

এলাকাবাসী বলছে, আবদুর রশিদের পেছনে ওই গ্রামেরই হাকিম আলী সরদারের ছেলে যুবলীগকর্মী জাকির হোসেন ও তার ভাই আবদুস সালাম রয়েছেন। তাদের ইঙ্গিতেই গ্রামে হিন্দুদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যাদব সরকার ছাড়াও পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, কার্তিক রায় (৬০), হরেন রায়

(৫৫), মাধব সরকার (৪৫), ধীরেন সরকার (৭৫), সুভাষ সরকার (৪৪), রমেশ সরকার (৩২), রিপন রায় (৪০), নীলা রানী (৫০), রনজিৎ সরকার (৬০), শ্যামল (৪১), সুমন্ত (৪২), বাবুল (৩৫) ও জিতেন রায় (৬৫)। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ, ২৭.০৩.২০১৫)

৬. মন্দির ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ গুলিবর্ষণ

১১ এপ্রিল ২০১৫ শনিবার রাত পৌনে ১২টার দিকে একদল সন্ত্রাসী ককটেল ও দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উল্লাপাড়া পৌরশহরের ঝিকিড়া কালী মন্দিরে হামলা চালিয়ে ১০টি মূর্তি ভাঙচুর ও মন্দিরের জিনিসপত্র তছনছ করেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিজিবির আগমন টের পেয়ে হামলাকারীরা বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ প্রায় ৪০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এর আগে হামলাকারীরা উল্লাপাড়া পাটবন্দরে ব্যবসায়ী শ্যামল দাসের পাটগুদামের গদিঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পৌরশহরের ঘোষগাঁতী বলরাম মন্দির চত্বরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। (সূত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত)

৭. মুখোশ পরে মন্দিরে হামলা, গণপিটুনিতে প্রাণ গেল ছাত্রলীগ কর্মী

মুখোশ পরে রাতের আধাঁরে মন্দিরে হামলা করতে গিয়ে জনতার গণধোলাই খেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন এক ছাত্রলীগ কর্মী। ২০১৫ সালের ১৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরীর টাইগারপাস মালিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত ছাত্রলীগ কর্মীর নাম সাদ্দাম (৩৫)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুখোশপরা ১০ থেকে ১২ জন যুবক মালীপাড়া কালী মন্দিরে হামলা চালায়। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় একজনকে ধরে গণপিটুনি দেয়া হয়। পরে মুখোশ খুলে নিহত সাদ্দামের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ, ১৮.৪.২০১৫)

সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনে আ'লীগের নেতাকর্মীরা জড়িত : হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট নেতারা অভিযোগ করেছেন, দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন এবং সম্পদ দখলের ঘটনায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা সরাসরি যুক্ত রয়েছে। তারা সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার ও সম্পদ দখলের ঘটনা দ্রুত বন্ধের দাবি জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি অপরাধী যেই হোক না কোনো তাদের আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তারা। তারা বলেন, ধমীয় সংখ্যালঘুরা কোনো একক দল বা গোষ্ঠীর ভোটের রাজনীতির শিকার হতে চায় না।

জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তুলে ধরেন সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ। এতে সাবেক মন্ত্রী ও সংগঠনটির আহ্বায়ক গৌতম চক্রবর্তী লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবাধিকার সংগঠনের সরেজমিন তদন্তে এসব অভিযোগের প্রমাণ রয়েছে উল্লেখ করে গৌতম চক্রবর্তী তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন হচ্ছে। তবে কোনো ঘটনার বিচার হয়নি। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর যেসব অমানবিক নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে তা অকল্পনীয়। ২০১২ সালে কক্সবাজারের

রামু, উখিয়া ও চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরে অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর-লুট ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। দেশ ও বিশ্ব সম্প্রদায় তাতে হতবাক হয়েছে। রামুতে হাজার বছরের ধর্মীয় পুঁথিপুস্তকসহ শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ মঠ, মন্দির বা বিহার ধবংস করা হয়েছে, যা বর্বর পাকিস্তানিদের সময়ও হয়নি।

গৌতম চক্রবর্তী আরো বলেন, ২০১৩ সালে সারা দেশে শতশত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, মন্দির-মঠ ধ্বংস, লুট ও জবরদখল হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা এসব ঘটনা ঘটলেও সরকারের পক্ষ থেকে এসব বিষয়ের কোনো প্রতিকার হয়নি। বরং বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একে অপরের ওপর দোষ চাপানোর কারণে প্রকৃত দোষী শাস্তি বা বিচারের আওতায় আসেনি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিচারহীনতার কারণে হতাশা ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিনাতিপাত করে যাচ্ছে।

চলমান সহিংসতা এবং সম্পদ দখলের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে অভিযোগ এনে গৌতম চক্রবর্তী বলেন, দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কোনো ঘটনার সুষ্ঠু বিচার না হওয়াতে অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে। ধর্ষণ, খুন, মন্দিরে আগুন ও মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে গৌতম চক্রবর্তী বলেন, তারা শিগগিরই একটি সভা করে সারা দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে বড় ধরনের কর্মসূচির ডাক দেবেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতাদের মধ্যে ছিলেন– অ্যাডভোকেট জন গোমেজ, অমলেন্দু দাস অপু, জয়ন্ত কুমার কুণ্ড, নুকুল সাহা, সুশীল বড়ুয়া, মানিকলাল ঘোষ, তুরুণ দে, মিল্টন বৈদ্য, হিমাদ্রী শেখর মণ্ডল। (সূত্র: দৈনিক নয়াদিগন্ত,৭ মে ২০১৬)

৮. আতংক কাটেনি নাসিরনগরে : প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু মন্দির ও বাড়িঘরে হামলা-ভাংচুরের ঘটনায় উস্কানিদাতা হিসেবে যাদের নাম উঠে এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছেন চাতলপাড় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরুজ আলী, নাসিরনগর উপজেলা কমপ্লেক্স মসজিদের ইমাম মুখলেছুর রহমান প্রমুখ। কাশীপাড়ায় গিয়ে দেখা গেছে নারী-পুরুষের চোখে-মুখে ভয় আর আতংকের ছাপ। স্থানীয় অঞ্জন চৌধুরী জানান, আমার মেয়েরা ভয়ে আজ স্কুলে যেতে চাচ্ছিল না। সারারাত পরিবারের কেউ ঘুমাতে পারিনি। উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল দত্ত বলেন, বিক্ষোভের পর থেকেই আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ওসিকে বারবার ফোন করে পুলিশ মোতায়েনের জন্য অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা তা আমলে নেয়নি। সমাজকর্মী বশির উদ্দিন তুহিন বলেন, প্রশাসন ও পুলিশের অবহেলার কারণেই নাসিরনগরে এমন বর্বর কাণ্ড ঘটেছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম চৌধুরী বলেন, আমরা বুঝতে পারিনি যে সভার অনুমতি দিলে এমন কাণ্ড ঘটবে। যে কারণে অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিইনি। থানার ওসি আবদুল কাদের বলেন, কিভাবে এমন কাণ্ড হলো আমাদের হিসাব মিলছে না।

ধর্মের নামে অরাজকতা প্রশ্রয় দেবে না আ'লীগ-হানিফ : আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ বলেছেন, ধর্মের নামে অরাজকতা প্রশ্রয় দেয়া হবে না। নাসিরনগরের হামলার ঘটনায় তদন্তসাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। ধানমণ্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের পক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগরের ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের পাশে আছি আমরা। আওয়ামী লীগ প্রত্যেকে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কারও ধর্ম নিয়ে আমরা কটাক্ষ সহ্য করব না। মিথ্যাচার করে ধর্মীয় উন্মাদানা সৃষ্টি করে অন্য ধর্মের প্রতি আঘাত করা আমরা কখনও বরদাশত করব না। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন-সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজ্জাম্মেল হক, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল প্রমুখ। (সূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ২ নভেম্বর ২০১৬)

তবে এ ঘটনার সর্বশেষ কি ঘটেছিল তা সবারই জানা। সংখ্যালঘুরাই ক্ষমতার স্থায়ী আসন লাভের পথে একটি ব্যবহৃত টিস্যু পেপার মাত্র। আওয়ামীলীগের বক্তব্য ও বাস্তব কাজের মাঠে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

৯. নীলফামারীতে মন্দিরে আগুন দিয়ে জামায়াতের নামে পোস্টার

নীলফামারীতে একটি মন্দিরে আগুন দিয়ে হিন্দুদের হুমকি দিয়ে জামায়াতের নামে পোস্টার টাঙ্গিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার ভোরে জেলার ডিমলা উপজেলার খালিশা চাপানী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের কাকিনা চাঁপানী সার্বজনীন পুরাতন দুর্গামন্দিরে এ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। দুষ্কৃতকারীরা পোস্টারের জামায়াত-শিবির বাংলাদেশ জিন্দাবাদ লিখে পোস্টার সেটে যায় দেয়ালে। এই লেখা থেকেই পরিদর্শনকারী ক্ষমতাসীন জোটের নেতা-কর্মীরা পানি ঘোলা করতে থাকে। তারা এলাকাবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যুদ্ধাপরাধের মামলায় ফাঁসিতে দন্ডিত জামায়াত নেতা কামারুজ্জামানের পক্ষ অবলম্বন করে জামায়াত-শিবির নেতাকর্মীরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ, ১৫.০৪.১৫)

১০. মাগুরায় সংখ্যালঘু পরিবারের ৫৭ শতক জমি দখল

মাগুরা সদর উপজেলার আঙ্গারদাহ গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের ৫৭ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করেছে এলাকার প্রভাবশালী প্রতিবেশীরা। অসহায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক অখিল চন্দ্র বিশ্বাস ও তাঁর পাঁচ ভাই নিরাপত্তার অভাবে সে জমির নিকটে যেতে পারছেন না। প্রায় ৫৫ বছর যাবত নিজেদের ভোগ দখলে থাকা পৈতৃক জমি হারিয়ে এ ভুক্তভুগি সংখ্যালঘু পরিবার এখন প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নিরুপায় হয়ে শিক্ষক অখিল চন্দ্র বিশ্বাস মাগুরা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন। অভিযোগে জানা গেছে, স্কুল শিক্ষকের পিতা সতিশ চন্দ্র বিশ্বাস ও ২ কাকা আঙ্গরদাহ মৌজার ৯৮ নং খতিয়ানের ২০১ নং দাগের ৫৭ শতক জমি বিগত ১৯৬১ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে ৩০৩৮ নং রেজি: কবলা দলিল মূলে খরিদ করেন। (সূত্র : দৈনিক আমার দেশ, ২৩.০২.১৮)

১১. সংখ্যালঘু নারীকে ধর্ষণ, আ.লীগ নেতা গ্রেফতার

বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সংখ্যালঘু এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ঢাকার ধামরায়ের সোয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ধামরাই উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার রাতে মামলা দায়েরের পরপরই তাকে সাভার ব্যাংক কলোনি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই নারী জানান, বছর দেড়েক আগে হাফিজুর তাকে দেখে পছন্দ করেন। এর পর থেকে তাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। এক পর্যায়ে হাফিজুরের ভয়ে তার স্বামী তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হন। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর বছর খানেক আগে হাফিজুর তাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সাভার নিয়ে আসেন। সাভার আনার পর তাকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে সাভার পৌরসভার ব্যাংক কলোনি মহল্লায় বাসা ভাড়া নেন। এরপর থেকে তারা স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে ওই বাসায় বসবাস করছিলেন। এ সময় তিনি বিয়ে করার জন্য হাফিজুরকে চাপ দেন। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ, ২০.০১.২০১৫)

১২. সংখ্যালঘু শিশুকে ধর্ষণ করে যুবলীগ নেতা হাতেনাতে ধরা

হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের এক শিশুকে ধর্ষণের সময় স্থানীয়রা যুবলীগের এক নেতাকে হাতেনাতে আটক করেছে। তার নাম শামছুল মিয়া চৌধুরী (৩২)। তিনি উপজেলার কাগাপাশা ইউনিয়ন যুবলীগের জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি বলে জানা গেছে। ২০১৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দিবাগত রাত ১টার দিকে স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধর্ষণ করার সময় হাতেনাতে আটক করে গণপিটুনী দেয়। পরে তার হুমকির কারণে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখন শামছুল মিয়া সেখানে উপস্থিত সবাইকে শাসিয়ে বলেন, এ ঘটনা নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তিনি তাঁকে 'দেখে নেবেন'। শনিবার সকালে ধর্ষিতা শিশুর মা যুবলীগ নেতা শামছুলের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। পরে দুপুরে এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। (সূত্র: দৈনিক আমার দেশ, ১৩.০৯.২০১৫)

মানুষের মুখ আর বন্ধ করা সহজ নয়। প্রত্যেক সচেতন মানুষই আজ একেকজন সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করছেন। অনেক কিছু ইচ্ছে করলেও গোপন করার আর সুযোগ নেই। সব কিছুতেই আওয়ামী লীগ রাজনীতিকরণ করে এমন এক নোংরা সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তা দু:খজনক। আওয়ামীলীগের এই নষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে আজ জেগে ওঠেছে এ দেশের মানুষ। এমন অপকর্মের জন্য আওয়ামী লীগকে সামনের দিনগুলোতে চরম খেসারত দিতে হবে। যে জনগণকে নিয়ে তারা খেলা করেছে; সেই জনগণই তাদেরকে লালকার্ড দেখিয়ে রাজনীতির মাঠ ছাড়া করে ছাড়বে। সে দিন বুঝি আর বেশি দূরে নয়, সবাই অপেক্ষায় আছে সেই সময়ের।

নারী নির্যাতন

“

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, শঙ্কা আর অজানা আতঙ্কে দেশবাসী। সর্বত্র অপহরণ, গুম, খুন সব মিলিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। মৃত্যু উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দেখছে একের পর এক নারী নির্যাতনসহ অনেক রক্তাক্ত ঘটনার চিত্র। এই দায়ভার সরকারের। যখন একটি রাষ্ট্র জননিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্র অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ক্রমে ক্রমে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা অবনতির দিকে যায়। আমাদের রাষ্ট্রটি এখন ব্যর্থতার কিনারে।

”

ঘরে বাইরে নারী নির্যাতন থামিয়ে দেয়ার এখনই সময়

আজাদ কালাম

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, শঙ্কা আর অজানা আতঙ্কে দেশবাসী। সর্বত্র অপহরণ, গুম, খুন সব মিলিয়ে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ। মৃত্যু উপত্যকার ওপর দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। পর্যবেক্ষকদের অভিমত, এ পরিস্থিতিতে মানুষের ওপর মানুষের আস্থা-বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে। এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দেখছে একের পর এক নারী নির্যাতনসহ অনেক রক্তাক্ত ঘটনার চিত্র। পত্রিকার পাতা উল্টালে অথবা টেলিভিশনের সুইচ অন করলেই দেখা যাচ্ছে লাশের মিছিল। দেখা যাচ্ছে গুম, খুন, অপহরণ, আটক বাণিজ্য, ক্যাম্পাস দখল, মুক্তিপণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের যত সব ফিরিস্তি। দেশের যেকোনো সময়ের চেয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখন সীমা অতিক্রম করেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। আর এ দায়ভার থেকে যায় একটি রাষ্ট্রের ওপর। যখন একটি রাষ্ট্র জননিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্র অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ক্রমে ক্রমে আইনশৃঙ্খলার অবস্থা অবনতির দিকে যায়, রাষ্ট্র ব্যর্থতার কিনারে ধাবিত হয়। রাষ্ট্রের ব্যর্থতার সকল দায়-দায়িত্ব সরকারের ওপরেই বর্তায়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না– বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে এক পরিচিত

নাম। অনেক দেশের কাছে এ দেশটির আবহাওয়া ও জলবায়ুর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। কিন্তু ইদানীং অপহরণ, গুম, খুন ও নারী নির্যাতন সর্বোপরি আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে শুধু দেশবাসী নয়, আন্তর্জাতিক মহলও বাংলাদেশের হালের আইনশৃঙ্খলার এ বিপর্যস্ত অবস্থা নিয়ে চিন্তিত। বাস্তব ক্ষেত্রে গুম, খুন, নারী নির্যাতন, আটক বাণিজ্য, দলীয় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অপসংস্কৃতি এখনকার প্রতিদিনের নিত্য খবর। সাম্প্রতিক সময়ের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। ফেসবুক, অনলাইন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায়, গত ৩ অক্টোবর, ২০১৬ সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজা বেগম নার্গিস ডিগ্রি পাস কোর্সের পরীক্ষা শেষে ক্যাম্পাস ত্যাগ করার সময় শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা বদরুল আলম তার ওপর চড়াও হয়। মাটিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে চাপাতি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উপর্যুপরি কোপায়। কোপানোর চিত্র দেখতে পেয়ে আশপাশের সাধারণ জনতা মেয়েটিকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে এবং হাতেনাতে ধরে বদরুলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বদরুল এখন জেলখানাতে আর খাদিজার ঠিকানা এখন হাসপাতালের বেডে। উল্লেখ্য, খাদিজাকে দীর্ঘদিন ধরে বদরুল নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করে আসছিল। খাদিজার ওপর এ হামলায় সারাদেশের মিডিয়াগুলো সোচ্চার হয়ে তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে যথেষ্ট দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। খাদিজার ওপর হামলাকারী বদরুলের বিচার চেয়ে মানববন্ধন, মিছিল করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, বিভিন্ন সাহিত্য ও সামাজিক সংগঠন। খাদিজার ওপর এই নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে বিক্ষুব্ধ জনতা। এখন দায়িত্ব প্রশাসনের। দেখা যাক খাদিজা কী ন্যায়বিচার পান নাকি তনুর ভাগ্য বরণ করেন। প্রতিদিন অসংখ্য নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও আমাদের সামনে সব নজির ও সংবাদ আসে না। কিছু দিন আগে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী তনুর ওপর নির্যাতন ও হত্যার যথাযথ রিপোর্টটি আজও প্রকাশ করতে পারেনি প্রশাসন।

গত ২০ মার্চ তনুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল নিরাপত্তার চাদরে আবৃত কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায়। কিভাবে সেখানে লাশ পড়ে থাকল? এই প্রশ্নের উত্তর দেশবাসীর কাছে এখনও আসেনি। প্রথম ময়নাতদন্তের দুই সপ্তাহ পর ৪ এপ্রিল রিপোর্ট জমা হয়। রিপোর্টে ধর্ষণ বা হত্যার কোনো চিহ্ন নাকি পাওয়া যায়নি। এদিকে ফাইনাল প্রতিবেদন দেয়া-নেয়া চলতে চলতে গড়িয়ে যায় দিনের পর দিন। আজ আর কেউ মনে রাখেনি তনুকে। তনুর বাবা একজন নিম্ন আয়ের সাধারণ কর্মচারী বলে কি তনু হত্যার বিচার হবে না এই দেশে! মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান গত বছর আগস্ট মাসে এক বক্তব্যে বলেছিলেন, "রাজনৈতিক আশ্রয় থাকলে আইন তাকে স্পর্শ করে না।" এবারও তনু হত্যার ব্যাপারে 'জজমিয়া' নাটক যেন না হয় সে জন্য তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কঠোর হওয়ার আহবান জানিয়েছিলেন। নারী নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলছে। কোনো জায়গায়ই যেন নিরাপদ নয় আমাদের মায়ের জাতি। পরিবার থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান কোথাও যেন নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। ছোট্ট শিশু তার পরিবার ও প্রতিবেশীর কাছে নিরাপদ নয়। একজন কর্মজীবী মহিলা তার কর্মস্থলে নিরাপদ নয়। একজন গৃহিণী তার পরিবারেও

নিরাপদ নন। অতি সাধারণ একজন রোগী সেফহোম ও নার্সিং হোমে বা হাসপাতালে নিরাপদ নন। এভাবে পদে পদে নারী নির্যাতনের ধারা আরো বেড়ে চলেছে। কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম রেঞ্জে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আখতারের স্ত্রী মিতু হত্যার শিকার হন। শিশুপুত্রকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় কে বা কারা তাকে গুলি করে হত্যা করল তার খোঁজ আজও জানা যায়নি। দু'টি মাসুম বাচ্চা নিয়ে চাকরিচ্যুত পুলিশ কর্মকর্তা আজ নিরুপায় জীবন যাপন করছেন। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো স্পষ্ট জবাব মিডিয়ার কাছে প্রকাশ করতে পারেনি।

সম্প্রতি তেজগাঁও কলেজ ছাত্রলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে আফসানা নামে একটি মেয়েকে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল। সে ঘটনাটিও সময়ের স্বাভাবিক প্রবাহে তলিয়ে গেছে। হয়তো মিডিয়ার সামনে যৎসামান্য প্রকাশ করলেও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার সাহস নেই কারো। প্রতিনিয়ত অহরহ ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটছে। হাজারো খাদিজা, হাজারো তনু, মিতু ও আফসানা বহুমুখী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু সময়ের অনিবার্যতায় তা আবার কালের কঠিন নিয়তির শিকার হয়ে বিচারের বাণীকে নিভৃতে কাঁদায়। এ ব্যাপারে যদি আমরা দেশের কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিই তাহলে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থা। 'রেকর্ড ভেঙেছে নারী নির্যাতনের হার' নামক শিরোনামে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর, ৫ এপ্রিল, ২০১৬ এর প্রতিবেদনে সত্যিই নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের এক জরিপে জানা যায়, ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা ৭৪ শতাংশ বেড়েছে। ব্র্যাকের নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটির তথ্য মতে নারীর প্রতি সহিংস ঘটনার ৬৮ শতাংশই নথিভুক্ত হয় না। নথিভুক্ত হলে সংখ্যাটি আরো বাড়তো। ব্র্যাকের সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচির পরিচালক আন্না প্রিন্স বলেন, সাধারণত যে পরিবারের মেয়েরা নির্যাতনের শিকার হন তারা আইনি সেবা নিতে উৎসাহ দেখান না। বেশির ভাগ ঘটনার ক্ষেত্রেই মাত্র এক-চতুর্থাংশ মামলা হয়। আইনি দীর্ঘ সূত্রতাসহ অর্থসঙ্কটের কারণে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্যাতিত পরিবার আসামিপক্ষের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে বা সামাজিক উপায়ে আপস করে ফেলে। বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ২০১০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা ছিল ১৭ হাজার ৭৫২। ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ২১০। (তথ্যসূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ৫ এপ্রিল, ২০১৬)

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন-সংস্থা, বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত নারী নির্যাতনের তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ ১১ বছর দুই মাসে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছে, হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে ও আত্মহত্যা করেছে ৫৬ হাজার ৬৫৬ নারী। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যানুযায়ী চলতি বছরে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১০৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে তিনজনকে।

এ দিকে লজ্জাজনকভাবে মেয়েশিশু পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পাচ্ছে না। শিশুদের নিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করা সংগঠন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) তথ্যানুযায়ী ২০১৪ সালে ১৯৯টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। ঠিক পরের বছর ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার হয় ৫২১টি শিশু, যা ২০১৪ সালের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ বেশি। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে ৬৭ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। এর মধ্যে পাঁচজন গণধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় দুই শিশুকে। এছাড়া সংগঠনটির পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০১২ সালে ৮৬ শিশু, ২০১৩ সালে ১৭০ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়।

পুলিশ সদর দফতরের তথ্যানুযায়ী ২০১৫ সালে সারা দেশে ২১ হাজার ২২০ জন নারী-শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনাও রয়েছে। ধর্ষণের শিকার নারী-শিশুর চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানায়, প্রতিদিন গড়ে চার থেকে পাঁচজন ধর্ষণের শিকার নারী-শিশু চিকিৎসার জন্য আসে।

মানবাধিকার কর্মীরা মতামতে বলেছেন, 'ঢাকার মতো শহরে যেখানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে; সেখানে গ্রামে কিংবা নিভৃত পল্লীতে এর প্রবণতা আরও বেশি। সাম্প্রতিক সময়ে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা কয়েকগুণ অভিযোগ হয় না।' মানবাধিকার সংস্থা বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী এলিনা খান বলেন, 'খবরের কাগজে যা দেখা যায় ধর্ষণের প্রকৃত ঘটনা তার চেয়েও বেশি। অপরাধীরা মনে করে ভিকটিম থানায় মামলা করবে না, এ জন্য ধর্ষণের প্রবণতাও বাড়ছে। (তথ্যসূত্র : দৈনিক যুগান্তর, ৫ এপ্রিল, ২০১৬)

অন্য দিকে গণধর্ষণের শিকারের ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন বেড়েছে ২৩ শতাংশ। শুধু ধর্ষণ বেড়েছে ২১ শতাংশ। গত বছর প্রতিনিয়ত গড়ে দু'জনের বেশি নারী এবং শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। গণধর্ষণ বেড়েছে ১৪ শতাংশে। তবে ২০১৬ সালে এখন পর্যন্ত যেসব ঘটনা তাতে আগের পরিসংখ্যান ছাড়িয়ে যাবে। (তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি, ২০১৬)

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭৪২ জন নারী, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৮২ জনকে, যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৫৯, এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছে ৩৫ জন, অপহৃত হয়েছে ৯২, পাচারের শিকার হয়েছে ৪৭ জন, যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ১৯২ জনকে, যৌতুকের কারণে নির্যাতন করা হয়েছে ১৭৩ জনকে।

গৃহপরিচারিকা হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৩০টি, শারীরিক নির্যাতনের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ৪৬টি, নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়েছে ৬৫৭ জনকে। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে

১৪৫ জনের, আত্মহত্যা করেছে ২৯৮ জন, উক্ত্যক্তের শিকার ৩১৯, বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে ৮৫ জন, পুলিশি নির্যাতনের শিকার ৩৬ জন এবং শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে ৯৩ জন।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ কর্তৃক 'নিরাপদ নগরী নির্ভয়ে নারী' শীর্ষক নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা ও হয়রানির বিষয়ে এক গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্ট তৈরিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও নারায়ণগঞ্জ শহরের ১ হাজার ২০০ নারী-পুরুষের ওপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৮০০ নারী ও কিশোরী, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৫৯ বছরের, তাদের মধ্যে রয়েছে ৪০০ জন পুরুষ। গবেষণায় অংশ নেয়া নারীর ৮৮ শতাংশ বলেন, তারা পথচারী, পুরুষ যাত্রী এবং ক্রেতাদের দ্বারা হয়রানির শিকার হন। শহরের ৯৭ শতাংশ নারী যৌন হয়রানিকে সহিংসতা মনে করেন। তারা মনে করেন, পুলিশের সাহায্য সহায়তা চাইলে সমস্যা বাড়ে। যৌন সহিংসতা এড়াতে ৬৪ ভাগ নারী রাতে ঘরের বাইরে যান না। নিরাপত্তাহীনতার কারণে ৬০ ভাগ নারী রাতে ঘরের বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে দলগতভাবে যেতে চান। নগরের ৪৭.৫ ভাগ নারী গণপরিবহন, রাস্তা কিংবা উন্মুক্ত জনবহুল এলাকায় চলাফেরা করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। গবেষণায় অংশ নেয়া ৮১ শতাংশ মানুষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কাছে সহায়তার জন্য যেতে চায় না। গবেষণায় বলা হয়েছে, মানুষ চলাচলের জায়গায় ৮৫ শতাংশ নারী মর্যাদাহানিকর উক্তির শিকার হয়েছেন, ৪৬ শতাংশ নারী যৌনতাপূর্ণ অশ্লীল কথা শুনেছেন। রাস্তায় নারীরা যৌন হয়রানির শিকার বেশি হন। ৮৫ শতাংশ নারী ও ৭৭ শতাংশ পুরুষ বলেছেন, নারী হয়রানির শিকার বেশি হয় রাস্তায় বা ফুটপাথে।

'বিবাহিত নারীদের ৮০ শতাংশ নির্যাতনের শিকার' (তথ্যসূত্র : দৈনিক সংবাদ, ৩ অক্টোবর, ২০১৬) দেশে বর্তমানে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৮০ জনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার। আর সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন স্বামীর হাতে। কিন্তু পারিবারিক সম্মানসহ বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে অধিকাংশ নারী নীরবে এ নির্যাতন সহ্য করেন। যদিও সর্বশেষ সরকারি জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, দেশে গত চার বছরে বিবাহিত নারীদের নির্যাতন কমেছে ৭ শতাংশের মতো। তবে সরকারের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী মনে করেন 'এ তথ্যে খুশি হওয়ার তেমন কিছু নেই। কারণ নির্যাতনের হার এখনো ভয়াবহ আছে।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ 'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন সার্ভে ২০১৫' শীর্ষক দ্বিতীয় জরিপের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। বিবিএসের এ জরিপ পরিচালনায় সহায়তা করে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

জরিপমতে বর্তমানে বিবাহিত নারীদের ৮০ দশমিক ২ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের

নির্যাতনের শিকার। ২০১১ সালে প্রথম জরিপে এর সংখ্যা ছিল ৮৭ দশমিক ১ শতাংশ। অর্থাৎ চার বছরে নির্যাতনের হার কমেছে ৭ শতাংশ। তবে এই বিবাহিত নারীরা আগের মতোই সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন স্বামীর হাতে। কিন্তু অধিকাংশই কাউকে কোনো অভিযোগ করেন না। এ ছাড়া স্বামীদের নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের কারণে নির্যাতনের সংখ্যা নিয়ে জরিপ প্রতিবেদনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিবাহিত নারীর ১৫ শতাংশই এ ধরনের নির্যাতনের শিকার। জরিপে আরো বলা হয়েছে, ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী বিবাহিতা নারীরা শারীরিক নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে থাকেন বেশি। দরিদ্র নারীদের বেশি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। জরিপ মতে, স্বামীর হাতে নির্যাতনের ঘটনা সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকার (৫৪.৪%) তুলনায় গ্রামেই (৭৪.৮%) বেশি। সিটি কর্পোরেশনের বাইরে অন্যান্য শহরে নির্যাতনের হার ৭১ শতাংশ। রাজশাহী বিভাগে শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা বেশি। ৪১ শতাংশের বেশি নারী জানিয়েছেন, জীবনভর স্বামীর শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের কারণে তাদের বিভিন্ন আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ২৮ শতাংশের বেশি নারীকে আঘাতের কারণে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন ৪ শতাংশের বেশি নারী। (তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর, ২০১৬)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রী নিপীড়নের জরিপে বলা হয়েছে, '৮৪% শিক্ষার্থী মনে করেন নিরাপত্তা পর্যাপ্ত নয়।' (তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৫)

যৌন হয়রানির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এমনটি মতামত দিয়েছেন। সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪ শতাংশ শিক্ষার্থী মনে করেন, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। ৮৫ ভাগ শিক্ষার্থীর মতে এসব প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির বেশির ভাগ ঘটনা প্রকাশ পাচ্ছে না। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো বিষয়ক প্রকাশের ভিত্তি জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। 'বিল্ডিং ইনস্টিটিউশনাল ক্যাপাসিটিজ অব সিলেক্টেড ইউনিভার্সিটিজ টু প্রিভেন্ট ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন' শীর্ষক প্রকল্পের ভিত্তি জরিপটি 'বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডবিউএলএ) এবং জাতিসংঘ নারীবিষয়ক সংস্থা (ইউএন উইমেন)-এর উদ্যোগে করা এ জরিপে বুয়েট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে নেয়া হয়েছে। দেশের ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৯টি এবং ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনা মেনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি করা হয়েছে। বিএমডব্লিউএল-এর জরিপ বলছে, ৪৩ শতাংশ ছেলে অভিযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানেন।

এ ছাড়া গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর এক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা গেছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কোনো না কোনো ভাবে যৌন নির্যাতন বা যৌন নিপীড়নের শিকার হন। দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ৮৩% ছাত্রী ছাত্রবন্ধু, শিক্ষক, সহপাঠী কর্তৃক ক্লাসে, লাইব্রেরিতে, রেস্তোরাঁয়, ক্যান্টিনে নির্যাতনের

শিকার হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্তৃক যৌন নির্যাতনের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'আলোর মুখ দেখেনি ঢাবির ২০ যৌন হয়রানির তদন্ত"। (তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৪ মে, ২০১৫)

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ (কুষ্টিয়া) দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনার সংবাদ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে জানা গেছে। কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নজির খুব কম ঘটেছে। এসব অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয় এবং ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু প্রতিবেদনটি আলোর মুখ না দেখে অধরাই রয়ে যায়।

সমাজের সকল ক্ষেত্রে চলছে নির্যাতনের এক ভয়াবহ ধারা। একজন মেয়েশিশু হয়ে তার কোনো নিরাপত্তা যেন সমাজে নেই। যেমন আপনজনের কাছে নেই, আবার সমাজের কোনো স্থানেও যেন নিরাপত্তার বালাই নেই। কথায় বলে 'রক্ষক যখন ভক্ষক' সে অবস্থার আরেকটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা একান্ত জরুরি। 'সেবা নিতে আসা ৮৫% শিশুই ছিল ধর্ষণের শিকার'। (তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৯ আগস্ট, ২০১৬) গত ১৫ বছরে বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়ে সরকারি সেবাকেন্দ্রে আসা নারী ও শিশুর সংখ্যা ২১ হাজারের বেশি। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশই শিশু এবং তাদের ৮০ শতাংশই ধর্ষণের শিকার। বাকি শিশুরা গৃহকর্মী হিসেবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের মোট আটটি সেবাকেন্দ্রে গত জুলাই মাস পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে এ চিত্র ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম বলছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ধর্ষণসহ যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে ৩৪৭টি শিশু। এর মধ্যে শুধু গণধর্ষণের শিকার ছিল ৬১ শিশু। ৩৪৭টি শিশুর মধ্যে চারটি ছেলে শিশুও এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়। ফোরামের তথ্য মতে, ২০১২ সালে শিশুধর্ষণের সংখ্যা ছিল ৮৬। বছরটিতে ধর্ষণের চেষ্টাসহ মোট ৯১ জন এ ধরনের সহিংসতার শিকার হয়। ২০১৩ সালে ধর্ষণের পর হত্যাসহ সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়ায় ১৮০তে। ২০১৪ সালে শুধু গণধর্ষণের শিকার হয় ২২টি শিশু। সব মিলিয়ে সংখ্যাটি ছিল ২২৭ জন।

সঙ্গত কারণে সময়ের অনিবার্য ভাবনায় অনেক পরিসংখ্যান, তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হলো সমাজ ও দেশের মানুষের অবগতির জন্য। যে নারী কখনো মা, কখনো স্ত্রী, কখনো বোন, কখনো সমাজের বিভিন্ন সম্মানজনক পেশায় আসীন হয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। দেশ-জাতির সর্বক্ষেত্রে সমদায়িত্ব পালনে রত রয়েছেন। কিন্তু তাদের প্রতি বিরাগভাজন হয়ে কেন এত নির্যাতন, কেন এত নিপীড়ন। দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে নারীদের অবদান আজ ফেলে দেয়ার নয়। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্বকে বিস্মিত করেছে সেখানেও নারীর অবদান অনস্বীকার্য।

সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আসে যে খাত, সেই পোশাক শিল্পের ৮০ শতাংশই নারী।

এ ছাড়া দেশের সকল পর্যায়ে নারীর অবদান অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তা আজ সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয়। বরং সমাজজীবনে নারী চরমভাবে অবহেলিত, উপেক্ষিত ও নির্যাতিত। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যেভাবে নারী নির্যাতন অব্যাহত ধারায় চলে আসছে, সেটি সমাজের হীন সংস্কৃতিরই পরিচয় বহন করে। এটাই সবচেয়ে লজ্জার কথা, উন্নয়ন নিয়ে গর্ব করার আগে সামাজিক এই ব্যাধি নিরসনের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় না। আজ আপনার মেয়ে, আমার বোন যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেটা কি দেশ ও জাতির জন্য কলঙ্ক নয়? বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের নারী নির্যাতন নিয়ে সাংঘাতিক রকম উদ্বিগ্নতা পরিলক্ষিত। খাদিজা, আয়েশা, তনু, মিতুর মতো আর কোনো নারীই যেন এ জাতীয় সংঘাতের শিকার না হয় সে ব্যাপারে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। সাথে সাথে সচেতন জনতাকে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। অন্য দিকে নারী-পুরুষ সবাইকে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। একটি সুন্দর জীবনের জন্য যেমন সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি একটি সমাজকে বাঁচাতে আজ সুস্থ সংস্কৃতির নান্দনিক বিকাশেরও প্রয়োজন। ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটারের এই বাংলাদেশ অসংখ্য শহীদের রক্তে গড়া। আর কোনো বোন কিংবা মায়ের আর্তচিৎকার আমরা শুনতে চাই না। তাদের আহাজারিতে যেনো কেঁপে না ওঠে কারো বুক কিংবা বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস।

লেখক : গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

দশ বছরে নারী নিরাপত্তা ও অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত

এম এস চৌধুরী

অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) বলেছেন-'সকল মানসিক রোগের মূলে আছে যৌনকামনা বা প্রবৃত্তির অবদমন। যৌনবেগ হচ্ছে মানুষের জীবনের মূল আবেগ। কিন্তু সমাজে এই আবেগের স্বত:স্ফূর্ত পূরণ সম্ভব নয়। বিভিন্নভাবে যৌন আবেগ ও ইচ্ছাকে অবদমন করা হয়। এই অবদমিত ইচ্ছা নিয়ে মনের বৃহত্তর এবং অচেতন ভাগের সংগঠন। অবদমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ এবং আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা এবং সচেতন মন বিবেক বা সেন্সরের প্রহরা ও প্রতিরোধ চেষ্টায় ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে। দ্বন্দ্বের তীব্রতায় ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। মি: ফ্রয়েড মনে করতেন সকল অন্তর্ঘাত ও অপরাধমূলক কাজের মৌলিক প্রেরণা যৌনানুভূতি। কাজেই একটি সমাজকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে হলে মানুষের স্বভাবজাত যৌন অনুভূতি প্রকাশকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রন মানুষের মনো জগত থেকে আসতে হবে। ধর্ম সেখানে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন ধর্ম অবাধ যৌন জীবন অনুমোদন দেয় না। সকল ধর্ম বলে সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন গঠনের মধ্যে তার যৌন সম্পর্কে এবং যৌন আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রন সীমায় রাখতে। রাষ্ট্রের এখানে রয়েছে গুরু দায়িত্ব। শুধু আইন প্রণয়ন করলেই সমাজকে স্থিতি স্থাপকতা দিতে পারে না। আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার বিগত দশ বছর আইনের নিরপেক্ষ ও যথাযথ প্রয়োগ না করায় দিন দিন সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃংখল পরিস্থিতি বাড়তে থাকে। আসলে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটি যখন 'wrong headed হন- তখন সবকিছুই wrong পথে পরিচালিত হতে বাধ্য।

আওয়ামী দু:শাসনের মারাত্মক প্রভাব পড়েছে নারী ও শিশুদের ওপর। চরম নিরাপত্তাহীন অরাজ পরিস্থিতির মধ্যে দেশের নারী ও শিশুদের কাল কাটাতে হচ্ছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধী চক্রকে উৎসাহিত করছে। বিশেষ করে সমাজের বিত্তহীন শ্রেণির নারী ও শিশুদের ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে নিরাপত্তা দিতে। সুবিচার পেতে। এর

কারণ দেশের শাসক আওয়ামী লীগ বীভৎস সংস্কৃতি লালন করে মনের ভেতর। এর প্রকাশ আমরা দেখেছি ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি বৈঠা নিয়ে তাদের তাণ্ডব। সাপকে যেভাবে মানুষ লাঠি দিয়ে আঘাতের পার আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে, তেমনি সেদিন তাজা মানুষগুলোকে লগি বৈঠা দিয়ে আঘাত করে নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রকাশ্যে। তারপর মৃত লাশের ওপর উঠে উদ্বাহু নৃত্য করে পিশাচ স্বভাবের মানুষগুলো। আওয়ামীলীগের শাসনামলে মারাত্মকহারে বেড়ে যায় ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা। এদের শাসনামলে সংঘটিত নারী ও শিশু নির্যাতনের উপযুপতির ঘটনাসমূহ হার মানায় আইয়্যামে জাহেলিয়া'র সময়কে। অথচ অত্যন্ত বেদনাদায়ক হচ্ছে এসব ঘটনার মধ্যে এমন অনেক ঘটনাই যা 'চাঞ্চল্যকর' হিসেবে আলোচিত -তার কোন বিচার বা বিচারিক কার্যক্রম (দৃশ্যত যা স্থবির) শুদ্ধভাবে সম্পাদন করা হয়নি। এর মধ্যে সাংবাদিক সাগর রুনি হত্যাকাণ্ড, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ায় 'তনু হত্যা'র সুষ্ঠু তদন্ত এবং চার্জশিট আজো পর্যন্ত না হওয়া উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিক সাগর রুনি হত্যার জন্য দায়ীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করার ঘোষণা দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীত্ব হারালেন সাহেরা খাতুন। আর ওই হত্যার বিচার চেয়ে আন্দোলনরত ঐক্যবদ্ধ সাংবাদিকদের বিভক্ত করতে একজন সিনিয়র সাংবাদিককে প্রধান মন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা বানিয়ে বন্ধ করা হলো সাগর রুনি হত্যার বিচার আন্দোলন। আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ব্যাপকভাবে মাদকদ্রব্য বিস্তারে নীরবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পর্নোগ্রাফি ছবি, প্রস-কোয়ার্টার ইত্যাদি জঘন্য নৈতিক অধ:পতনের উপায়গুলো দলীয় লোকদের হাতে নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দিয়েছে। পুলিশ টুপাইস কামানোর মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে কার্যত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। এতে সমাজে যৌন অপরাধ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। মফস্বল শহরের সিনেমা হলগুলোতে ইংরেজি সিনেমার নামে রঙিন সেক্স ফিল্ম দেখানো হয়েছে। এসব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জ্ঞাতসারেই ঘটেছে। এর ফলে নারী নির্যাতনের জন্য একটা অশুভ মানসিক পরিবেশ তৈরি করেছে এর প্রভাব সমাজে মারাত্মকভাবে পড়তে দেখি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করতে দেশের সকল স্থানে মাস্তান বাহিনী লালন পালন করে আসছে। এসব মাস্তান নানা অবৈধ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নাকের ডগায়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু উৎকোচ এবং ভাগ গ্রহণ করে এদের অপকর্মকে অবাধ লাইসেন্স দিয়েছে। এরা আওয়ামীলীগের লোক এদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করা বা আইনি পদক্ষেপ নেয়া পুলিশ বা র‍্যাবের সাধ্যের বাইরে - এটা তাদের ভাষ্য। অপরদিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোক নিরীহ হলেও তাদের ধরে নিয়ে নানা মিথ্যা মামলা দেয়া, রিমান্ডের ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়া পুলিশের তৎপরতা এখন এখানেই সীমিত হয়ে পড়েছে। ফলে সমাজে বাড়ছে নানা অপরাধ বিশেষ করে নারী নির্যাতন আশঙ্কাজনক বেড়ে গেছে। পুলিশ মনে করে মাছের রাজা ইলিশ আর দেশের রাজা পুলিশ। নারী নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি-

০১. ৩০ জুলাই ২০০৯ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তিন ছাত্রের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হন একজন শিক্ষিকা ও এক ছাত্রী।

০২. ১৩ জানুয়ারি ২০০৯ নীলফামারী সদর উপজেলায় কলেজ ছাত্রী প্রতিমা রায় ইউএনও কর্তৃক প্রকাশ্যে অসম্মানজনক জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রশ্নবানে জর্জরিত হন এবং মোবাইল কোর্টে ২৯০ ধারায় জরিমানা দিতে বাধ্য হন।

০৩. ১৩ জুন ২০০৯ বেনাপোল পোর্ট থানাস্থ পোড়াবাড়ি নারানপুর গ্রামের নীলা খাতুনের ওপর হামলা ও অমানুষিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। নীলাকে বাড়ির সামনের একটি গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে বেদম মারপিট করে মাথার চুল কেটে আল কাতরা মাখিয়ে দেয়াসহ তাকে বেনাপোল ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে জোর করে তার কাছ থেকে মুচলেকা নেয়।

০৪. ২২ জুন ২০০৯ শরীরে পেরেক ফুটিয়ে ও মাথার চুল কেটে দিয়ে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে টগরজান নেছা নামের এক গৃহবধূর ওপর পৈশাচিক নির্যাতন চালায় তার পাষণ্ড স্বামী আব্দুল হামিদ।

০৫. ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামে মিতু নামের এক কলেজ ছাত্রী ও তার মাকে এসিড নিক্ষেপ করে ঝলছে দেয় দুর্বৃত্তরা।

০৬. ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বরগুনার বামনায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ ওই স্কুলেরই এক শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

০৭. ২২ এপ্রিল ২০১৫ এক গৃহবধূকে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে মানব পাচারকারী চক্রের সদস্যদের মাধ্যমে লেবাননে নেয়া হয়। লেবাননের এয়ারপোর্ট থেকেই ওই গৃহবধূকে উক্ত দেশের পতিতালয়ে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয়।

উপরিল্লিখিত কয়েকটা ঘটনা এ কারণে বর্ণনা করা হলো এর মাধ্যমে আমাদের সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতনের একটা খণ্ড চিত্র অনুধাবন করা যাবে। সমাজে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সচল থাকে না, যথাযথ কাজ করে না রাষ্ট্রের সকল মাধ্যম বিশৃঙ্খলতার জঞ্জালে জড়িয়ে পড়ে সরকারের কাঠামো তখন নৈরাজ্য নেমে আসে। এই নৈরাজ্য সবচেয়ে বেশি বিপদে ফেলে দেয় সমাজের বিত্তহীন দুর্বল অংশকে। জীবিকার প্রয়োজনে তারা বেশির ভাগ সময় শক্তিধর মানুষগুলোর নানা নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করে। আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্পের অনেক নাম ডাক। আমরা জানি এ বিরাট শিল্পের কার্যক্রম সচল রয়েছে দেশের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত দক্ষ অদক্ষ লক্ষ লক্ষ মহিলাদের দ্বারা। আমরা জেনেও না জানার ভান করি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার (৭০ বিলিয়ন) যে শিল্প থেকে দেশে আসছে তার মূল কারিগর নারী শ্রমিকদের অবস্থাটা কি। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল মজুরির বিনিময়ে গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত মালিক কর্মকর্তাদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তেমনি পারিবারিক জীবনে স্বামী পিতা ভাইদের কোপানলে পড়ছেন এরা প্রতিদিন। এদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা কতটুকু দিতে পারছে সরকার? যে সরকার

আইন আদালত পুলিশ, প্রশাসন, সামাজিক সংগঠন সবকিছুই দলীয় আজ্ঞাবাহীতে করতে আগ্রহী ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী করতে, সে সরকারের কাছ থেকে দু:শাসন ছাড়া কি প্রাপ্য হতে পারে? সুধীজন বলছেন এ অবস্থা চলতে পারে না। সাধারণ মানুষ চাইছে দু:শাসন থেকে মুক্তি। কিন্তু কিভাবে? আমরা ফ্যাসিবাদ এর কথা শুনেছি। আমরা জানি, ১৯২২ সালে ইতালিতে এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ বা একনায়ক শাসিত সরকার কিন্তু গণতান্ত্রিক সুগার কোটেড হলেও হতে পারে। কখনো গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয়েও ফ্যাসিস্ট শাসকে রূপ নিতে পারে। আওয়ামী লীগ সরকার গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত নয়। মানুষের ভোট তাদের প্রয়োজন পড়েনি। মানুষের ভোট তারা পাবে না কোনো দিন ক্ষমতার জন্য তাদের জানাই আছে। তাই বরাবর তারা মানুষের ভোটাধিকারকে ছিনতাই করেছে। সুদূর ইতিহাস যদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা যায় তবে পাকিস্থান আমল হতে নিকটবর্তী ২০১৪ এর নির্বাচনের একটিতেও আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে ক্ষমতায় আসেনি।

তাই বলছিলাম আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে ফ্যাসিবাদে। শেখ মুজিব (মরহুম) তিনি যেভাবে একদলীয় (বাকশাল) শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তেমনি শেখ হাসিনা বিএনপি জামায়াতকে দমন করে দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফ্যাসিবাদের মৌল আদর্শ হলো- শোষণমূলক পুঁজিবাদের বিকাশ একটি শ্রেণির হাতে সকল সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রিক একদলীয় শাসন পরিচালনা। শেখ হাসিনা বিগত দশ বছরে সেই কাজটিই করেছে। আর গুটিকতক লোকের হাতে দেশের পুঁজি তুলে দিতে যারা বাধ সাধতে পারে তাদের উৎকোচ দিয়ে মুখ বন্ধ করার সংস্কৃতি। নগ্নভাবে সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক সমাজ দলীয় মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করার পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশে উদাহরণ মিলবে না।

আজ এতো কিছুর পরও দেশের মানুষের কাছে সীমিতভাবে একটা সুযোগ এসেছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর সেই মহেন্দ্রক্ষণ ! মনে রাখতে হবে ওই দিন ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারকে পতন নিশ্চিত করতে হবে। ভয় ভীতি উপেক্ষা করতে হবে। দেশের শিশু কিশোররা পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল রাস্তায় নেমে আসতে। তারা নিরাপদ সড়কের আন্দোলনের অন্তরালে নিরাপদ সমাজ ও রাষ্ট্র চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তই করে গেছে, কাজটি করার দায়িত্ব কিন্তু বড়দের। তারা বলছে রাষ্ট্র মেরামতের কাজ চলছে। হ্যাঁ, তারা প্রকারন্তে বড়দের একটি ম্যাসেজ দিয়েছে। তারা বলেছে-

যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ
যদি তুমি রুখে দাড়াও তবে তুমি বাংলাদেশ।

আজ রুখে দাঁড়ানোর সময় এসেছে আমাদের। আমাদের দেশ, দেশের স্বাধীনতা, পতাকা রক্ষা করতে হবে। বাঁচাতে হবে জঘন্য আওয়ামীলীগের মতো বিকৃত রুচির রাজনৈতিক দলের হাত হতে বাংলাদেশকে।

CHANNEL 1
DIGANTA
ISLAMIC TV
আমার দেশ
মিডিয়ার কণ্ঠরোধ

> গণতন্ত্র ও গণবিরোধী ক্ষমতাসীন শক্তির কালে পড়ে দেশের গণমাধ্যম এখন এক ভয়াবহ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সাংবাদিক, কলামিস্ট, সম্পাদক সবাইকে একটি বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। ফলে গণমাধ্যম হয়ে পড়েছে অক্ষম ও নিষ্প্রভ।

মিডিয়ার উপর সরকারের নগ্নহস্তক্ষেপ

আদনান আকাশ

ক্ষমতাসীন আওয়ামী অপশক্তির অন্তরের অনুবাদ হচ্ছে 'বাকশাল'। তাদের সঙ্গে আপনাকে একমত হতেই হবে। না হলে আপনার বিরুদ্ধে নানা রকম অপবাদ দিয়ে আপনাকে নিপীড়ন করার সুযোগ তৈরি করবে তারা। আপনাকে স্তব্ধ করে দেয়াই তাদের আসল লক্ষ্য। যে কারণে বাকশালী অপশাসনে গণমাধ্যম থাকে সম্পূর্ণ পরাধীন।

রাজনৈতিক অপশক্তি সব সময়ই স্বাধীন গণমাধ্যমকে ভয় পায়। গণমাধ্যমকে নিজেদের আয়ত্তে রাখতে না পারলে সেগুলো বন্ধ করে দেয় তারা। আওয়ামী লীগ অতীতেও এ কাজে ছিল সিদ্ধহস্ত। তাদের সরকারই ১৯৭৫ সালে দেশের সব গুলো পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিল, কেবল নিজস্ব প্রচারের মতো চারটি পত্রিকা ছাড়া। ক্ষমতারোহণের পর ২০০৯ সাল থেকে পুরোনো ঐতিহ্য চর্চায় আবার নিয়োজিত হয় আওয়ামী লীগ। শুরু হয় সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন, গ্রেফতার, পত্রিকা, টেলিভিশন, অললাইন পোর্টাল, ব্লগ থেকে শুরু করে ফেইসবুক বন্ধসহ নানা রকম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা। কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকেনি ক্ষমতাসীনরা। অতীতে তারা যেমন পত্রিকা বন্ধ করে 'গণকণ্ঠ' সম্পাদক, বাংলা ভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি আল মাহমুদকে গভীর রাতে তার শয্যা থেকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় তুলে নিয়ে যায়, ২০১০ সালে তার চাইতেও ন্যাক্কারজনক কায়দায় গভীর রাতে পত্রিকা অফিসে হানা দিয়ে ভাঙচুর করে, সাংবাদিক-কর্মচারীদের পিটিয়ে সমগ্র দেশবাসীর সামনে দিয়ে বিএসইসি ভবনের ১১ তলায় আমার দেশ কার্যালয় থেকে সম্পাদক মাহমুদুর

রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। বন্ধ করে দেয় পত্রিকার প্রকাশনা। আইনী লড়াই চালিয়ে পত্রিকা আবারও প্রকাশ পায়। মাহমুদুর রহমান মুক্ত হয়। কিন্তু আইনের ওপর হাত খেলিয়ে আবারও তারা বন্ধ করে দেয় পত্রিকা, সম্পাদককে করে কারারুদ্ধ। এভাবে বন্ধ হওয়া গণমাধ্যমের সংখ্যা অনেক। যেগুলোর মধ্যে আছে চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি, শীর্ষ নিউজের মতো জনপ্রিয় ও প্রথম সারির গণমাধ্যম। যে সব গণমাধ্যম এখনও এদেশে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে তারা কিছুতেই সরকারের বিরাগভাজন হতে চায় না। হলে তাদেরও পরিণতি একই হবে। ফলে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম রাষ্ট্রের অন্যান্য স্তম্ভের মতোই এখন এক রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের মধ্যে বেঁচে আছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে যত গণবিরোধী সরকার আছে, তাদের সবার চরিত্রই অভিন্ন। গণমাধ্যমকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করতে নানারকম নির্যাতনমূলক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে তারা। বাংলাদেশের বর্তমান ক্ষমতাসীনরা গণমাধ্যমের ওপর ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের পরও এমন এক আইসিটি আইন ও গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যা কিনা প্রকৃত পক্ষে 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করার নীতিমালা'। এ ধরনের আইন ও নীতিমালা করা হয়েছে সরকারের যাবতীয় অনৈতিক কাজকে বৈধতা জন্য, গণমাধ্যমকে নিজেদের আজ্ঞাবহ রাখার জন্য।

গণতন্ত্র ও গণবিরোধী ক্ষমতাসীন শক্তির কালে পড়ে দেশের গণমাধ্যম এখন এক ভয়াবহ ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সাংবাদিক, কলামিস্ট, সম্পাদক সবাইকে একটি বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। ফলে গণমাধ্যম হয়ে পড়েছে অক্ষম ও নিষ্প্রভ।

ক্ষমতাসীনদের গণমাধ্যম দলনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে উঠে এসেছে। এ থেকেই অনুধাবন করা সম্ভব গণতন্ত্রের মুখোশধারী অপশক্তি গণমাধ্যমের ওপর কতটা খড়গহস্ত।

১. একুশে টেলিভিশনকে হয়রানি

কিছুটা নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার করায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ বিটিআরসি ও এনবিআরের মাধ্যমে একুশে টিলিভিশন কর্তৃপক্ষকে দফায় দফায় হয়রানি করে। তাদের তরঙ্গ স্থগিত রাখা, স্যাটেলাইট ভাড়া দেয়ার সুযোগ না দেয়াসহ নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। আমার দেশ, ১২ মার্চ ২০১২

২. জনসভা সরাসরি সম্প্রচারের উদ্যোগ নেয়া তিনটি টিভি চ্যানেলের প্রচার বন্ধ

১২ মার্চ ২০১২ চারদলীয় জোটের জনসভা তিনটি টিভি চ্যানেল সরাসরি সম্প্রচার করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু বিটিআরসি তাদের সেই অনুমতি দেয়নি এবং জনসভা চলায় সমাজে তিনটি চ্যানেলের প্রচার বন্ধ রাখা ছিল। রাজনৈতিক নানা তর্ক-বিতর্ক, জনসভা বানচাল করার সরকারি নানা উদ্যোগের পাশাপাশি টিভি চ্যানেল নিয়ে সরকারের এই ধরণের ভূমিকা নিন্দনীয়। সরকার একদিকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' করার নানা প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে, অপর দিকে রাজনৈতিক জনসভা সম্প্রচারে বাধার সৃষ্টি করছে। সরকারের এই নীতি পরস্পরবিরোধী। অন্য দিকে চৌদ্দ জোটের ১৪ মার্চের জনসভা

টেলিভিশন চ্যানেল ফোনের কোন রকমে বাধা ছাড়াই করেছে। প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০১২/আসক প্রতিবেদন-২০১২, পৃষ্ঠা-১৫৩

৩. নয়া দিগন্ত কার্যালয়ে ভাংচুর এবং ছাপাখানায় আগুন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ 'জয়বাংলা' স্লোগান দিয়ে মতিঝিলস্থ ইডেন কমপ্লেক্সের নয়া দিগন্ত কার্যালয়ে ভাংচুর এবং বিকেলে জুরাইনের ছাপাখানায় দুর্বৃত্তরা আগুন লাগায়। পুলিশের উপস্থিতিতেই নয়া দিগন্ত কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আগুনে নয়া দিগন্তের একটি গাড়ি পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং প্রেসের কাগজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ২০১৩

৪. পুলিশের উপস্থিতিতে পত্রিকা অফিসে ব্যাপক ভাংচুর-লুটপাট

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এদিকে চট্টগ্রামে পুলিশের উপস্থিতিতে আমার দেশ অফিসে ব্যাপক ভাংচুর-লুটপাটের পর আসবাব ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছে ছাত্র ও যুবলীগের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা। তাদের রোষ থেকে রেহাই পায়নি দিগন্ত টিভি ও দৈনিক সংগ্রাম অফিসও। হামলার শুরুতে কলাপসিবল গেট ভাঙার সময় থেকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কোতোয়ালি থানার ওসি সুদ্বীপ দাশ, এসআই উৎপলসহ শতাধিক পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। সংগ্রাম, ২৫ মার্চ ২০১৩

৫. চ্যানেল ওয়ান বন্ধ

২৭ এপ্রিল ২০১০ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন চ্যানেল ওয়ান এর সম্প্রচার বন্ধ করে দেয়। তখন টেলিভিশনটিতে সন্ধ্যার খবর চলছিল। আইনি লড়াই চালিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি। নিজস্ব যন্ত্রপাতি ছাড়া ভাড়া করা যন্ত্রপাতি দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে তারা চ্যানেল পরিচালনার শর্ত ভঙ্গ করেছে এই অভিযোগে চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত জনমনে অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। চ্যানেলটির মালিক প্রফেসর মাজেদুল ইসলাম জাতীয়বাদি আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড়াই তার চ্যানেল বন্ধ করে দেয়া হয়। সূত্র: আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) প্রতিবেদন ২০১০, পৃষ্ঠা-৮৩, সমকাল, ২৮ এপ্রিল ২০১০

৬. আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ

১ জুন ২০১০ বহুল প্রচারিত দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ এবং সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। পরে আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পত্রিকাটি পুনারায় প্রকাশিত হয়ে আসছিল। ২০১৩ সালের ১১ জুন সার্চ ওয়ারেন্টের নামে পত্রিকাটির প্রেসে তল্লাশি চালানো হয় এবং পত্রিকার প্রকাশনা ব্যাহত করার জন্য এক পর্যায়ে প্রেসটি তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের প্রেস এ্যান্ড পরিবলিকেশন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস (দৈনিক সংগ্রাম-এর প্রেস) থেকে অস্থায়ীভাবে আমার দেশ কর্তৃপক্ষ বিকল্প অবস্থায় পত্রিকা

প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। এভাবে দুই দিন পত্রিকা প্রকাশিত হলেও ১৪ এপ্রিলের পত্রিকা ছাপার সময় ১৩ এপ্রিল রাতে পুলিশ আল ফালাহ প্রেসে অভিযান চালিয়ে পত্রিকার মুদ্রিত কপি জব্দ করে এবং রাতেই উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মুখপাত্র খোঁড়া অযুহাত দেখিয়ে প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। সূত্র: আইন ও শালিস কেন্দ্র (আসক) প্রতিবেদন ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪৮, কালেরকণ্ঠ/ইত্তেফাক, ২ জুন রেডিও তেহরান, ৩ জুন ২০১০

৭. দিগন্ত টিভি ও ইসলামিকক টেলিভিশন বন্ধ

ফেসবুক ও ব্লগে নাস্তিক ধর্মদ্রোহী ব্লগার কর্তৃক ইসলাম ও রাসূল (সা) সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে এবং তাদের শাস্তিসহ ১৩ দফা দাবিতে 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ' ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি ও পরে ঢাকার শাপলা চত্বরে মহাসমাবেশ করলে তাতে সরকারের নির্দেশে যৌথবাহিনীর হামলার দৃশ্য দিগন্ত টেলিভিশন ও ইসলামিক টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করতে থাকে। রাত আড়াইটায় বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করে চারদিকে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাবসহ যৌথবাহিনী 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' নামে অভিযান শুরু করে। গণহত্যা ও লাশ গুমের সরাসরি চিত্র বা কোনো ধরনের ভিডিও যাতে প্রচার করা সম্ভব না হয় সেজন্য অভিযানের সময় একই সাথে দিগন্ত টেলিভিশন ও ইসলামিক টেলিভিশন বন্ধ করে দেয় সরকার। সূত্র: আইন ও শালিস কেন্দ্র (আসক) প্রতিবেদন ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪৮

৮. একুশে টেলিভিশন বন্ধ

০৬ জানুয়ারি ২০১৫ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে জনপ্রিয় স্যাটেলাইট টিভি একুশে টেলিভিশনের সম্প্রচার বন্ধ ও এর চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে হয়রানির উদ্দেশে একটি পুরোনো মামলায় গ্রেপ্তার করে চরম মিডিয়া বৈরী অবস্থানের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটায় সরকার। প্রথম আলো/পূর্বকোণ, ০৭ জানুয়ারি ২০১৫

৯. ৩৫টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল বন্ধ

৩৫টি ওয়েবসাইট বন্ধ করে দিয়েছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এর মধ্যে পার্স টুডে নামে পরিচিত একমাত্র বিদেশী নিউজ পোর্টাল রেডিও তেহরানের ওয়েবপোর্টালও রয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া ওবেসাইটগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই বিএনপিপন্থী অনলাইন নিউজ পোর্টাল। এর মধ্যে রয়েছে : শীর্ষনিউজ, আমার দেশ, আরটিনিউজ২৪, হককথা, আমরা বিএনপি, রিয়েল-টাইম নিউজ, নেশন নিউজ বিডি, ভোরের আলাপ, বাংলাপোস্ট২৪, ডেইলি টাইমস২৪, মাইনিউজ বিডি, লাইভ খবর, রিখান, নেচারের ডাক, সিলেট ভয়েস২৪, সময় বাংলা, প্রথম-নিউজ, বাংলা লেটেস্ট নিউজ, বিডি মনিটর, বিডিআপডেট নিউজ২৪, নিউজ ডেইলি২৪বিডি, অন্যজগত২৪, দেশ-বিডি, ক্রাইমবিডিনিউজ২৪, নতুন সকাল, শীর্ষখবর, দিনকালঅনলাইন, পার্সটুডে, উইকলি সোনারবাংলা, ২৪বাংলানিউজ ব্লগ। বিটিআরসি সরকারের পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল

ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) এবং ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটরদের সাইটগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। একটি আইআইজি প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিটিআরসির 'নির্দেশনা' পেয়ে তারা ৩৫টি ওয়েবলিংক ব্লক করেছেন। কালেরকণ্ঠ, ৫ আগস্ট ২০১৬, ইনকিলাব, ৬ আগস্ট ২০১৬

১০. ২ জানুয়ারি ২০০৯ ছাত্রলীগ কর্মীরা যশোরের দর্শনায় দৈনিক গ্রামের কাগজ (যশোর)-এর স্টাফ রিপোর্টার ফয়সাল ইসলামকে ছুরিকাঘাত করে এবং দৈনিক মানবজমিনের বেনাপোলের সংবাদদাতা কাজী শাহাজাহান সবুর ও দৈনিক সংগ্রাম সংবাদদাতা মশিয়ার রহমানকে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে পিটিয়ে আহত করে। আমার দেশ, ৫ জানুয়ারি ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৭

১১. ১৫ জানুয়ারি ২০০৯ ছাত্রলীগের সহিংসতার তথ্য সংগ্রহকালে ছাত্রলীগের কর্মীরা নিউজ টুডের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা আকন্দ মোহাম্মদ জাহিদের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে আহত করে। জাহিদকে রক্ষায় এগিয়ে গেলে আরো তিন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়। যুগান্তর, ১৬ জানুয়ারি ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৭

১২. ১৫ জানুয়ারি ২০০৯ ছাত্রলীগ কর্মীরা শেরে-ই বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনিক ইত্তেফাক, আমাদের সময়, নয়া দিগন্ত, আমার দেশ, দিনকাল, ও ইনকিলাব পত্রিকার সংবাদদাতাদের তাদের ডরমেটরি থেকে বের করে দেয়। আমাদের সময়, ২০ জানুয়ারি ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৭

১৩. ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ নোয়াখালী বেগমগঞ্জের আমার দেশ পত্রিকার প্রতিনিধিকে হত্যার হুমকি দেয় সরকার দলীয় লোকেরা। আমার দেশ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৭

১৪. ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দৈনিক সংবাদ পত্রিকার কুষ্টিয়া প্রতিনিধি মামুন রেজাকে পিটিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ কর্মীরা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মানবজমিন, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৭

১৫. ১১ মার্চ ২০০৯ রাজশাহী মেডিকেল কলেজে দৈনিক ইত্তেফাকের ফটো সাংবাদিক নজরুল ইসলাম জুলু ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়। ইত্তেফাক, ১২ মার্চ ২০০৯

১৬. ৮ মার্চ ২০০৯ জনৈক ছাত্রের মোবাইল ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মোঃ মোহসিন নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাংবাদিক ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে মারধরের শিকার হন। সংবাদ, ৯ মার্চ ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৭

১৭. ১৫ মার্চ ২০০৯ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য সারাহ বেগম কবরী স্থানীয় দৈনিক শীতলক্ষ্যা পত্রিকার ফটো সাংবাদিক শেখ শহীদুল ইসলাম সেন্টুকে লাঞ্ছিত করেন। আমার দেশ/ যুগান্তর, ১৬ মার্চ ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

১৮. ২ এপ্রিল ২০০৯ আওয়ামী লীগ স্থানীয় নেতাকর্মীদের চিংড়ি ঘের দখলের খবর প্রকাশের কারণে খুলনায় শাসক দলের কর্মীরা ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার ও দৈনিক ডেসটিনির সংবাদদাতাকে লাঞ্ছিত করে। ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

১৯. ৬ এপ্রিল ২০০৯ দৈনিক দিনকালের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে প্রহৃত হন। নিউএজ, ৭ এপ্রিল ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

১১. ২৬ এপ্রিল ২০০৯ ছাত্রলীগ কর্মীরা আমাদের সময় ও আমার দেশ পত্রিকার ক্যাম্পাস প্রতিবেদকদের লাঞ্ছিত করে। সমকাল, ২৮ এপ্রিল ২০০৯/ আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

২০. ১১ এপ্রিল ২০০৯ আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য গিয়াস উদ্দিনের সাঙ্গপাঙ্গরা ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে সমকাল প্রতিবেদন আব্দুল্লাহ আল আমীন বিপ্লবের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় রাজন নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয় বটে কিন্তু মূল অভিযুক্ত গিয়াস উদ্দিনের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সংবাদ, ১৭ এপ্রিল ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

২১. ১৫ এপ্রিল ২০০৯ অনুষ্ঠিত একদলীয় সমাবেশে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা দেখামাত্র সাংবাদিকদের আক্রমণ করার নির্দেশ দেন দলীয় কর্মীদের। সংবাদ, ১৭ এপ্রিল ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

২২. ৩০ এপ্রিল ২০০৯ রাজশাহীতে ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ ও হরতালের খবর প্রচার করায় ছাত্রলীগের কর্মীরা এনটিভির ক্যামেরাম্যান রাজু আহমেদ রুবেলকে মোবাইল ফোনে হত্যা হুমকি দেয়। নিউএজ, ১ মে ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

২৩. ১৪ মে ২০০৯ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় নয়াদিগন্ত ও দেশবাংলা পত্রিকার সংবাদদাতা ও অন্য এক সাংবাদিক আহত হন। ইত্তেফাক, ১৬ মে ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

২৪. ১৫ মে ২০০৯ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা আমার দেশ পত্রিকার সংবাদদাতার ওপর হামলা চালায়। আমার দেশ, ১৬ মে ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৮

২৫. ১৬ মে ২০০৯ স্থানীয় আওয়ামী লীগের অন্তঃকোন্দলে ছবি তুলতে গিয়ে বরিশালে ১৬ মে ২০০৯ দু'জন স্থানীয় ফটো সাংবাদিক আহত হন। যুগান্তর, ১৬ মে ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

২৬. ৭ জুন ২০০৯ মুন্সীগঞ্জে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে বেসরকারী

টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাভিশনের এক্স ক্রাইম টিমের চার সাংবাদিক আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলার শিকার হন। মানবজমিন, ৮ জুন ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

২৭. ২৩ জুন ২০০৯ অবৈধ চাঁদা আদায়ের সংবাদ প্রচার করায় ২৩ জুন ২০০৯ খাগড়াছড়িতে ছাত্রলীগের কর্মীরা ইনকিলাব পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতাকে পিটিয়ে আহত করে। ইনডিপেন্ডেন্ট, ২৪ জুন ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

২৪ জুন ২০০৯ সাতক্ষীরায় সংঘর্ষের ছবি তুলতে গিয়ে স্থানীয় এক ফটো সাংবাদিক ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলার শিকার হন। যুগান্তর, ২৫ জুন ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

২৮. ২৯ জুন ২০০৯ ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদলের দু'জন কর্মী আহত হওয়ার ঘটনার রিপোর্ট করতে গিয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসক্লাবের সভাপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ যিশু ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার শিকার হন। ছাত্রলীগ কর্মীরা প্রেসক্লাব গুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। আমার দেশ, ৪ জুলাই ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

২৯. আওয়ামী লীগ কর্মীরা দোকান ভাংচুর করার সময় ভিডিও করতে গিয়ে গাজীপুরের শ্রীপুরে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি ও চ্যানেল আইয়ের সংবাদদাতারা হামলার শিকার হন। আমার দেশ, ১২ জুলাই ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

৩০. ১৩ জুলাই ২০০৯ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অপকর্মের সংবাদ প্রকাশ করায় বান্দরবানের লামায় ১৩ জুলাই ২০০৯ ইত্তেফাক পত্রিকার স্থানীয় সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ কর্মীরা। নয়া দিগন্ত, ১৫ জুলাই ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

৩১. ১৪ জুলাই ২০০৯ বরগুনার আমতলীতে আওয়ামী লীগের কর্মীদের হামলায় ইনকিলাবের সংবাদদাতা এবং আমতলী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আহত হন। প্রথম আলো, ৩১ জুলাই ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৯

৩২. আওয়ামী লীগ কর্মীরা ২৭ জুলাই ২০০৯ পাবনার ঈশ্বরদীতে স্থানীয় সমকাল প্রতিনিধির বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে।মানবজমিন, ২৯ জুলাই ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৩. ১৭ আগস্ট ২০০৯ স্থানীয় সংসদ সদস্য আব্দুল ওয়াদুদের দ্বারা সহযোগী এবং পুটিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিউজ নেটওয়ার্কে স্থানীয় প্রতিনিধির ওপর হামলা চালায়। নিউ এজ, ১৮ আগস্ট ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৪. ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ একটি সংবাদ প্রকাশের জের ধরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা চুয়াডাঙ্গার প্রথম আলো প্রতিনিধির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে হামলা চালায়। শাহ আলম ও তাঁর পরিবার ঢাকায় আশ্রয় নেন। সরকার দলের কর্মীরা ঐ পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি

কামরুল হাসান এবং শাহ আলমের বিরুদ্ধে ৪ সেপ্টেম্বর মানহানির মামলাও দায়ের করে। প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৫. ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা চুয়াডাঙ্গার আমার দেশ প্রতিনিধির আরিফুল ইসলাম ডালিমের দোকানে হামলা চালায় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ারদারের বিরুদ্ধে আমার দেশ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করায় তারা এ হামলা চালায়। তারা আরিফুলের বাড়িতেও হামলা চালায় এবং তার স্ত্রী-সন্তানদের নির্যাতন করে এবং লুটপাট করে। প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৬. ১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ জনকণ্ঠ প্রতিনিধি রাজীব আহম্মদ কচি এবং প্রথম আলো প্রতিনিধি শাহ আলমের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও হামলা চালায়। তারা আওয়ামী লীগ ও বিএনপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে আরিফুল ও শাহ আলমের নামেও মামলা করে। প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৭. ৪ সেপ্টেম্বর ২০০৯ চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে সমকাল প্রতিনিধি স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা কর্তৃক প্রহৃত হন। সমকাল, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৮. ৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯ গলাচিপায় প্রথম আলো ও আমার দেশ পত্রিকার সংবাদদাতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে ৯ সেপ্টেম্বর আর টিভি ও দিগন্ত টিভির সংবাদ কর্মীরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের হামলার শিকার হন। একই দিনে আওয়ামী লীগ কর্মীরা নয়া দিগন্ত পত্রিকার গলাচিপা সংবাদদাতাকে লাঞ্ছিত করে। তারা প্রথম আলো চ্যানেল আই ও মানবজমিন সংবাদদাতাদেরও তাড়া করে। আমার দেশ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯০

৩৯. ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ একটি রিপোর্ট প্রকাশের জের ধরে ১১ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ কর্মীরা আমার দেশের প্রতিনিধি ফয়সাল মানিক এবং আরো নয়জন স্থানীয় সাংবাদিককে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর প্রেসক্লাবে দু'ঘন্টা আটক রাখে। আমার দেশ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯১

৪০. ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় যশোরের শার্শা উপজেলা যায়যায়দিন সংবাদদাতা আহম্মেদ আলী শাহীন সরকার দলীয় স্থানীয় নেতাকর্মীদের হামলার শিকার হন। শার্শা থানা পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু হামলাকীরা শাহীনের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা করতে গেলে তা গ্রহণ করে। আমার দেশ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯১

৪১. ৭ অক্টোবর ২০০৯ সীতাকুন্ডের কুমিরায় আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা ৪টি শিপাইয়ার্ডের জমি দখল সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করতে গেলে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য এ বি এম আবুল কাশেম মাস্টারের ছেলে এস এম আল মামুন ও এস এম আল নোমান এবং তাদের চাচাতো ভাই মাহমুদুল হাসান মান্না প্রথম আলো প্রতিনিধি প্রণব বল, ফটো সাংবাদিক রাশেদ মাহমুদ, সমকাল পত্রিকার সীতাকুন্ড প্রতিবেদক এম সেকান্দার এবং সীতাকুন্ড প্রেসক্লাবের সভাপতি ফোরকান আবুলকে লাঞ্ছিত করে। নিউ এজ, ১১ অক্টোবর ২০০৯/আসক প্রতিবেদন-২০০৯, পৃষ্ঠা-৯১

৪২. ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১০ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে ৮ সাংবাদিককে মারধর করেছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। সকাল ১১টার দিকে রাবি শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের সামনেই নেতাকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় সাংবাদিকদের মারধর করা হয়েছে। ছাত্রলীগ কর্মীরা সাংবাদিকদের মারধরের ছবি তুলতে দেয়নি। ছবি উঠালে একজনকেও ক্যাম্পাস থেকে জীবিত ফিরতে দেয়া হবে না বলে হুমকি দেয়া হয়। আহত সাংবাদিকদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ চট্টগ্রামে ২ জন এবং পাবনায় ১০ জন সাংবাদিক ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। সব মিলিয়ে গত দু'দিনে দেশের বিভিন্নস্থানে ২০ জন সাংবাদিক প্রহৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সংগ্রাম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১০

৪৩. ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ 'দৈনিক সংগ্রাম'-এর সম্পাদক আবুল আসাদকে গ্রেফতার করেছে। ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন চেয়ে আসাদকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। আদালত সংগ্রাম সম্পাদককে ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। পুলিশের রমনা জোনের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) কৃষ্ণপদ রায় জানান, সোমবার বিকেলে জামায়াতের সমাবেশ থেকে পুলিশের ওপর হামলা চালানোর ঘটনায় যারা ইন্ধনদাতা তাদের একজন সংগ্রাম সম্পাদক। তাই পুলিশের ওপর হামলা, সরকারি কাজে বাধাসহ নানা অভিযোগে আবুল আসাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সমকাল, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১১

৪৪. ৩০ জুলাই ২০১১ চাঁদাবাজির মামলায় সাপ্তাহিক শীর্ষ কাগজ ও অনলাইন বার্তা সংস্থা শীর্ষ নিউজ ডটকমের সম্পাদক মোঃ একরামুল হককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আদালতে হাজির করে তিন দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ। ঢাকা মহানগর হাকিম আসাদুজ্জামান নূর দু'দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। শীর্ষ নিউজ কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও কয়েক প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর শীর্ষ নিউজ ও শীর্ষ কাগজে প্রকাশিত হওয়ায় একরামুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সমকাল, ১ আগস্ট ২০১১

৪৫. ২৫ নভেম্বর ২০১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সময় টেলিভিশনের এক সাংবাদিককে পিটিয়েছে ছাত্রলীগ। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় আহত সাংবাদিক শাহাদাত হোসেন তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্সেও ছাত্র এবং সময় টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার। আমার দেশ, ২৬ নভেম্বর ২০১১

৪৬. রাজধানীর মিরপুরের মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবাদ সংগ্রহের সময় বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির সাংবাদিক অপর্ণা সিংহকে স্কুলের ভর্তি-বাণিজ্য নিয়ে বক্তব্য নিতে গেলে মারধর করেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদার। প্রথম আলো, ৪ জানুয়ারি ২০১২/আসক প্রতিবেদন-২০১২, পৃষ্ঠা-১৫২

৪৭. ২০১২ সালে Center for media research and training (এম আর টি) প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে সাংবাদিক নিহত হয়েছেন ৫ জন এবং আহত হয়েছেন ২০৫ জন। সময়ের আবর্তন, ২৪ জুন ২০১৬

৪৮. ৩১ জানুয়ারি ২০১২ দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান ও প্রতিবেদক ইফতেখার মাহমুদাকে টেলিফোনে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। ৩১ জানুয়ারি, বিকেল ৩টা ৫৯ মিনিট ইফতেখার মাহমুদাকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বলে, 'তোরা আমার নেতার নামে বহু মিথ্যা রিপোর্ট করেছিস। তোদের মোকাবেলা করার জন্য আমরা প্রস্তুত। অনেক সহ্য করেছি আর না। উল্লেখ্য, পত্রিকাটিতে খুলনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সন্ত্রাস নিয়ে তিনটি সরেজমিন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইত্তেফাক, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১২/আসক প্রতিবেদন-২০১২, পৃষ্ঠা-১৫২

৪৯. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের হামলায় অন্তত ১৮ জন সাংবাদিক আহত হন। সাংবাদিকদের ক্যামেরা ভাঙচুর করে কেড়ে নেন তরুণ চিকিৎসকরা। সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক্স গণমাধ্যমের অন্তত ৫টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক ইন্টার্নি ডাক্তাররা এ হামলা চালান। ২৯ জুন আরিফুল নামে এক রোগীকে সার্জারি বিভাগের জনৈক ডাক্তার মারধর করলে তা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হওয়ায় সাংবাদিকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। সাংবাদিকদের হাসপাতালে প্রবেশ নিষেধের ব্যাপারে নোটিশ ঝুলিয়ে দেন সরকার সমর্থক ডাক্তাররা এবং ঐ রোগীকেও রিলিজ দেয়া হয়। এটি জানানোর জন্য রোগীর স্বজনরা হাসপাতালে মেডিকেল রিপোর্টারদের কক্ষে যান। তখন একদল উত্তেজিত তরুণ ডাক্তার সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন। প্রথম আলো, ২৬ জুলাই ২০১২/আসক প্রতিবেদন-২০১২, পৃষ্ঠা; ১৫৪-১৫৫

৫০. ৬ জানুয়ারি ২০১৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পলাশী মোড়ে এলাকায় হরতাল সমর্থক সন্দেহে চার ফটোসাংবাদিককে মারধর করেছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। পরিচয়পত্র দেখিয়েও সাংবাদিকরা রেহাই পাননি। পুলিশ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো সাংবাদিকদেরই আটক করে থানায় নিয়ে আসে। মারধরের শিকার সাংবাদিকরা হলেন রয়টার্সের এন্ড্রু বিরাজ, প্রথম আলোর হাসান রাজা, নিউ এজের সনি রামানি ও বাংলানিউজের হারুন-অর-রশিদ রুবেল। ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০১৩

৫১. ২২ মে ২০১৩ বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর করা মামলায় দৈনিক মানবকণ্ঠ সম্পাদক শাহজাহান সরদার এবং ঢাকা টাইমসের সম্পাদক আরিফুর রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। চেয়ারম্যানবিডিব্লগপোস্ট, জুন ২০১৩

৫২. ২০১৪ সালে বাংলাদেশে ২১৩ জন সাংবাদিক ও ৮ জন ব্লগার বিভিন্নভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ৪ জন সাংবাদিক। ৪০ জন গুরুতর জখম, ৬২ জনকে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়া হয়রানির পরিমাণ বেড়েছে ১০৬ ভাগ। বার্ষিক রিপোর্ট- ২০১৪ অধিকার/ইত্তেফাক, ৪ মে ২০১৫

৫৩. ২০১৩ সালে ছিল ১২.৫। গত বছর যেসব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে এর মধ্যে ২৩ ভাগ সংঘটিত হয়েছে পুলিশ, র‍্যাব ও গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে। ১১ ভাগ আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাইরে সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা। ৬৬.৩১ ভাগ আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে। এর মধ্যে ৩৩.৬৯ ভাগ ঘটনা ঘটেছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের মাধ্যমে। যা সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। এসব নির্যাতনের একটি ঘটনায়ও বিচারের মাধ্যমে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়ার কোন তথ্য পায়নি সংগঠনটি। ইত্তেফাক, ০৪ মে ২০১৫

৫৪. ২০১৩ সালে ২২২ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়। এর মধ্যে ১ জন হত্যা, ১৪৬ জন আহত, ৩৩ জন হুমকি, ৩৭ জন লাঞ্ছিত ও আক্রমণের শিকার হয়। বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৩/অধিকার ইত্তেফাক, ৪ মে ২০১৫

৫৫. ২০১৪ সালে 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন ইন বাংলাদেশ-২০১৪' শীর্ষক প্রতিবেদনে রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে ৬৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হাতে ৩৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে। ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে সাংবাদিকদের হয়রানির পরিমাণ বেড়েছে ১০৬ শতাংশ। হয়রানির মধ্যে মানহানির দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাও রয়েছে। ২০১৩ সালে হয়রানির ঘটনা ছিল ৩৩টি; ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮টিতে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ১০টি ফৌজদারি মামলা হয়েছে। প্রথম আলো, ০৪ মে ২০১৫

৫৬. ০৩ মে ২০১৫ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষে আর্টিকেল ১৯ নামের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে সাংবাদিক নির্যাতনের মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে এই আক্রমণের মাত্রা ছিল ৩৩.৬৯। ইত্তেফাক, ০৪ মে ২০১৫

৫৭. ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ছাত্রলীগের রোষানলে পড়েন ৫ সাংবাদিক। এরা হলেন, দৈনিক সকালের খবরের ফটোসাংবাদিক আজহার উদ্দিন, রাবি প্রতিনিধি সুজন নাজির, জনকণ্ঠের ফটোসাংবাদিক সেলিম

জাহাঙ্গীর, নিউ এজ'র নাজিম মৃধা ও ডেইলি সান-এর সাঈদ শুভ। লাঞ্ছিত করার পর নাসিম আহম্মেদ সেতুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ওই ৫ সাংবাদিককে পিস্তল দেখিয়ে গুলি করার হুমকি দেয়। সময়ের আবর্তন, ২৪ জুন ২০১৬

৫৮. ২৬ জানুয়ারি ২০১৭, শাহবাগে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে পুলিশ এটিএন নিউজের স্টাফ রিপোর্টার ইহসান বিন দিদার ও ক্যামেরাপারসন আব্দুল আলিমের হামলা উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশের এএসআই এরশাদ মন্ডলকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইত্তেফাক, ২৮ জানুয়ারি ২০১৭

৫৯. ৭ এপ্রিল ২০১৭, মাদারীপুরের কালকিনিতে উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধি শহিদুল ইসলামকে গাছে বেঁধে নির্যাতন করেছে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী বাদল তালুকদারের সমর্থকরা । ঘটনাটি গতকাল শুক্রবার দুপুরের। উপজেলার পূর্ব এনায়েতনগর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি এ নির্যাতনের শিকার হন। এ ঘটনার পর উল্টো পুলিশ ওই সাংবাদিককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ওই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা করলে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। জাগোনিউজ২৪ডটকম, ৮ এপ্রিল ২০১৭

৬০. ৮ এপ্রিল ২০১৭, সিলেট নগরীর পাঠানটুলা দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে উত্যক্তের প্রতিবাদ করার জেরে শাবি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক অবজারভারের সিলেট প্রতিনিধি সরদার আব্বাস আলী ও সহ-সভাপতি ও দৈনিক সকালের খবরের শাবি প্রতিনিধি সৈয়দ নবীউল আলম দীপুকে বেধড়ক মারপিট করে শাবি শাখা ছাত্রলীগ কর্মী অনিরুদ্ধ দেব রায় অমিয়, রাহাত সিদ্দীকি, নজরুল ইসলাম রাকিবসহ বেশ কয়েকজন। তারা সাবই শাবি ছাত্রলীগ সভাপতি সঞ্জীবন চক্রবর্তী পার্থের অনুসারী। বিবার্তা২৪ডটকম, ০৯ এপ্রিল ২০১৭

৬১. ১০ জুলাই ২০১৭, দেশ ট্রাভেলসের একটি বাসে হামলা করে ছাত্রলীগের ১০-১২ জন নেতাকর্মী। ঘটনার ছবি তুলতে গেলে ডেইলি স্টারের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রতিনিধি আরাফাত রহমানের উপর বেপরোয়াভাবে হামলা চালায় ছাত্রলীগ নেতারা। এঘটনায় আরাফাত নিজেই বাদী হয়ে নগরীর মতিহার থানায় রাবি শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান কানন, আইন বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিজয়, সহসভাপতি আহমেদ সজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান লাবন জনসহ আরো ৮-১০ জনকে অজ্ঞাত আসামী করে 'হত্যাচেষ্টা' মামলা দায়ের করেন। বিডি প্রতিদিন, ১১ জুলাই ২০১৭

৬২. ৪ অক্টোবর ২০১৭, ঘাটাইলের রাস্তাঘাটের দুরাবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের অনলাইন সংস্করণে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর তিনি বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টোয়েন্টিফোরের সংবাদদাতা আতিকুর রহমান আতিককে নিজের অফিসকক্ষে আটকিয়ে

পোষা সন্ত্রাসীদের দিয়ে মারপিটই শুধু করেননি তাকে হত্যার উদ্দেশে বাথরুমে আটকে রেখে বাইরে থেকে সিটকানি দিয়ে দেন। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তাঁকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। তার কাছ থেকে ভিডিও করা একটি ক্যাসেট কেড়ে নেওয়া হয়। এ সময় ঘাটাইল থানার এক এসআইসহ দুই পুলিশ সদস্যও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সাংবাদিক আতিক তাদের কাছে নিরাপত্তা চাইলে তা তারা উপেক্ষা করেন। বাথরুমে আটকা অবস্থায় আতিক নিউজ টোয়েন্টিফোরে স্ক্রল পাঠান 'মেয়রের কার্যালয়ে সাংবাদিককে অবরুদ্ধ। এ স্ক্রলটি নিউজ টোয়েন্টিফোরে প্রচারিত হওয়ায় তা দেখে মেয়রের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। ঘাটাইল প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা বিষয়টি জেনে মেয়রের কার্যালয়ে ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন। কালের কণ্ঠ, ৫ অক্টোবর, ২০১৭/বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৬ অক্টোবর ২০১৭

সারণি-১ সাংবাদিক নির্যাতন- ২০১২

নং	নির্যাতনের ধরণ	সংখ্যা
১.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি/মামলা	৭৪
২.	প্রাণনাশের হুমকি (সরকার দলীয় কর্মী, সরকারী কর্মকর্তা, সন্ত্রাসী ও অজ্ঞাত পরিচয়ে ও টেলিফোনে)	৮৭
৩.	প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলা	৪২
৪.	আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠন কর্তৃক হামলা/হয়রানি/নির্যাতন	৭২
৫.	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	৩৫
৬.	খুন	৫
৭.	নিখোঁজ	২
৮.	অন্যান্য	৪৮

সূত্র ঃ আসক প্রতিবেদন-২০১২, পৃষ্ঠা-১৫১

সারণি-২ সাংবাদিক নির্যাতন ২০১৩ (জানুয়ারি-ডিসেম্বর)

নং	নির্যাতনের ধরণ	সংখ্যা
১.	আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি/মামলা	৪৩
২.	প্রাণনামের হুমকি (সরকার দলীয় কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, সন্ত্রাসী ও অজ্ঞাত পরিচয়ে ও টেলিফোনে)	৩৩
৩.	প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলার শিকার	২৬
৪.	সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতন/হামলা/হুমকি/হয়রানি/বোমা নিক্ষেপ	৫৬
৫.	আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠন কর্তৃক হামলা/হয়রানি/নির্যাতন	৭৭
৬.	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক নির্যাতন/হুমকি/হয়রানি	২
৭.	পুলিশের গুলিতে নিহত	১
	খুন	১

সূত্র ঃ আসক প্রতিবেদন-২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪২

২০০৯ থেকে ২০১৭ : ৮ বছরে ৩০ সাংবাদিক খুন

ক্রম.	নাম	কর্মক্ষেত্র	ঘটনার তারিখ	ঘটনার স্থান	কারণ
১.	আতিকুল ইসলাম আতিক	এনটিভির ভিডিও এডিটর	ফেব্রুয়ারি ২০০৯	ঢাকার মগবাজার	রহস্যজনক
২.	নূরুল ইসলাম রানা	স্টাফ রিপোর্টার, পাক্ষিক মুক্তমন	৩ জুলাই ২০০৯	ঢাকার উত্তরায়	সন্ত্রাসী হামলায়
৩.	এমএম আহসান হাবীব বারী	নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক সাম্প্রতিক সময়	২৬ আগস্ট ২০০৯	গাজীপুরে	দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে
৪.	আবদুল হান্নান	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক রূপালী দেশ	২ অক্টোবর ২০০৯	ঢাকার ডেমরার এলাকায়	সন্ত্রাসীদের গুলীতে
৫.	আবুল হাসান আসিফ	দৈনিক ইনকিলাব ও সহসভাপতি রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাব	২ ডিসেম্বর ২০০৯-	রূপগঞ্জে	রহস্যজনক
৬.	ফতেহ ওসমানী	প্রতিনিধি, সাপ্তাহিক ২০০০	১৮ এপ্রিল ২০১০	সিলেট	দুর্বৃত্তদের হামলায়
৭.	শফিকুল ইসলাম টুটুল	ক্যামরাপার্সন, এটিএন বাংলা	- মৃত্যু ৯ মে ২০১০	ঢাকায়	গুপ্ত হত্যা
৮.	মনির হোসেন রাঢ়ী	সভাপতি, মুলাদী প্রেসক্লাব	২৩ ডিসেম্বর ২০১০	মুলাদী, বরিশাল	প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা
১০.	মাহবুব টুটুল	দৈনিক আজকের প্রত্যাশা ও সাপ্তাহিক সংবাদচিত্র	৭ এপ্রিল ২০১১	চট্টগ্রাম পোর্ট কলোনী	লাশ পাওয়া যায়
১২.	আলতাফ হোসেন	সাপ্তাহিক বজ্রকণ্ঠ	৭ এপ্রিল ২০১১	ঢাকার উত্তরা ৪ নং সেক্টরে নিজ বাসায়	লাশ পাওয়া যায়

১৩.	ফরিদুল ইসলাম রঞ্জু	জেলা প্রতিনিধি, দৈনিক ভোরের ডাক	৭ ডিসেম্বর ২০১১	গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ	জবাই করে হত্যা
১৪.	সাগর সরওয়ার	বার্তা সম্পাদক, মাছরাঙ্গা টিভি	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২	রাজাবাজার, ঢাকা	নিজ বাসার বেড রুমে খুন
১৫.	মেহেরুন রুনী	সিনিয়র রিপোর্টার- এটিএন বাংলা	১১ ফেব্রুয়ারি ২০১২	রাজাবাজার, ঢাকায়	নিজ বেড রুমে খুন
১৬.	জামাল উদ্দিন	প্রতিনিধি, গ্রামের কাগজ	৫ জুন ২০১২	বেনাপোল যশোরে	দুর্বৃত্তদের গুলীতে
১৭.	জুনায়েদ আহমদ জুনেদ	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক বিবিয়ানা	১০ জুলাই ২০১২	শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ	
১৮.	তালহাদ আহমদ কাবিদ	স্টাফ রিপোর্টার, নরসিংদীর বাণী	২৩ অক্টোবর ২০১২	নরসিংদীতে	অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হামলায়-
১৯.	মাহমুদুল হাসান তারেক	শিক্ষানবিশ স্টাফ রিপোর্টার, নিউএজ ও ঢাবি শিক্ষার্থী	১৫ জানুয়ারি ২০১৩	তেজগাঁও এফডিসি রেলক্রসিংয়ে	রহস্যজনভাবে খুন
২০.	দুর্জয় চৌধুরী দিপু	যুগ্ম সম্পাদক, সাপ্তাহিক অপরাধ দমন	১৬ জানুয়ারি ২০১৩	ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে নিজ অফিসে	সন্ত্রাসীদের গুলীতে
২১.	ফারুক আহমেদ	সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক	১৯ জানুয়ারি ২০১৩	টাঙ্গাইলে	দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত
২২.	আফতাব আহমেদ	একুশ পদকপ্রাপ্ত ফটো সাংবাদিক, সাবেক দৈনিক ইত্তেফাক	২৪ ডিসেম্বর ২০১৩	পশ্চিম রামপুরা ওয়াপদা রোডের নিজ বাড়ীতে	রহস্যজনভাবে খুন

২৩.	শাহ আলম সাগর	স্টাফ রিপোর্টার, সাপ্তাহিক অপরাধ দমন	২ মার্চ ২০১৪	উত্তরা পশ্চিম থানার ছাদ থেকে ফেলে হত্যা-মামলা	থানার ওসিসহ পুলিশের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ
২৪.	দেলোয়ার হোসেন	নারায়নগঞ্জ প্রতিনিধি, দৈনিক সমাচার	২৮ মার্চ ২০১৪		
২৫.	মুশফিকুর রহমান তুহনি	জেলা প্রতিনিধি, সাপ্তাহিক অপরাধ জগত	৮ অক্টোবর ২০১৫	নেত্রকোনায়	দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে
২৬.	আওরঙ্গজেব সজীব- খুন- -	ঢাকা মেডিকেল প্রতিনিধি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি ও বাংলাদেশ প্রতিদিন, মেডিকেল রিপো: এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি	২৩ ডিসেম্বর ২০১৫	নিখোঁজের পর ধলেশ্বরী নদী থেকে লাশ উদ্ধার	রহস্যজনভাবে খুন
২৭.	মশিউর রহমান উৎস	দৈনিক যুগের আলো	২৪ ডিসেম্বর ২০১৫	রংপুর	
২৮.	আবু সায়েম	জীবননগর প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক	জুলাই ২০১৫	চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে	দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে
২৯.	আবদুল হাকিম শিমুল	প্রতিনিধি, দৈনিক সমকাল	৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	শাহাজাদপুর সিরাজগঞ্জ	গুলী করে হত্যা
৩০.	আবুল কালাম আজাদ	বুড়িচং প্রতিনিধি, যুগান্তর ও বুড়িচং প্রেসক্লাবের নির্বাহী সদস্য	২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭	বুড়িচং, কুমিল্লায়-	দুর্বৃত্তদের হামলা

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড

> ছাত্রলীগের কৃতকর্ম দেখলেই অনুধাবন করা যায়, এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। এই সন্ত্রাসীরা হচ্ছে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শক্তির ক্ষমতায় টিকে থাকার অন্যতম অবলম্বন। যে কারনে এদের সকল অপকর্মের লাইসেন্স প্রদান করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার। এই অপশক্তিকে যদি জাতির ঘাড় থেকে আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে অপসারণ করা না যায় তাহলে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবে পরিণত হওয়া সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণের জন্য আরও ভয়াভয় দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে সন্দেহ নাই।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব ছাত্রলীগ

ইবনে আকবর

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি জনপ্রিয় কবিতার দু'টি অতি জনপ্রিয় লাইন–

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি!

সুকান্ত ভট্টাচার্য বৃটিশ পরাধীন যুগে জন্ম নিয়েছিলেন। জন্মের পরেই তিনি দেখেছেন– শোষিত, বিক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি। আর স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী জাহেলী জামানায় ঘটেছে তার চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা। শিশুরা মাতৃগর্ভেই টের পেয়ে গেছে কোথায় তারা জন্ম নিতে যাচ্ছে, কোন জামানায়?

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলো'– অনেকে হয়তো ভুলে গেছেন সেই কাহিনি, আর অনেকের স্মৃতিতে এখনো জ্বলজ্বল করছে সেই ঘটনা। মাত্র সাড়ে তিন বছর আগে ঘটেছিল। ২০১৫ সালের ২৩ জুলাই মাগুরা শহরের দোয়ার পাড় এলাকায় মাদকব্যবসায়, চাঁদাবাজী ও অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদের দু-গ্রুপের মধ্যে ঘটা বন্দুকযুদ্ধে মাতৃগর্ভে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল সুরাইয়া। তার মা নাজমা বেগম পেটে গুলিবিদ্ধ হন। তিনি তখন আট

মাসের গর্ভবতী। একই ঘটনায় সুরাইয়ার দাদা, নাজমা বেগমের চাচাশ্বশুর মোমিন ভূইয়াও গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনার পর দিন তিনি মারা যান। এ ঘটনা নিয়ে সারা দেশে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সরকারের উচ্চমহল নাজমা বেগম ও গর্ভের শিশুর চিকিৎসার দয়িত্ব নেয়। মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে নাজমা বেগম ও তার গর্ভের সন্তান বেঁচে যান। কিন্তু সুরাইয়ার একটি চোখ হারিয়ে যায় চিরতরে। মাতৃগর্ভে গুলিবিদ্ধ হওয়া এবং চোখ হারানো শিশু সুরাইয়া ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বেড়ে উঠছে এই বাংলার জমিনে। এই ঐতিহাসিক ভয়ংকর অপকর্মের মূল হোতা এবং মামলার ১নং আসামী মাগুরা জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সুমন সেন। ঘটনার কিছুদিন পর র‍্যাব তাকে আটক করে। ক্ষমতার দাপটে যথারীতি তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই জামিন পেয়ে যান।

মাতৃগর্ভে সুরাইয়া বেঁচে গেলেও ১২ বছর বয়সী শিশু রাব্বি বাঁচতে পারেনি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি শামসুদ্দীন আল আজাদ ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুজ্জামান ইমন গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রাব্বি নিহত হয়। [ইত্তেফাক, ২১ জানুয়ারি ২০১৩]

বিগত দশ বছরের আওয়ামী জাগেলি জামানায় 'ছাত্রলীগ' নামক ছাত্র সংগঠনটির ভয়ানক সব অপকর্মের কাহিনি লিপিবদ্ধ করতে হলে লক্ষ পৃষ্ঠার প্রয়োজন হবে। সেই অবকাশ এখানে না থাকায় সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা ছাত্রলীগের জাতিবিনাশী, আত্মবিনাশী, তারুণ্য বিনাশী অপতৎপরতার ফিরিস্তি তুলে ধরব।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অতীতে কখনোই এত দীর্ঘ সময় ধরে এ দেশের মানুষকে শাসনের নামে শোষণ করার, নিপীড়ন করার সুযোগ পায়নি আওয়ামী লীগ। ২০০৮ সালে অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আরোহণ করে আওয়ামী লীগ। তার এই অবৈধ ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখা ও দীর্ঘায়িত করার জন্য ছাত্রশক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। ছাত্রলীগ হয়ে ওঠে তাদের অন্যতম পেটুয়াবাহিনী। যে কারণে হেন অপকর্ম নেই যা এই ছাত্রলীগ দ্বারা সম্পন্ন হয়নি। খুন, ধর্ষন, চাঁদাবাজী, মাদকব্যবসায়, টেন্ডারবাজি, নারী নির্যাতন, সন্ত্রাসী তৎপর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য সৃষ্টি, ছাত্রাবাস পোড়ানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য, শিক্ষক লাঞ্ছনা, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নিপীড়ন, সাংবাদিক নির্যাতনসহ তাদের অজস্র অপকর্ম প্রতিনিয়তই এদেশের তারুণ্যকে বিনাশের দিকে নিয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার প্রথম তিন নামের মধ্যেই ছাত্রলীগ এত অপকর্ম করেছে যে দেশের একটি প্রথম শ্রেনির দৈনিক পত্রিকা তাদের শিরোনাম করেছিল–'ছাত্রলীগের আগুনে পুড়ছে আওয়ামী লীগ' [৩ এপ্রিল ২০০৯, দৈনিক যায় যায় দিন]। কিন্তু ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের পক্ষে ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন কোশেশই করা হয়নি, বরং ফ্যাসিবাদী শাসন চালানোর স্বার্থেই অবাধে সকল অপকর্ম করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে ছাত্রলীগকে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতারোহণের পরপরই দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ওপর হামলা করে একক আধিপত্য বিস্তার করে নেয় ছাত্রলীগ। তারপর শুরু

হয় তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল। এই কোন্দলে ছাত্রলীগেরই হাতেই নিহত হয় ছাত্রলীগের অসংখ্য নেতা-কর্মী। ২০১০ সালের ১২ জুলাই ছাত্রলীগ কর্মী পলাশ খুন হয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে। ১৬ জুলাই একই কারণে খুন হয় ছাত্রলীগ কর্মী সোহেল। ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইফতারির টাকা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ছাদ থেকে ফেলে ছাত্রলীগ কর্মী নাসিরুল্লাহ নাসিমকে হত্যা করে ছাত্রলীগের কর্মীরা। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তেজগাঁও পলিটেকনিকে কাউ খাওয়াকে কেন্দ্র করে দু'গ্রুপের সংঘর্ষে রাইসুল ইসলাম রাসেলকে হত্যা করা হয়। ২০ অক্টোবর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে আবিদুর রহমান নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে হত্যা করে ছাত্রলীগের কর্মীরা। ৮ জানুয়ারি ২০১২ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মী জুবায়ের আহমেদকে রড-হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে একই সংগঠনের প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতা-কর্মীরা। ২১ জানুয়ারি ২০১২ ইশ্বরদীতে ছাত্রলীগ কর্মী মোস্তফা কামাল খুন হয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলে। একই মাসে ২৫ তারিখে মাগুরায় আল-আমিন খুন হয় ছাত্রলীগের এক গ্রুপের হাতে। রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল আজিজ খান সজীব খুন হন অভ্যন্তরীণ কোন্দলে। ২০১২ সালের ১৬ জুলাই সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় ছাত্রলীগের নেতা আবদুল্লাহ আল হাসান। কুড়িগ্রামের চিলমারি উপজেলা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে প্রতিপক্ষ গ্রুপ হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয় ছাত্রলীগের চিলমারি উপজেলা সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাহাদুর রহমানের। পরে তিনি মারা যান। [আমাদের সময় ২১ নভেম্বও ২০১৪]

২০১৫ সালের ১০ এপ্রিল কুমিল্লা কান্দিরপাড় এলাকায় কমিটি গঠন নিয়ে ছাত্রলীগের দু-গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় তিন জন। ছাত্রলীগ কর্মী সাইফুল ইসলাম এবং সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্র মেহেদী ও ফয়েজ। [যুগান্তর ১২ এপ্রিল ২০১৫] ২০১৫ সালের ১৩ মার্চ ফেনীতে নিজ দলের কর্মীর গুলিতে নিহত হয় সাইদুল ইসলাম। [নয়া দিগন্ত ১৩ মার্চ ২০১৫]

যে সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নিজেরাই নিজেদের নেতা কর্মীদের এভাবে খুন করতে পারে তারা অন্যান্য দল ও ছাত্র-সংগঠনের সঙ্গে কী রূপ ব্যবহার করতে পারে, তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। পুরান ঢাকার জজকোট এলাকার এক হিন্দু তরুণ দর্জি বিশ্বজিৎ দাসকে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা কিভাবে হত্যা করেছিল সে দৃশ্য পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ দেখেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে শিবির কর্মী সন্দেহে ছাত্রলীগ কর্মীরা বিশ্বজিৎ দাসকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল। বিশ্বজিৎ বাঁচার জন্য এদিক ওদিক প্রাণপনে ছোটাছুটি করেছে কিন্তু ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী কর্মীরা মানবতা তথা মনুষত্বকেই কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল। ছাত্রলীগ নামক দানবীয় সংগঠনটি এদেশের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ক্ষমতার প্রভাবসহ নানাকৌশল খাটিয়ে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির দীক্ষা দিতে গিয়ে এতটাই পশুতে পরিণত করে ছেড়েছে।

২০০৯ সালের ১০ মার্চ জামালপুর দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা শাখা শিবির সভাপতি মাদরাসার ছাত্র হাফেজ রমজান আলীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ছাত্রলীগ। [সংগ্রাম, ১২ মার্চ

২০০৯] একই বছর ১৩ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান নোমানীকে ছাত্রলীগ কর্মীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। [আমার দেশ, ১৪ মার্চ ২০০৯] ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মহানগরীর ষোলশহর স্টেশনে রাত পৌনে ৯ টার দিকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এম মহিউদ্দিন নামের এক শিবির কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করে। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মেধাবী ছাত্র আবুবকর সিদ্দিক। ২০১৬ সালের একই মাসে ছাত্র-লীগের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়ে মারা যান হাফিজুর রহমান মোল্লা। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা এভাবেই গত দশ বছরে শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন স্থানে একের পর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এসব হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তালিকা স্বতন্ত্র্যভাবে প্রণয়ন করার প্রয়োজন আছে। এখানে মাত্র কয়েকটি হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে।

গত দশ বছর ধরে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শুধু ২০১০ সালেই দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৮৬টি ছাত্র সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে তিনজনের মৃত্যু হয়। এসব কারণে বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। প্রতি বছরই এই সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং দিন দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এসব সহিংসতা বিস্তৃত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্নভাবে সহিংসতা চালায় ছাত্রলীগ। শিক্ষক লাঞ্ছনা, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নিপীড়ন প্রতিপক্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর হামলা ও নিপীড়ণ যৌন নির্যাতন, ছাত্রাবাস পোড়ানো, ভার্ত বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজির মত সব অপকর্মই তারা অবাধে পরিচালনা করে। ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের কাছে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন রকম আগ্নেয়াস্ত্র। এসব অস্ত্রের ব্যবহার তারা যখন তখনই করেছে।

ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন ছাত্রলীগের কলঙ্কের আরেক অধ্যায়। ২০১৬ সালের ১১ অক্টোবর বরিশালের বানারীপাড়ায় এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ছাত্রলীগ নেতা রুবেল। প্রতিবাদ করায় কয়েক দিনের মধ্যে আবারও ওই স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের জন্য আটক করে রুবেল। পরে পুলিশের ওই ছাত্রলীগ নেতা রুবেলকে আটক করে [যুগান্তর ১১ অক্টোবর ২০১৬] ।

২০১৬ সালের ১৬ জুলাই মিরপুরের সাইক ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজির স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষার্থী ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী আফসানা ফেরদৌসকে ধর্ষণের পর হত্যা করে তেজগাঁও থানা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান রবিন। পরিবারের পক্ষ থেকে এ অভিযোগ করা হয়। [বিডিনিউজ, ১৮ জুলাই ২০১৬]

২৫ অক্টোবর ২০১৬ খাগড়াছড়ি দীঘিনালা উপজেলার কাবাখালী ইউনিয়নে এক আদিবাসী ছাত্রীকে ধর্ষণ করে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি শাহরিয়ার হোসেন সোহেল। পুলিশ তাকে আটক করে। [জনতার নিউজ ২৪ কম ২৫ অক্টোবর ২০১৬]

১১ জুলাই ২০১৬ নবম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণকালে জনতার হাতে ধরা পড়ে খাগড়াছড়ি উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন। জনতা তাকে পুলিশে সোপর্দ

করে। [এনটিভি.কম, ১২ জুলাই ২০১৬]

৮ জুন ২০১৪ রাজধানীতে চিকিৎসা নিতে আসা এক গৃহবধু ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল হোসেন কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন। [প্রথম আলো ১১ জুন ২০১৮]

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ছাত্রলীগ নেতা খোকনের নেতৃত্বে এক শিশুকে গণধর্ষণ করা হয়। [নয়া দিগন্ত ২৫ সেপ্টেম্বর২০১৬]

১৯ মে ২০১৬ দিনাজপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের এক ছাত্রীর শরীরের পুরো কাপড় খুলে উলঙ্গ করে প্রকাশ্যে দাঁড় করিয়ে ভিডিও ধারন করে ছাত্রলীগের দুই নেতা সুলতান মাহমুদ শিহাব ও ইমরান হোসাইন। [দেশী বিদেশী কম ১৯ মে ২০১৬]

১১ নভেম্বর ২০১৬ চুয়াডাঙ্গার সরকারি কলেজের আয়াকে ধর্ষণ করতে গিয়ে উত্তম মাধ্যম খেয়ে রক্তাক্ত ও বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার হয় ছাত্রলীগের শাখা সম্পাদক তানিম হাসান তারেক। এ ঘটনার ছবি ফেইসবুকে ভাইরাল হয়। [যুগান্তর ১৩ নভেম্বও ২০১৬]

ছাত্রলীগ কর্তৃক এরকম ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে গত দশ বছরে। ২০১৬ সালের ৩ নভেম্বর সিলেট এম সি কলেজে খাদিজা আক্তার নার্গিসকে কুপিয়ে কুপিয়ে মরণাপন্ন করে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহ-সাধারণ সম্পাদক বদরুল আলম। এ ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়। মৃত্যুও মুখ থেকে বেঁচে জান খাদিজা। এভাবেই ছাত্রলীগের বদরুলরা সারা দেশে 'বদ+রুল' মানে অপকর্মের ধারা তৈরি করেছে। ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিলের ঘটনাটি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি এলাকায় নারীর বস্ত্রহরণ করে ছাত্রলীগের কর্মীরা। সে দৃশ্যের ভিডিও করে তারা। ঐ নারীকে রক্ষায় এগিয়ে এলে ছাত্র ইউনিয়ন ঢাবি শাখার সভাপতি লিটন নন্দী ও তার সহকর্মীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগের ওইসব কর্মীরা। [দিনকাল ১৬ এপ্রিল ২০১৫]

এরপর ছাত্রলীগের দানবীয় মূর্তি ভিন্নরূপে বেরিয়ে পড়েছে কোটাসংস্কার আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে। হেন নির্যাতন নাই যা তারা কোটাসংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর করেনি। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের দাবিতে আন্দোলনরত কোমলমতী স্কুল-শিক্ষার্থীদের ওপরও তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে হায়েনার মতো। তাদের বর্বরোচিত হামলায় অসংখ্য কোমলমতি শিক্ষার্থী আহত, নিহত ও গুম হয়েছে। হেলমেট বাহিনী দিয়ে তারা স্কুল-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ছাত্রলীগ নেতা গোলাম রব্বানীর নির্দেশেই সায়েন্স ল্যাব ও ধানমন্ডিতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ [আমাদের সময় ২৯ নভেম্বর ২০১৮]। শুধু তাই নয়, আলোচিত হেলমেট বাহিনী সাংবাদিকদের ওপরও সেদিন একই কায়দায় হামলা করে, ক্যামেরা ভাংচুর করে, ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয় এবং বহু সাংবাদিককে আহত করে।

ছাত্রলীগের কৃতকর্ম দেখলেই অনুধাবন করা যায়, এটি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। এই

সন্ত্রাসীরা হচ্ছে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শক্তির ক্ষমতায় টিকে থাকার অন্যতম অবলম্বন। যে কারনে এদের সকল অপকর্মের লাইসেন্স প্রদান করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকার। এই অপশক্তিকে যদি জাতির ঘাড় থেকে আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে অপসারণ করা না যায় তাহলে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবে পরিণত হওয়া সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগ বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণের জন্য আরও ভয়াভয় দুর্যোগ ও দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে সন্দেহ নাই।